NOT FOR SALE

কিশোর সাহিত্য সমগ্র

তৃতীয় খণ্ড

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

NOT FOR SALE

THIS COPY IS NOT FOR SALE.

©ASOKE CHATTERJEE

NOT FOR SALE

কিশোর সাহিত্য সমগ্র

(তৃতীয় খণ্ড)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

শশধর প্রকাশনী
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

NOT FOR SALE

Kishore Sahitya Samagra-III
by Harinarayan Chattopadhyay
Price : Rs. 150.00

Published by :
Amiya Bandyopadhyay
Sasadhar Prakashani
10/2B, Ramanath Mazumder Street
Kolkata-700 009

প্রকাশক :
অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৪

প্রচ্ছদ : সৌরিশ মিত্র

হরফবিন্যাস :
গঙ্গা মুদ্রণ
৫৪/১বি, শ্যামপুকুর স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৪

মুদ্রাকর :
গ্রাফিক্স রিপ্রোডাকশন
চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

বিনিময় : ১৫০ টাকা মাত্র

NOT FOR SALE

ভূমিকা

পিতা ৺হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্য সমগ্র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রায় শেষের মুখে। এদিকে নানা পাঠকদের কাছ থেকে তৃতীয় খণ্ড করার জন্য বারবার অনুরোধ আসায় তৃতীয় খণ্ড আরম্ভ করার প্রস্তুতি নিলাম। এটিও উপন্যাস ও গল্প নিয়ে সাজানো হয়েছে।

সামন্ত বাড়ি :- অনেকে সামন্ত বাড়িকে ভুতুড়ে বাড়িও আখ্যা দিয়েছিল। আসলে অনেক দিনের পুরোনো বাড়ি পড়ে থাকলে যা হয়। আবার কিছু মানুষ আছে তারা নিজেরা অনেকরকম করে সেটা ভুতুড়ে বাড়ি সাজাবার চেষ্টা করে। পাড়ার মাতব্বরদের কথামতো টাকা তুলে পাড়ার ছেলেদের যাত্রা করার ঠিক হল। কিন্তু তাদের যাত্রা কি ঠিকমতো শেষ পর্যন্ত হয়েছিল?

সীমানা ছাড়িয়ে :- সীমানা ছাড়িয়ে উপন্যাসে মোহনের নিজের মা ছিল না। সৎ মার নানা লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে হত। তারপর সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে অনেক বিপদের মুখে পড়তে হয়েছিল। তারপর এক সন্ন্যাসীর খপ্পরে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তার হাত থেকে পুলিশ উদ্ধার করে এবং অনেক গরীব কানা খোড়া ছেলেদের উদ্ধার করে। মোহনের বাবা ছেলেকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিল।

বিড়াল বিড়ম্বিত :- বিড়াল বিড়ম্বিত উপন্যাস সত্যি হাসি পাবার মতো উপন্যাস। উপন্যাসের বিড়াল কাঁচা শাক সবজিও খায় এমন কখনও কেউ শুনেছি কি? ইঁদুর তাড়াবার জন্য বেড়াল আনা হয়েছিল কিন্তু এখন বেড়াল তাড়াবার জন্য কুকুর আনা হল। এবার নিঃশ্বাস ফেলা গেল কিন্তু দুদিন বাদে দেখা গেল কুকুরকে বেড়ালরা তাড়া করছে। শুধু ঘরের বেড়ালই নয় রাস্তার বেড়ালও যোগ দিয়েছে। শেষে বেড়ালকে মাঠে ছাড়া হয়েছিল গাড়িতে করে। কিন্তু গাড়ির ডালা খুলতে দেখা গেল শুধু সে নয় একজন সঙ্গীকেও নিয়ে এসেছে।

গুপ্তধনের সন্ধান :- গুপ্তধনের সন্ধান গল্পে শ্রাবণী, অদিতি, মধুছন্দা, সমাপ্তি, মিতালী ও জয়শ্রী ছজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। একবার তারা খবর পায় এক ভাঙা বাড়ির ভেতর গুপ্তধন আছে। তাদের সকলের খুবই পয়সার অভাব, সেজন্য সবাই ঠিক

NOT FOR SALE

করে গুপ্তধনের সন্ধানে যাবে। কিন্তু সত্যিই কি তারা গুপ্তধন পেয়েছিল এ জানতে গেলে গল্পটি পড়ুন।

তাপ্পিদার সাপ শিকার :- তাপ্পিদার সাপ শিকার গল্পে তাপ্পিদা দলের সর্দার। রোজই শিকারের নানা গল্প ছেলেদের বলে। সেদিন সাপ শিকারের গল্প আরম্ভ করল। শিকারের জন্য বাইরে গিয়েছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ মাঝরাতে একটা ঠান্ডা স্পর্শ পেয়ে তাপ্পিদার ঘুম ভেঙে একটা চন্দ্রবোড়া সাপকে দেখতে পায়। বিরাট ফণা তুলে বিছানার উপর। বন্দুকটা দেওয়ালে ঝোলানো। ছোরাও ড্রয়ারের ভেতর, কি করবে ভেবে না পেয়ে বালিশের তলায় নস্যির কৌটো ছিল; কৌটো খুলে চন্দ্রবোড়ার মুখের ওপর উপুড় করে দেয়। একত্রিশটা হাঁচার পর তরল বিষ বের হতে থাকে। আর দেরি না করে মাথাটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে আছাড় মারতে থাকে। সব শেষ হয়। সকলে প্রশ্ন করার আগে তাপ্পিদা ছুট মারল।

জ্যোতিষীর কাহিনী :- ছোট গল্প জ্যোতিষীর কাহিনী। লেখক রাঁচী গিয়েছিলেন বেড়াতে। সেখানে শুনলাম শুক্রবারের যে হাট বসে তা নাকি দেখবার মতো। লেখকের ধারণায় হাট মানে ফলপাকুড়, তরিতরকারী বা পুঁথির নানা জিনিস বেতের মোড়া প্রভৃতি। কিন্তু হাটে এত বড় বিস্ময় তিনি যে দেখবেন কল্পনার বাইরে। সেখানে গিয়ে এক জ্যোতিষীর সন্ধান পেয়ে হাত দেখান। তিনি বলেছিলেন ছেলেমেয়েদের রক্তপাতের সম্ভাবনা আর লেখকের অর্থাগম। পাঁচদিনের মধ্যে বানারস থেকে তিনি টাকা পান। ফিরে আসার আগে তিনি একবার গিয়েছিলেন। ভিড় দেখে সে সামনে গিয়ে দেখেন সেই জ্যোতিষী আত্মহত্যা করেছেন। মনে মনে লেখক ভাবছিলেন যে সকলের হাত বিচার করে দেখে, কিন্তু নিজের হাতটার লেখা দেখতে ভুলে গেছেন।

পাকসিদ্ধ :- পাকসিদ্ধ গল্পে বেশ মজার ঘটনা। ঠাকুরটি একদিন ঝোল রান্না করতে করতে বউয়ের কথা মনে পড়ায় সে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গিয়েছিল। তারপর অনেকদিন আর লোক না পাওয়ায় ভদ্রলোক কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপন দেখে যে রান্নার লোকটি আসে সে খুব নিয়ম মেনে চলে। গলা ভাত ও মাছ কম ভাজার জন্য বাবুকে নীতিকথা শোনায় ভিটামিন প্রোটিনের ব্যাপারে। রান্নার ছেলেটি ওখান থেকে যাবার পর ভদ্রলোক মাছটিকে বাটি চাপা দিয়ে রাখে। যদি দেখে তাহলে হয়তো কোনো ডাক্তারের উদাহরণ দেবে।

শিয়ালকাঁটা :- শিয়ালকাঁটা গল্পে সাধুখাঁ দোকানের মালিক। ঠিক মতো ব্যবসা করার ফলে বাড়ি, গাড়ি সব হল। একটিই ছেলে, লেখাপড়া শেখার দরকার নেই ব্যবসা দেখবে। শেয়ালকাঁটার বন উজাড় করে নিয়ে এসেছিল কিন্তু জানা গেল

NOT FOR SALE

ভিটেয় আর শিয়ালকাঁটা একটিও নেই। তাই শুনে লুটিয়ে পড়ল সাধুখাঁ। ছেলে ডাক্তার নিয়ে এল। হসপিটালে ভর্তিও করল। কিন্তু ব্রেনটা গেল খারাপ হয়ে। ডাক্তার কোনো উপায় না দেখে ছেলেকে বললেন বিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহার করতে। যা খেয়ে সব রকম ব্যাধি হবে। পুলিশের কাছে যাবারও সময় থাকবে না।

কালো গোলাপ :- কালো গোলাপে বিকাশ মিত্র একজন ডিটেক্টিভ। মিনতি নামের একজন তরুণী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কারণ তাঁর বাবা মারা গেছেন মানে তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। যাবার আগে সে 'চ' অক্ষরটি লিখেছিলেন তাই দেখে বিকাশ মিত্র চন্দ্রবোড়া সাপের নাম আবিষ্কার করেন ও মংপুকে ধরেন।

চন্দ্ররহস্য :- চন্দ্ররহস্য গল্পে শশাঙ্কমোহন নিজেকে বৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন। প্রথমে তিনি কাপড় কাচার সাবান আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু সে সাবান কাপড়ে ঠেকালেই ফুটো হয়ে যাওয়ায় লোকেরা তার বাড়ী ঘেরাও করার ফলে তাকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। তারপর তিনি চন্দ্রের ফাটল আবিষ্কার করলেন কিন্তু দেখা গেল সেই ফাটলটা আসলে চড়াইপাখির বাসার খড় ঝুলছে।

দামোদর অপেরা পার্টি :- দামোদর অপেরা পার্টিতে সীতার বনবাস চরিত্রে সকলে মিলে যে পার্ট করেছিল তা প্রায় হাসির যোগ্য।

আরণ্যক :- আরণ্যক গল্পে চিতা শিকার করার পরও সেই চিতাকে আবার দেখা গেছে। বনবিভাগের লোকেরাও গল্প করে এখনও সেই ক্ষতবিক্ষত চিতাকে নাকি ঘুরতে দেখেছে। ওটা সাধারণ চিতা নয়, চিতার প্রেতাত্মা। লেখকেরও তাই মনে হয় কিন্তু বিজ্ঞানের যুগের মানুষরা তা বিশ্বাস করতে চাইবে না।

বনকুঠির রহস্য :- বনকুঠির রহস্যে বন্ধু সুকুমারের খুব বিপদ। আমাকে যেতে বলেছিল। কয়েকদিন ছুটি নিয়ে তার বাড়ি গেলাম। তালা বন্ধ। টান মারতেই তালা খুলে গেল। চাকরটা অবাক হয়ে গেল। বলল বাবু তো মারা গেছে। চিঠিটা বার করে দেখলাম সাদা কাগজ। এমন একটা গাছ ছিল যেটা কেউ কাটে না, আর তাকেই সুকুমার কাটতে গিয়েই মৃত্যু।

বরযাত্রী :- বরযাত্রী গল্পে যানবাহন সব বন্ধ থাকার ফলে বর কনেকে নিয়ে সাইকেলে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ সাইকেলের টায়ার ফেটে যায় আসলে কনে এত মোটা তার ভার আর সাইকেল সহ্য করতে পারেনি।

ভেজাল :- ভেজাল গল্পে ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে বিয়ে দিচ্ছিল। খাদ্যদ্রব্য, পোশাক সব কিছুতে ভেজাল শোনা গেছে কিন্তু বিয়েতে যে কনেও ভেজাল তা এই গল্পে পাওয়া যায়।

NOT FOR SALE

বিয়েবাড়ি :- বিয়ে বাড়ি গল্পে এক ঝড় জলের রাত্রে যানবাহন সব বন্ধ হয়ে যায়। মেয়ের বাড়ির লোকেরা চিন্তায় পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্ধার করে যার সঙ্গে মেয়ের বাপের ছিল শত্রুতা সেই বরকে পাঁজাকোলা করে এনে বিয়ের সামনে বসিয়েছিল, সেজন্য শত্রুর কাছেও হার মানতে হয়েছিল মেয়ের বাপকে।

নিরুদ্দেশের পথে :- নিরুদ্দেশের পথে গল্পে মোহন সংসারের লোকেদের কাছে অসহ্য করে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে ভাবছিল, এক রাত সে বাইরে কাটিয়েছিল কিন্তু তার আর নিরুদ্দেশ হওয়া হল না। তারপর তার জন্য অপেক্ষা করছিল অসীম ভালবাসা।

ধন্যবাদান্তে
তপতী দেবী

NOT FOR SALE

সূচীপত্র

উপন্যাস

- সামন্ত বাড়ি ৯
- সীমানা ছাড়িয়ে ২৬
- বিড়াল বিড়ম্বিত ১০৭

গল্প

- গুপ্তধনের সন্ধানে ১২১
- তাপ্পিদার সাপ শিকার ১৩২
- জ্যোতিষীর কাহিনী ১৩৭
- পাকসিদ্ধ ১৪৫
- শিয়ালকাঁটা ১৫০
- কালো গোলাপ ১৬১
- চন্দ্ররহস্য ১৬৯
- দামোদর অপেরা পার্টি ১৮১
- আরণ্যক ১৯১
- বনকুঠির রহস্য ২০২
- বরযাত্রী ২০৭
- ভেজাল ২২১
- বিয়েবাড়ি ২২৮
- নিরুদ্দেশের পথে ২৩৪

NOT FOR SALE

NOT FOR SALE

সামন্ত বাড়ি

বাড়িটার দিকে চোখ পড়লেই গা ছম ছম করে। সমস্ত দরজা-জানলার কব্জাগুলো বোধহয় ভেঙে গেছে। একটু বাতাস হলেই বিচিত্র শব্দ হয়। ক্যাঁচ কোঁচ ক্যাঁচ।

বাড়িটার আদিকালে কি রং ছিল বলা মুশকিল। এখন বাইরের আস্তরণ খসে পাঁজর-প্রকট চেহারা। রন্ধ্রে রন্ধ্রে বট অশথের চারা। ছাদের এক দিকের কার্নিস সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। সামনে অনেকখানি জায়গা। গাঁয়ের বুড়ো লোকেরা বলে এক সময়ে খুব চমৎকার ফুলের বাগান ছিল। সামন্তরা দেশবিদেশ থেকে নানা জাতের ফুলের গাছ এনে লাগিয়েছিল।

এখন ফুলের গাছের একটিও অবশিষ্ট নেই। হতশ্রী চেহারা। ভেরাণ্ডা, ঘেঁটু আর আকন্দ গাছের রাজত্ব। দু-একটা ঘোড়া-নিমও আছে।

আগে এই বাড়ি জমজমাট ছিল।

সামন্তর দুই ছেলে, দুই বৌ, একঘর নাতিপুতি। এ ছাড়া কর্তা আর গিন্নী তো ছিলই।

সাতদিনে প্রায় সবাই উজাড়।

সামন্তর ছোট ছেলে বৌ নিয়ে বিদেশে ছিল, তাই কেবল তারাই বাঁচল। বাকি সবাই কলেরায় খতম। সাতদিনে এগারোজন, চাকর-বাকর নিয়ে।

শুধু সামন্ত বাড়িরই নয়, গাঁয়ের বহু বাড়িতেই এক অবস্থা।

মড়া পোড়াবার লোক নেই। ঘরে ঘরে মড়া পচতে লাগল।

গন্ধে টেকা দায়।

দিন-দুপুরে শেয়াল আর কুকুর আধ-মরাদের নিয়ে টানাটানি শুরু করল।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে, সামন্তর ছোট ছেলে আর দেশে ফিরে আসেনি।

বাড়ি অযত্নে, সংস্কারের অভাবে একটু একটু করে আজকের অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

NOT FOR SALE

এদিক দিয়ে পারতপক্ষে কেউ হাঁটে না।

অবশ্য এটা ঠিক যাওয়া-আসার পথও নয়। কেবল শনি আর মঙ্গলবার যে দুদিন হাটবার, হাটে যারা কমলপুর থেকে জিনিস নিয়ে আসে তারা সামন্ত বাড়ির পাশ দিয়ে ফেরে। কমলপুরে ফেরবার তাদের আর একটা পথ আছে, কিন্তু সে অনেক ঘুরপথ। প্রায় অর্ধেক গ্রাম ঘুরে যেতে হয়। তাদের ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সামন্তবাড়ির পাশ দিয়ে তারা কোনরকমে ছুটে পালায়। তবু কি নিস্তার আছে। সব কানে যায়।

হঠাৎ একতলার ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। জোর আলো নয়, নীলচে দীপ্তির মৃদু আলো। হা হা করে হাসির আওয়াজ শোনা যায়। সেই হাসি শুনলে সাহসী জোয়ানেরও বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। অশরীরী হাসি। এ যেন কোন মানুষের নয়। লোকেরা দু কানে আঙুল দিয়ে প্রাণপণে জায়গাটা দৌড়ে পার হয়।

একবার বছর দুয়েক আগে সহদেব জেলে সাহস করে দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করেছিল। ভাঙা পাঁচিল পার হয়ে একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। গোঁ গোঁ শব্দ করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সঙ্গীরা কেউ এগিয়ে আসেনি।

পরের দিন সকালে তার আত্মীয়স্বজন এসেছিল। সহদেবের ঠোঁটের দু পাশে ফেনার রাশ। দেহে এত তাপ যে হাত রাখা যায় না।

কোনরকমে ধরাধরি করে সহদেবকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল।

তারপর সহদেব তিনদিন বেঁচে ছিল। এ তিনদিন চোখ খোলে নি। মাঝে মাঝে শুধু সারা দেহ কেঁপে উঠেছিল। মুখ দিয়ে অস্পষ্ট স্বর বের হয়েছিল : ভূ-ভূত ভূ-ভূ-ত।

তারপর বহুদিন কেউ আর ওপথ দিয়ে চলেনি। ঘুরে অন্য পথ দিয়ে যাওয়া আসা করত।

অনেকদিন পর আবার সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। কিন্তু লোকেরা সন্ধ্যার আগেই সামন্ত বাড়ি পার হবার চেষ্টা করত।

সহদেব যে কি দেখেছিল, কেউ জানে না। জানবার কোন উপায় ছিল না।

NOT FOR SALE

একবার কলকাতার এক ভদ্রলোক সামন্ত বাড়ি কেনবার জন্য এসেছিল। তার ইচ্ছা ছিল আশপাশের জমিতে ছোটখাট এক কারখানার পত্তন করবে আর বাড়িতে অফিস। তার সঙ্গে ম্যানেজার ছিল। দুজনে মিলে জমিজমা দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল।

তাদের প্রথম সমস্যা হয়েছিল, সামন্ত বাড়ি যদি কেনাই ঠিক করে, তাহলে টাকাটা দেবে কাকে। প্রকৃত মালিক কে?

এক ভাগ্নে অবশ্য এসে খাড়া হয়েছে, কিন্তু সে প্রকৃত মালিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

কিন্তু কেনবার প্রশ্ন আর উঠল না।

বাগান পার হয়ে বাড়ির মধ্যে আসতে গিয়েই দুজনে থেমে গেল। একটা ঘোড়ানিমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটা কঙ্কাল। তার একটা হাত ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্ছে। কাছে ডাকছে এই রকম ভাব।

তারপর দুজনে আর দাঁড়াতে সাহস পায়নি। দ্রুতবেগে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছিল। কাঁটাগাছে দেহ ক্ষতবিক্ষত, পোশাক ছিন্নভিন্ন। বাড়ি কেনা তো দূরের কথা, তারা একেবারে স্টেশনে এসে থেমেছিল।

তারপর থেকে বাড়িটাকে কেউ আর সামন্তবাড়ি বলত না, বলত ভূতুড়ে বাড়ি।

সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে গেলে ভূতুড়ে বাড়ি থেকে আওয়াজ ভেসে আসত, খুট, খাট, খুট, খুট, খাট, খুট।

গ্রামের জনার্দন খুড়ো হাঁপানীর জন্য রাতে ঘুমাতে পারতেন না। প্রায় সারা রাত দাওয়ায় বসে তামাক খেতেন। সেই শব্দ কানে যেতে বলতেন, ওই ভূতের নাচ শুরু হল। ওদের গায়ে তো এক তিল মাংস নেই, কেবল হাড়সম্বল। তাই খুট খুট আওয়াজ হচ্ছে।

কথাগুলো তিনি বলতেন দিনের আলোয় চণ্ডীমণ্ডপে বসে। গ্রামের আর পাঁচজন মুরুব্বির সামনে, আরে বাপু, এরকম যে হবে, এ তো জানা কথা। নকুল সামন্তর বাড়ির কোন মড়ার তো আর সদ্‌গতি হয়নি। করবে কে? তখন গাঁয়ের সব ঘরে এক অবস্থা। কে কাকে দেখে ঠিক আছে! মুখে জল দেবার যেমন লোক নেই, তেমনই মারা গেলে মুখে আগুন দেবার লোকেরও

NOT FOR SALE

অভাব। সব মড়া ওই বাড়িতে পচেছে। কাজেই বাড়ির মায়াও ত্যাগ করতে পারছে না।

মুখুজ্জেদের ত্রিলোচনদা বললেন, এক কাজ করলে হয়।

কি?

পাড়ায় চাঁদা তুলে গয়ায় পিণ্ড দিয়ে এলে হয়।

চাঁদার কথা শুনে হারু মজুমদার হঠাৎ, কে রে? কে আমগাছে ঢিল ছোড়ে, বলে পালিয়ে গেলেন।

অন্য সবাই বললেন, উত্তম প্রস্তাব।

বিধুবাবু প্রশ্নের খোঁচা তুললেন, কিন্তু গয়া যাবে কে? তার খরচ?

জনার্দন খুড়ো সে সমস্যারও সমাধান করে দিলেন, কেন পরাশর গার্ড রয়েছে। মাসে দুবার সে গয়া যায়। তার হাতে টাকাটা তুলে দিলেই হয়।

আর এক ঝামেলা। ওই বিধুবাবুই তুললেন, কিন্তু পিতৃপুরুষের নামধাম কিছু তো জানা নেই, পিণ্ডদান হবে কি করে?

আরে পুরোহিতকে মূল্য ধরে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অন্য কারো পিতৃপুরুষ প্রক্সি দিয়ে দেবে। পিণ্ড দান নিয়ে কথা। প্রেতলোকে সবাই হাঁ করে আছে, একবার পিণ্ড পড়লেই দেখবেন ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

তাই ঠিক হল। চাঁদাই তোলা হবে। কিন্তু কিভাবে? এখনই লোকের দরজায় খাতা নিয়ে ঘুরলে কেউই উপুড় হস্তও করবে না। পূজাপার্বণে দেখা গেছে বিশেষ চাঁদা ওঠে না। তবু সেখানে দেব-দেবীর রোষের ব্যাপার আছে। এক্ষেত্রে সে সব আশঙ্কা নেই। সামন্তদের প্রেতাত্মা সামন্ত বাড়ি ছেড়ে গ্রামে চড়াও হবে এমন সম্ভাবনা কম।

সকলে ভেবে চিন্তে স্থির করল, সংকীর্তনের দল বের করবে। গ্রামে এরকম একটা দল ছিলই। তারাই কাপড় পেতে গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরবে।

তাই করল।

মোট উঠল তিন টাকা বাইশ পয়সা। দুটো শশা, একটা কাঁঠাল, গোটা পাঁচেক আম। তাও সেই বাইশ পয়সার মধ্যে দুটো দশ পয়সা আবার অচল।

গ্রামের মাতব্বররা যখন এ ব্যাপারে চিন্তিত, সেই সময় ঢাকের শব্দ কানে এল।

NOT FOR SALE

এখন আবার ঢাকের আওয়াজ কেন?

পালপার্বণের সময় নয়। শীতলা, মনসা পূজা হলে মাতব্বররা আগেই জানতে পারতেন। সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

গোটা চারেক গরুর গাড়ি আলের পথ ধরে চলেছে। ঢাকের শব্দ আসছে প্রথম গরুর গাড়ি থেকে।

মাতব্বররা এগিয়ে গেলেন।

গরুর গাড়ির ছই-এর ওপর কাগজ লটকানো। দি দিগ্বিজয় যাত্রা পার্টি। প্রোপ্রাইটর : পশুপতি ধাড়া।

এক গ্রাম থেকে বায়না সেরে কালনা ফিরে যাচ্ছে। ঢাকের আওয়াজ হচ্ছে বিজ্ঞাপন। পথে যদি কেউ বায়না করে। জনার্দন খুড়োই বললেন, এদের বায়না করলে হয়। আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারে তবু লোকে টাকা খরচ করে। আর এই অজ পাড়াগাঁয়ে কিই বা আছে!

বিধুবাবু হাত তুলে প্রথম গরুর গাড়িটা থামালেন। বললেন, প্রোপ্রাইটর কোথায়? দেখা করব।

গাড়ি থেকে একটি কয়লার বস্তা নামল। মাথায় চার ফিট, করমচালাল দুটি চোখ, পরনে ফতুয়া, ধুতি হাঁটুর ওপর। হেঁড়ে গলা যথাসম্ভব মিহি করে বলল, অনুমতি করুন আজ্ঞে। আমিই পশুপতি ধাড়া। প্রোপ্রাইটর, দি দিগ্বিজয় যাত্রা পার্টি।

কোথা থেকে আসছেন?

আসছি বীজপুর থেকে। মরবার সময় নেই। কেবল বায়নার পর বায়না। আমাদের মহীরাবণ বধ, সুরথ উদ্ধার, কুরুক্ষেত্র, কমলে কামিনী একেবারে বাছা বাছা পালা। লোকে এক রাতের জন্য বায়না করে নিয়ে যায়, সাত রাতের আগে ছাড়ে না।

আপনাদের রেট কি রকম?

পশুপতি ধাড়া এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে বলল, এখানে কোথাও বসবার জায়গা নেই আজ্ঞে? এসব বৈষয়িক কথাবার্তা এভাবে দাঁড়িয়ে—

কাছেই একটা বটগাছ ছিল। তলায় লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। বিধুবাবু বললেন, আসুন পশুপতিবাবু এখানে বসা যাক।

সকলে বটগাছতলায় বসল।

NOT FOR SALE

আমাদের রেট আজ্ঞে দুশো টাকা। পশুপতি কাজের কথা পাড়ল।

ত্রিলোচনবাবু চোখ কপালে তুললেন, বলেন কি? এ টাকায় তো কলকাতার দল আনা যায়।

পশুপতি ধাড়া দু হাতে পেট চেপে ধরে হাসতে হাসতে বলল, কলকাতার দল আর আমার দলে তফাতটা কোথায়? আপনারা পালা দেখুন তারপর টাকা দেবেন।

অনেক দর কষাকষির পর একশো টাকায় রফা হল। একশ টাকা আর পালা ভাল লাগলে প্রোপ্রাইটরকে পান খেতে আরো দশ।

পশুপতি ধারা হাঁক দিল, বিজে, এই বিজে।

সারসের মতন লম্বা, শীর্ণকায় এক ছোকরা লাফ দিয়ে গরুর গাড়ি থেকে নামল। গজ গজ করতে করতে। বিজে, বিজে কেন আমার কি একটা ভাল নাম নেই?

পশুপতি ধাড়া বলল, বাবুদের খান কয়েক প্রোগ্রাম দিয়ে দে। শীর্ণকায় পকেট থেকে প্রোগ্রামের বান্ডিল বের করে গোটা চারেক প্রোগ্রাম বিলি করল। পশুপতি ধাড়া সকলকে একবার দেখে নিয়ে বলল, ওতে আমাদের ঠিকানা আছে। একটা পোষ্টকার্ড ফেলে দিলেই পেয়ে যাব। যেদিন আপনাদের দরকার তার অন্ততঃ মাসখানেক আগে আমাকে জানাবেন, নইলে সম্ভব হবে না। বায়নার পর বায়না কিনা।

জনার্দন খুড়ো বললেন, আমরা এ মাসের শেষে, ধরুন সতেরোই রাত্রে চাই। শনিবার আছে। শহরে যে সব বাবুরা কাজ করে সবাই বিকালে চলে আসবে। আসর ভরে যাবে। কোন্ পালাটা আপনাদের ভাল?

বললাম যে আমাদের সব পালাই এসকেলেন্ট।

এক্সসেলেন্ট। জনার্দন সংশোধন করে দিলেন।

ওই আজ্ঞে। আসরে বাবুরা বলেন কিনা। একটু থেমে পশুপতি ধাড়া আবার বলে, কুরুক্ষেত্রই দেখুন তা হলে। আমার দুর্যোধনের পার্ট যারা একবার দেখেছে, তারা জীবনে ভুলবে না। আসরে হৈ চৈ পড়ে যায়।

শীর্ণকায় বলল, আর আমার ছিকেষ্ট? পার্ট দেখে কোতলপুরের বাবুরা একবার বাঁশ দিয়েছিলেন।

বাঁশ? বাঁশ কেন? ত্রিলোচনবাবু উর্ধ্বলোচন হয়ে শুধান। বিজে ব্যাখ্যা

NOT FOR SALE

করল, মানে বাঁশী তৈরি করার জন্য। সবাই বললে, এ একেবারে আসল ছিকেষ্ট। বাঁশী ছাড়া মানায় না।

আঃ বিজে, ভদ্রলোকদের কথার মধ্যে তোর নাক গলাতে আসা কেন? পশুপতি বিরক্ত।

আবার বিজে! আপনি কি আমাকে বিজিতেন্দ্র মোহন বলে ডাকতে পারেন না?

পশুপতি ধাড়া রুখে উঠল, হ্যাঁ, ডাকব ওই নামে। আমার একে বাঁধানো দাঁত!

ঠিক আছে আমাদের কি করতে হবে বলুন। জনার্দন খুড়ো মনে করিয়ে দিলেন।

পশুপতি বললে, এই, খাতাটা গাড়ি থেকে নিয়ে আয়।

শীর্ণকায় গাড়ির দিকে ছুটল।

ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে অনেক লোক নেমে দাঁড়িয়েছে। কেউ আলের ওপর। কেউ গাছের ছায়ায়। খেরো বাঁধানো লাল খাতা এল। গ্রামের তরফ থেকে জনার্দন খুড়ো সই করলেন। তখন পশুপতি ধাড়া বলল, এবার কিছু অগ্রিম দিতে হবে আজ্ঞে।

অগ্রিম?

এই বেওয়াজ।

গ্রামের মাতব্বররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। বিধুবাবু বললেন, কার কাছে কত টাকা আছে?

কুড়িয়ে বাড়িয়ে পাঁচ টাকা হল। সেই পাঁচ টাকাই জনার্দন খুড়ো এগিয়ে দিলেন। বললেন, নিন, আগাম রাখুন।

হাত পেতে টাকাটা নিয়ে পশুপতি ধাড়া বলল, বড্ড কম হয়ে গেল আজ্ঞে। দলের বিড়ির খরচও হবে না।

ঠিক আছে। বাকিটা যাত্রা শেষ হলে ভোর রাতে দেব।

পশুপতি ধাড়া দু হাত জোড় করে সকলকে নমস্কার করে উঠে পড়ল।

চারটে গরুর গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

গ্রামের মাতব্বররা কোমর বেঁধে চাঁদা আদায় শুরু করল।

তাঁরা ঠিক করেছিল, কোন রকমে দেড়শো টাকা যদি ওঠাতে পারে,

NOT FOR SALE

তাহলে যাত্রা পার্টিকে একশো টাকা দিয়ে, পঞ্চাশ টাকা থাকবে পিণ্ডদানের জন্য।

বরাত ভাল, প্রায় দুশো টাকা উঠে গেল।

প্রথমে অনেকেই ভেবেছিল, টাকা পয়সা দেবে না, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাত্রা শুনবে। তারপর যখন শুনল কড়াকড়ি ব্যবস্থা হবে, বিনামূল্যে দেখার সুবিধা নেই, তাছাড়া উদ্বৃত্ত অর্থ গয়ায় পিণ্ডদানে খরচ হবে, তখন আর কেউই দ্বিরুক্তি করল না।

জনার্দন খুড়ো প্রোপ্রাইটরকে পোস্টকার্ড ছেড়ে দিলেন।

যেখানে হাট বসে, বিলের ধারের মাঠ, সেখানটাই পরিষ্কার করা হল যাত্রার আসরের জন্য। পাড়ার উৎসাহী ছেলেরা গাছে গাছে হাতে লেখা প্ল্যাকার্ড আটকে দিল।

আসিতেছে, আসিতেছে, আসিতেছে!

বহুদিন পরে আনন্দ সংবাদ!

দি দিগ্বিজয় যাত্রাপার্টির যুগান্তকারী সৃষ্টি

'কুরুক্ষেত্র'!!

আগামী সতেরই বৈশাখ, হাটতলার মাঠে।

সবই ঠিক হল, শুধু একটু ভয় ছিল। কালবৈশাখীর সময় ঝড় বৃষ্টি হলেই মুশকিল।

তবে একটা ভরসার কথা এই যে, এবার ঝড়বৃষ্টির জোর কম।

আসরের দিন তিনেক আগে পশুপতি ধাড়া একবার সরেজমিনে তদারকে এল।

পোস্টার দেখে একটু গম্ভীর। বলল, সবই করলেন, প্রোপ্রাইটরের নামটা দিলেন না? দি দিগ্বিজয় যাত্রা পার্টির পরিচয়ই তো এই পশুপতি ধাড়া।

তারপর যাত্রার আসর কোথায় হবে, কোথায় সাজঘর হবে, সব দেখল। জনার্দন খুড়োকে বলল, খাবার ব্যবস্থা কি হবে? আমাদের লুচি মাংস ছাড়া গলা খোলে না।

জনার্দন খুড়ো পরিষ্কার বললেন, লুচি মাংস পারব না। ঢালাও খিচুড়ির বন্দোবস্ত করব। তার সঙ্গে মাছ ভাজা। আপনাদের লোক ক'জন?

তা সব নিয়ে সাতাশজন।

NOT FOR SALE

ঠিক আছে, অসুবিধা হবে না। আরম্ভ করবেন ন'টায়?

উঁহু ন'টায় নয় দশটা। দশটা থেকে ভোর চারটে। একেবারে জমজমাট ব্যাপার। দেখবেন এই সময়ের মধ্যে লোকে হাঁ করতে ভুলে যাবে। বিশেষ করে মহামানী দুর্যোধনের পার্ট দেখে।

দুর্যোধনের পার্ট কে করে?

পশুপতি ধাড়া পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসল। কোন উত্তর দিল না।

সতেরই বৈশাখ। রাত দশটায় যাত্রা আরম্ভ, সাতটা থেকে হ্যারিকেন হাতে লোক আসতে শুরু করল দলে দলে। ভিন গাঁয়ের লোকেরাও এসে ভিড় করল। তাদের আটকানো গেল না।

যাত্রার লোকেরা সাজতে শুরু করেছিল ছ'টা থেকে। নির্বিবাদে সাজবার যো আছে। গাঁয়ের ছেলের পাল সাজঘরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বিরক্ত করছিল। দুর্যোধনের গোঁফই পাওয়া গেল না। পাড়ার কোন ছেলে সরিয়ে ফেলেছিল। আবার গোঁফের ব্যবস্থা হল।

প্রায় সকলের সাজ হয়ে যেতে পশুপতি ধাড়ার খেয়াল হল, আরে বিজেটা গেল কোথায়? তার ছিকেষ্টর মেক-আপ বেশ টাইম নেবে।

খোঁজ খোঁজ, এদিক-সেদিক সবাই খুঁজতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পর পাওয়া গেল। গাঁয়ের এক ছেলেই আবিষ্কার করল। এক পাকুর গাছতলায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে।

পশুপতি ধাড়া প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে বিড়ি খাচ্ছিল, খবর শুনে তেতে লাল। বলল, বালতি করে জল নিয়ে বিজেটার মাথায় ঢেলে দাও নির্ঘাৎ গাঁজা টেনে মরেছে।

জল ঢালতে হল না। দুঃশাসন আর ভীম তার দুটো হাত ধরে হেঁচকা টান দিয়ে তুলল। বিজে জড়ানো গলায় বলল, একি বাবা, স্বর্গেও অশান্তি? বিষ্টুর সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা বলছিলাম, তাতেও বাধা। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজে ধাতস্থ হল। মেক-আপ নিতে বসে গেল।

দশটায় যাত্রা আরম্ভ হবার কথা, শুরু হল সাড়ে দশটায়।

যাত্রা বেশ জমে উঠেছিল। দুর্যোধন বার দুয়েক হাততালি পেল। তা পশুপতি ধাড়াকে মানিয়েছেও চমৎকার। বাজখাঁই গলায় খুব চেঁচাচ্ছে।

NOT FOR SALE

গোলমাল শুরু হল শ্রীকৃষ্ণ আসরে ঢুকতে। ঢোকা ঠিক নয়, শ্রীকৃষ্ণ শুয়েই ছিল। পায়ের কাছে অর্জুন, শিয়রে দুর্যোধন।

পালায় আছে শ্রীকৃষ্ণ কপট নিদ্রা ত্যাগ করে উঠে প্রথমে অর্জুনকে দেখতে পাবে, যদিও দুর্যোধন আগে থেকে বসে আছে।

কনসার্ট চলছে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। শ্রীকৃষ্ণের ওঠার কোন লক্ষণ নেই।

লোকেরা অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

দুর্যোধন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রমাদ গনল। কপট নয়, শ্রীকৃষ্ণের আসল নিদ্রা চলেছে! নাসিকা গর্জনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কনসার্টের জন্য সে আওয়াজ অবশ্য আসরে পৌঁছাচ্ছে না। কনসার্ট থামলেই শোনা যাবে।

ফিস ফিস করে দুর্যোধন বলল, এই বিজে,বিজে, উঠবি না কি? লোক কতক্ষণ বসে থাকবে?

শ্রীকৃষ্ণ গভীর নিদ্রামগ্ন।

দুর্যোধন আর পারল না। এভাবে চললে তো রাত কাবার হয়ে যাবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা আর হবে কখন? হাতটা বাড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণের ঘাড়ে মোক্ষম এক চিমটি কাটল সে।

ওরে বাপ, কি ছারপোকা। ঘুমোবার উপায় আছে! শ্রীকৃষ্ণ লাফ দিয়ে উঠল।

সারা আসর হেসে খুন।

দুর্যোধনবেশী পশুপতি ধাড়া পাকা অভিনেতা। মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, কেন পরিহাস করছেন যদুপতি, আমি আপনার দেহে অঙ্গ সঞ্চালন করছিলাম।

কিন্তু যদুপতি তখন নেশায় মশগুল। বললে, বাপস, ওর নাম অঙ্গ সঞ্চালন! আমার শরীরে কালসিটে পড়ে গেছে!

আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল।

এরপর সে দৃশ্য আর জমবার কথা নয়। কোন রকমে শেষ করা হল।

সাজঘরে গিয়ে পশুপতি ধাড়া বিজের গলা টিপে ধরল, তোকে আজই খুন করে ফেলব। কতদিন বলেছি না গাঁজা টেনে আসরে নামবি না। দিগ্বিজয় যাত্রা পার্টির একটা প্রেসটিজ নেই?

NOT FOR SALE

সবাই মিলে বিজেকে ছাড়িয়ে নিল। টিপুনির চোটে বিজুরও কিছুটা জ্ঞান ফিরে এর্সেছিল। সে বলল, আর এমনটি হবে না। দেখ না, সব সিন কেমন জমিয়ে দিই!

তারপর গোটা দুয়েক সিন শ্রীকৃষ্ণ ভালই করল।

এক জায়গায় একটু গোলমাল করে ফেলেছিল, কিন্তু সামলে নিয়েছে। সেই যেখানে অর্জুন মুহ্যমান, সামনে আত্মীয়কুটুম্ব দেখে কিছুতেই লড়াই করতে চাইছে না, আর শ্রীকৃষ্ণ তাকে উত্তেজিত করছে, তাতেও সফল না হয়ে জ্ঞানের বাণী আওড়াবে, সেই দৃশ্যটায়।

অর্জুন তো যথারীতি একেবারে ঠাণ্ডা। গাণ্ডীব ফেলে দিয়ে হেঁটমুণ্ডে দণ্ডায়মান। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাঁ করল। বিরাট এক হাঁ।

পালায় আছে, সেই হাঁ দেখে অর্জুন বিহ্বল। সৃষ্টি লয় সব কিছু সেই গহ্বরে। সব কিছুর কারণ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন নিমিত্ত মাত্র। এইখানে অর্জুনের বেশ লম্বা বক্তৃতা ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ, কি দেখছ? বলার পর অর্জুন 'পোজ' নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মুখের বিস্মিত ভঙ্গী করে। বিশ্বরূপ দর্শন করছে!

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নেশা বোধ হয় তখনো পুরো কাটেনি। তাই সে আবার বলল, কি দেখছ ধনঞ্জয়, টনসিল?

বলেই তার চেতনা হল। সামলে নিয়ে নিজের পার্ট বলতে আরম্ভ করল। ভাগ্য ভাল, জোর বাজনা চলায় টনসিলটা আসরের কেউ শুনতে পেল না।

এ সিনটা উতরে গেল।

এরপর শ্রীকৃষ্ণের লম্বা বিরাম। দুর্যোধনের উরু-ভঙ্গের সিন, তাকে আসরে নামতে হবে। ভীমকে ইঙ্গিত করবে দুর্যোধনের উরুতে অন্যায়ভাবে গদা দিয়ে আঘাত করতে।

গরম পড়েছে অসহ্য। গাছের একটি পাতা নড়ছে না। ময়ূরের পাখা লাগানো মুকুটটা খুলে রেখে বিজে একটা টুলের ওপর বসল। একটা হাতপাখা নিয়ে নিজেকে বাতাস করতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে সামনে দ্রৌপদী। তার আর বিশেষ পার্ট নেই। একেবারে শেষ সিনে শুধু দাঁড়ানো। দ্রৌপদীর হাতে কলকে। শ্রীকৃষ্ণের দিকে ফিরে বলল, হবে নাকি এক ছিলিম?

NOT FOR SALE

বিজের মনশ্চক্ষে পশুপতি ধাড়ার মূর্তি ভেসে উঠল। সে মাথা নেড়ে বলল। না ভাই, পার্ট গোলমাল হয়ে যাবে।

দ্রৌপদী হেসে উঠল, দূর চাষা কোথাকার, এতে পার্ট আরো খোলে। গলার আওয়াজ ভরাট হয়।

তাই নাকি, তবে দাও, একটান টানি। বলে শ্রীকৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে কলকেটা নিল।

এক টান নয়, বেশ কয়েক টান দিয়ে দ্রৌপদীকে যখন কলকে ফেরত দিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা কাহিল। তার ধারণা হল, সে এ গাঁয়ের জমিদার। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারই আনন্দের জন্য সখীরা নাচগান করছে।

বেশিক্ষণ চোখ খুলে থাকতেও পারল না। চোখ বুজে ফেলল।

হঠাৎ মনে হল কে যেন তাকে জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। অস্পষ্ট কার কণ্ঠস্বর। এই বিজে, তোর সিন এসেছে রে। উরুভঙ্গের সিন।

অ্যাঁ। বিজে চোখ খুলল।

নে ওঠ্ গদাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

ঠক, ঠকাস, ঠক।

ভীম আর দুর্যোধন গদাযুদ্ধ চালিয়েছে। সেই সঙ্গে আস্ফালন।

এতক্ষণে বিজে উঠে দাঁড়াল। বিজেকে উঠে দাঁড়াতে দেখে যে ধাক্কা দিয়েছিল সে সরে গেল।

দাঁড়িয়ে উঠে বিজের মাথাটা বড় হালকা লাগল। মাথায় শিখি-পুচ্ছসুদ্ধ মুকুট ছিল, সেটা খেয়াল হল। সামনে থেকে মুকুটটা তুলে নিয়ে মাথায় পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্রুতপায়ে আসরে গিয়ে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে হা, হা, হো, হো, দর্শকদের মধ্যে যেন হাসির বন্যা বইতে লাগল। থামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

এই ঘোরতর গদাযুদ্ধে হাসির কি খোরাক থাকতে পারে সেটা ভীম আর দুর্যোধনের কেউ বুঝতে পারল না।

গদাযুদ্ধটা খুব জমেছিল। আসর একেবারে নির্বাক। সূচ পড়লেও বুঝি শব্দ শোনা যেত।

কায়দা করে দুর্যোধন গদাটা তুলে কয়েক পা পিছিয়ে গেল হাসির কারণ জানবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দুর্যোধনের দুটো চোখ ছানাবড়ার সাইজ হয়ে গেল।

NOT FOR SALE

ছলনাময় শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। মাথায় প্লাস্টিকের বালতি।

যাত্রার শেষে মুখের রং তোলবার ব্যবস্থা। গোটা তিনেক বালতি বসানো ছিল। দরকারের সময় পুকুর থেকে জল নিয়ে আসতে হবে। নেশার ঘোরে শিখিপুচ্ছের মুকুট ভেবে বিজে নীল রঙের প্লাস্টিকের বালতিটা মাথায় পরেছে।

এই সিনে দুর্যোধনের দারুণ পার্ট। পশুপতি ধাড়া তিনবার যে মেডেল পেয়েছিল, এই সিনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম অন্যায়ভাবে তার উরুভঙ্গ করবে, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণকে প্রতারক, মিথ্যাচারী, কপট, ঈশ্বর নামের কলঙ্ক প্রভৃতি বলে দুর্যোধন দীর্ঘ বক্তৃতা দেবে। সারা আসর হাততালিতে ফেটে পড়ে।

হতভাগা বিজের জন্য সব মাটি!

দুর্যোধন আর পারল না। গদা উঁচিয়ে বলল, তবে রে কুষ্মাণ্ড, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন! তোকে খুন করে ফাঁসি যাব।

গদাটা তুলোর নয়। পশুপতি ধাড়া অনেক যত্ন করে কাঠের গদা তৈরি করিয়েছে। তার ওপর কালো রংয়ের প্রলেপ।

বিজে জানে, ওই গদার এক ঘা পিঠে পড়লে মেরুদণ্ড একেবারে ছাতু হয়ে যাবে।

বিজে ওরে বাবারে, মেরে ফেলবে রে! বলে ঝাঁপ দিয়ে আসরে পড়ল। জনার্দন খুড়ো আর বিধুবাবু বসেছিলেন মঞ্চের সামনের দিকে। দুজনের মাঝখানে গড়গড়া। নলটা জনার্দন খুড়োর কোলের ওপর। বিজে গিয়ে পড়ল গড়গড়ার ওপর। গড়গড়া কাত। কলকে ছিটকে পড়ল বিধুবাবুর ফতুয়ার ওপর। তুবড়ির মতন আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ল।

ওরে বাপস্। বলে বিধুবাবু লাফাতে আরম্ভ করলেন। বিজে ততক্ষণে পগার পার।

পশুপতি ধাড়াও ছাড়বার পাত্র নয়। গদা ঘোরাতে ঘোরাতে সগর্জনে তার পিছনে ছুটল।

গাঁয়ের মাতঙ্গিনী দিদি তখন গোলমেলে ব্যাপার দেখে সরে পড়বার চেষ্টা করছিল। তার পক্ষে সরে পড়া একটু কষ্টকর। কারণ, ওজন প্রায় সাড়ে

NOT FOR SALE

তিন মণ। রাস্তা দিয়ে গেলে দূর থেকে মনে হত যেন একটা জালা গড়াতে গড়াতে চলেছে। ছেলেরা একবার তাকে শহরে নিয়ে গিয়েছিল সিনেমা দেখানোর জন্য। কিন্তু টিকেট কেটে বিপদ। মাতঙ্গিনী একটা সীটে ধরে না। নানান রকম কসরত করা সত্ত্বেও। তারপর ম্যানেজারকে বলে একটা টুলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই মাতঙ্গিনীর সঙ্গে পশুপতি ধাড়ার ধাক্কা।

দুজনে দুদিকে ছিটকে পড়ল।

ধূলো ঝেড়ে পশুপতি ধাড়া যখন উঠে বসল, তখন বিজে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। মাতঙ্গিনীর মুখ দিয়ে গালাগালির ফোয়ারা ছুটল, মুখপোড়া, চোখের মাথা খেয়েছিস? ভীমের সঙ্গে লড়ছিলি, নেমে এসে মেয়েমানুষের সঙ্গে লড়াই করতে লজ্জা করে না? লড়বি তো আমাকেও একটা গদা দে, দেখি তোর কত হিম্মত।

এসব কথা পশুপতি ধাড়া কানে নিল না। এখানে দেরি হলে বিজেটা চোখের আড়ালে চলে যাবে। গদা ঘোরাতে ঘোরাতে পশুপতি ধাড়া ছুটল।

বিজে দাঁড়িয়ে একটু দম নিচ্ছিল, হঠাৎ পশুপতি ধাড়াকে আসতে দেখে সে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল।

সামনেই সামন্ত বাড়ি।

ভিতর থেকে শব্দ আসছে খুট, খুট, খুট।

সামন্তবাড়ির ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে বিজের কিছুই জানা ছিল না। সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে ভাঙা পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

পিছনে গদা হাতে পশুপতি ধাড়া।

দরজাটা বোধ হয় ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল।

এদিকে যাত্রার আসরে বিরজা মল্লিক বসেছিল। থানার অফিসার-ইন-চার্জ। অর্জুন, কুন্তী আর দ্রৌপদী তাকে এসে ধরল, স্যার, বিজেকে বাঁচান। প্রোপ্রাইটর খেপলে জ্ঞান থাকে না। একেবারে খতম করে দেবে। আপনি দয়া করে উঠুন স্যার।

বিরজা মল্লিক উঠল। শুধু ওঠা নয়, ছুটতে আরম্ভ করল। বিরজা মল্লিক ছুটতে, যাত্রার আসরে পিছনে বসা দুজন পুলিশও ছুটল। স্যারের পিছনে ছোটা তাদের চিরকালের অভ্যাস।

সামন্ত বাড়ির সামনে এসে বিরজা মল্লিক একটু ইতস্ততঃ করল, তারপর বিজে আর পশুপতিকে ঢুকতে দেখে, ঢুকে পড়ল। অগত্যা পুলিশ দুজনও।

NOT FOR SALE

বিজে ঢুকতেই দেখল একটা কঙ্কাল। কঙ্কালের দুটো চোখে আগুনের শিখা। কঙ্কাল ঠেলে বিজে পিছনে চলে গেল।

এদিকে বিজেকে দেখেই পশুপতি ধাড়া যে গদা ছুঁড়ে মেরেছে, সেইটা তীব্রবেগে কঙ্কালের ওপর এসে পড়ল। কঙ্কাল গুঁড়িয়ে চূর্ণ বিচুর্ণ।

এতক্ষণ ঘরের মধ্য থেকে যে খুটখাট শব্দ আসছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

তুই কোথায় পালাবি দেখি। পাতালে ঢুকলেও তোকে আমি টেনে বের করব। তোর জন্য দি দিগ্বিজয় যাত্রাপার্টির ইজ্জত আজ ধুলোয় মিশেছে। তোকে শেষ করে তবে আমি অন্নজল স্পর্শ করব।

এ ঘরে হ্যাজাকের আলো জ্বলছিল, চেঁচামেচি হতেই কে আলো নিভিয়ে দিল। সব অন্ধকার।

ভিতরে অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ। মাঝে মাঝে পশুপতি ধাড়ার গদার আঘাত। সেই সঙ্গে আর্তনাদ, ওরে বাবারে, গেলুম রে!

বিরজা মল্লিক বিপদে পড়ল। বিজে হয়তো খুনই হয়ে গেল। পশুপতি ধাড়া যেভাবে গদা ঘোরাচ্ছে কিছুই বিচিত্র নয়।

হঠাৎ তার নিজের কোমরে গোঁজা টর্চ আর রিভলভারের কথা মনে পড়ে গেল। এক হাতে টর্চ টিপল। অন্য হাতে রিভলভার বাগিয়ে ধরল। টর্চের আলোতে সব দেখে বিরজা মল্লিকের চক্ষুস্থির।

বিজে কোথাও নেই। গদার আঘাতে জনতিনেক লোক পড়ে আছে। তাদের পরনে কালো গেঞ্জি আর কালো পাজামা। পশুপতি ধাড়ার জ্ঞান নেই। সবেগে গদা ঘুরিয়ে চলেছে সে।

টর্চের আলো ঘুরিয়ে বিরজা মল্লিক এদিক ওদিক দেখল।

এক কোণে কালো রঙের একটা মেশিন। পাশে ছোট সাইজের অনেক বাক্স। গোলমেলে ব্যাপার বুঝতে বিরজা মল্লিকের একটুও দেরি হল না। লোকগুলোর দিকে রিভলবার লক্ষ্য করে বলল, উঠে দাঁড়াও তিনজনে, যদি বাঁচতে চাও।

তিনজনে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে মোটা লাঠি হাতে পুলিশ দুজনও এসে হাজির হয়েছে।

কিসের মেশিন ওটা?

NOT FOR SALE

একজন ভীত কণ্ঠে বলল, আজ্ঞে নোট ছাপাবার।

ও, এখানে তাহলে নোট ছাপানো হয়। তাই লোককে ভূতের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কঙ্কালের চোখে লাল কাগজ আটকে ভয় দেখাবার চেষ্টা! জাল নোট ছাপাবার কারবার চলেছে।

আমরা কিছু জানি না হুজুর, মালিক জানে।

চোপরাও। এই বাঁধো তিনজনকে পিছমোরা করে।

পুলিসরা এগিয়ে গিয়ে তিনজনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। পশুপতি ধাড়া তখনও গদা ঘুরিয়ে চলেছে।

আঃ, কি হচ্ছে মশাই, গদা থামান! বিরজা মল্লিক কড়া ধমক দিল। পশুপতি থতমত খেয়ে থেমে গেল।

বিরজা মল্লিক এগিয়ে গিয়ে ছোট বাক্সগুলো খুলল।

কোনটাতে পাঁচ টাকার নোট, কোনটাতে দশ। সবই অবশ্য জাল।

বিরজা বলল, পশুপতিবাবু, আপনি এসবের সাক্ষী। জবর একটা কেস পাকড়াও করা গেছে। কিন্তু আর একজন সাক্ষী পেলে হত। বিজুবাবু কোথায়?

বিজেটাকে আমিও খুঁজে পাচ্ছি না। — পশুপতির স্বীকারোক্তি।

বিরজা মল্লিক পশুপতি ধাড়ার কথায় চিন্তিত হয়ে পড়ল তাই তো, এ ঘরের একটাই তো দরজা। সে দরজা আগলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কোথায় যেতে পারেন বিজুবাবু?

টর্চের আলো ঘরের চারদিকে ফেলে বিরজা মল্লিক চেঁচাল, বিজুবাবু, কোথায় আপনি?

ক্ষীণকণ্ঠ ভেসে এল, এই যে আমি ওপরে।

বিরজা মল্লিক চমকে উঠে টর্চের আলো ওপর দিকে ফেলে দেখল, কড়িকাঠে বাঁধা একটা দড়ি ধরে বিজে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে।

নেমে আসুন মশাই।

কি করে নামব?

যে ভাবে উঠেছেন। কিভাবে উঠেছি জানি না। গদার ভয়ে উঠে পড়েছি।

এদিক-ওদিক দেখে বিরজা মল্লিক দেখতে পেল, জানালার পাশে মোটা একটা পাইপ ছাদ পর্যন্ত উঠেছে। বোঝা গেল, ভয়ে জ্ঞানশুন্য হয়ে এই পাইপ

NOT FOR SALE

বেয়ে বিজে উঠেপড়ে ওই দড়ি আশ্রয় করেছে। বিরজা মল্লিক পুলিসদের দিকে ফিরে বলল, এই, ওকে নামাবার ব্যবস্থা কর। বিরজা মল্লিক তো বলে খালাস; কিন্তু কড়িকাঠ থেকে বিজেকে নামাবে কি করে?

বুদ্ধি করে একজন পুলিস মেশিনের ওপর উঠে পড়ল। আর একজন তাকে চেপে ধরল। মেশিনের ওপর দাঁড়ানো পুলিস দুটো হাত বাড়িয়ে বলল, নিন, ঝাঁপ দিন, কোন ভয় নেই।

বিজে চেঁচাল, রাম, দুই, তিন।

তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে একেবারে পুলিসের কোলে।

বিরজা মল্লিক বলল, এই যে বিজুবাবু, আপনিও একজন সাক্ষী। এখানে একটা সই করুন।

বিজে বলল, আমার নাম বিজিতেন্দ্র মোহন নায়ক। কোথায় সই করতে হবে বলুন।

পুলিস দুজনকে সামন্ত বাড়িতে রেখে বিরজা মল্লিক তিনজনকে বেঁধে নিয়ে গেল। পিছন পিছন পশুপতি ধাড়া আর বিজে।

কিছুটা এসে পশুপতির খেয়াল হল, আরে আমার গদাটা ফেলে যাচ্ছি যে। আমার এত সাধের গদা।

বিজে বলল, আর আমার শিখিপুচ্ছ, মানে প্লাস্টিকের বালতি।

———

NOT FOR SALE

সীমানা ছাড়িয়ে

।। এক ।।

বাঁদিকে তালপুকুর। তার পাশ দিয়ে সরু রাস্তা। কোন রকমে একটা লোক পায়ে হেঁটে যেতে পারে।

মোহন সে রাস্তা দিয়ে গেল না। ওখান দিয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি তাদের গাঁয়ে পৌঁছানো যাবে। হাতে অঢেল সময়। অত তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবার তার দরকার নেই। সত্যি কথা বলতে কি, বাড়িতে যেতেই তার ভাল লাগে না।

বাড়ি গেলেই ঠিক কোন না কোন কাজ তার ঘাড়ে পড়বে। সৎমা যেন তার জন্য কাজ নিয়ে তৈরি থাকে।

বাচ্চাটাকে ধর, কিংবা বাগানের বেড়াটা আলগা হয়ে গেছে। একটু শক্ত করে বেঁধে দে, না হয় সুপারিগুলো রোদে দিয়ে আয়।

অথচ বাড়িতে ঝি আছে, মালী আছে, কিন্তু মোহনকে দেখলেই সৎমার কাজ করাতে ইচ্ছা করে।

তাই মোহন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে না। সাত রাজ্যি ঘুরে বেড়ায়। কোনদিন মাঠ পার হয়ে, সাঁকোর ওপর দিয়ে স্টেশনে গিয়ে বসে। ট্রেন দেখতে তার খুব ভাল লাগে। একটা ট্রেন এসে দাঁড়ায় আর তার কামরাগুলো থেকে হুড় হুড় করে লোক নামে। কিছুক্ষণের জন্য হৈ চৈ।

গার্ডের সবুজ নিশান দোলানোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন তার অজগর দেহটা দুলিয়ে তেপান্তরের দিকে পাড়ি দেয়।

স্টেশন আবার ফাঁকা। গোলমাল থেমে যায়।

কোন কোনদিন মোহন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। এই সময় তার সঙ্গী বিশেষ কেউ থাকে না। সবাই স্কুল ফেরত সোজা বাড়ি চলে যায়। বলে, না ভাই, না গেলে মা ভাববে।

মোহন তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরলে তার সৎমা চিন্তিত হয় না, বিরক্ত হয়। বলে, কাজের ভয়ে কোথায় টো টো করে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছিল

NOT FOR SALE

এতক্ষণ? যেমন দেরি করে এসেছ, তেমনি তোমার খাওয়া বন্ধ। আর খাওয়া পাবে সেই রাত্রে।

মোহন কিছু বলে না। চুপচাপ নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর চাটাইয়ের উপর বইখাতা ছড়িয়ে খিড়কি-পুকুরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে আসে, একটু পরেই বিন্দুর মা এসে হেরিকেনটা জ্বালিয়ে রেখে যায়।

মোহন গামছা দিয়ে হাত-পা মোছা শেষ করার আগেই বিন্দুর মা আবার ঘরে ঢোকে। হাতে কলাইয়ের বাটি। তাতে তেল-নুন মাখা মুড়ি। মাঝে মাঝে তাতে কড়াই শুঁটিও ছড়ানো থাকে। নাও, খেয়ে নাও।

গালাগাল বকুনিতে মোহনের কষ্ট হয় না। এসব তার গা সওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু নরম সুরের কথা শুনলেই মোহনের দুটো চোখ জলে ভরে আসে।

ঝি বিন্দুর মা মোহনের মায়ের আমলের লোক।

মায়ের কথা মোহনের খুব আবছা মনে আছে। অনেক আগের কোন স্বপ্ন দেখার মতন। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, তার যে কোনদিন মা ছিল, এটাই যেন স্বপ্ন।

মা মারা যাবার পর সৎমা এল বাড়িতে। কিন্তু তার এই নতুন মা ভালো না; বড় কষ্ট দেয় মোহনকে।

বাড়ির দিকে নজর দেবার সময় নেই বাবার। সকাল বেলা চা-রুটি খেয়ে সাইকেলে চড়ে বের হয়ে যায়।

খালের ধারে কাপড়ের দোকান।

পাশাপাশি তিনটে কাপড়ের দোকান, তার মধ্যে মহামায়া বস্ত্রালয়ের বিক্রি সবচেয়ে বেশি। এই মহামায়া মোহনের মায়ের নাম। পৃথিবী তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও মোহন মায়ের সন্ধান পাবে না। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে যেমন আলোর শিখা হারিয়ে যায়, তেমনই মোহনের মা-ও হারিয়ে গেছে। শুধু ওই সাইনবোর্ডের ওপর জ্বলজ্বল করে মায়ের নামটা। স্কুল ফেরত মোহন খালের ধারে এসে দাঁড়ায়। দূর থেকে মায়ের নামটার দিকে চেয়ে থাকে। বানান করে করে পড়ে। কাছে যাবার সাহস নেই, কি জানি যদি বাবার চোখে পড়ে যায়।

সেদিন এক কান্ড ঘটল। স্কুল ফেরত মোহন সোজা মজুমদারদের বাগানে ঢুকল। এক সময় সাজানো বাগান ছিল, ইদানীং আগাছায় ভর্তি।

NOT FOR SALE

মজুমদাররা সবাই শহরে থাকে। কালেভদ্রে এখানে আসে। সব কিছু দেখে মালী। মোহন একলা নয়, সঙ্গে পল্টু আর শিবু। দু'জনেই সমান ডানপিটে।

পল্টুর খবর, গাছে নাকি কামরাঙ্গা পেকে লাল হয়ে আছে। বেশি উঁচুতে নয় হাত বাড়িয়েই পাড়া যায়।

মোহন মোটেই কামরাঙ্গার ভক্ত নয়। শুধু সময় কাটাবার জন্য সে এদের সঙ্গে এসেছে। সোজা বাড়ি যাবার তার একটুও ইচ্ছা নেই।

পল্টু আর শিবু যখন একমনে কামরাঙ্গা পাড়ছিল, তখন হঠাৎ মালীর আবির্ভাব। মালী গাছের আড়াল দিয়ে একেবারে সামনে এসে পড়েছে। সে বলল, এই যে, কামরাঙ্গা—

কিন্তু সব কথাটা আর তার বলতে হলো না। শিবের হাতের একটা ঢিল সবেগে এসে পড়ল মালীর কপালে।

ওরে বাবারে, বলে চীৎকার করে মালী মাটির ওপর বসে পড়ল।

পল্টু শিবু আর মোহন তিনজনেই হাওয়া।

এদিক-ওদিক ঘুরে মোহন যখন বাড়ি ফিরল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। কিন্তু উঠোনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াতে হলো।

মালী বসে হাউমাউ করে কাঁদছে, দেখে মনে হলো, সে অনেক আগেই নালিশ করতে এসেছিল। যা কিছু বলার সবই বলা হয়ে গিয়েছিল। মোহনকে চোখের সামনে দেখে আবার তার শোক নতুন করে জেগে উঠল।

মালীর সামনে নতুন মা দাঁড়িয়ে। হেরিকেনের অল্প আলোতেও দেখা গেল, তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। মোহনকে দেখেই নতুন মা চেঁচিয়ে উঠল।—ওই যে শয়তানটা এসেছে। হ্যাঁরে হতচ্ছাড়া, হলধরকে অমনভাবে মেরেছিস কেন? আর একটু হলে যে চোখটা যেত।

মোহন জোর গলায় বলল, আমি মারিনি।

মারিসনি? হলধর মিথ্যা কথা বলছে? সর্বনেশে ডাকাত! নতুন মা ধরবার জন্য এগিয়ে আসতেই মোহন দ্রুত পিছু হটে এল। তারপরই উঃ বলে একটা আর্তনাদ করে উঠানের ওপর বসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হাতে কে তার চুলের মুঠি ধরে পিঠের ওপর আঘাতের পর আঘাত করতে আরম্ভ করেছে।

NOT FOR SALE

মোহনের মনে হলো, মেরুদণ্ড বুঝি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে।

পিছন ফিরেই মোহন দেখতে পেল, তার বাবা উগ্রমূর্তিতে দাঁড়িয়ে, হাতে সাইকেলের পাম্প। সাইকেলটা বেড়ার গায়ে হেলান দেওয়া।

বাবার হাতে মার খাওয়া মোহনের এই প্রথম।

হাতের বইখাতাগুলো আগেই উঠোনের ওপর ছিটকে পড়েছিল। এবার বাবা তেড়ে আসতেই মোহন পাশ কাটিয়ে তীর বেগে দৌড়তে শুরু করল। রাস্তা ধরে নয়, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দৌড়ল।

এই অন্ধকারে জঙ্গল মোটেই নিরাপদ নয়। সাপখোপের ভয় আছে। কিন্তু মোহন সে সব কিছু ভাবল না। তার বুক জুড়ে দুরন্ত অভিমান। বাবা কিছু খোঁজ না নিয়েই, কেবল নতুন মায়ের কথার ওপর নির্ভর করে এভাবে তাকে মারল!

মোহন ঢিল ছোঁড়েনি। কে ছুঁড়েছে মালী হয়তো খেয়াল করেনি। মোহনকে দেখতে পেয়ে তার নামেই নালিশ করতে এসেছে। শিবু আর পল্টু বেপাড়ার ছেলে। মালী তাদের নামও জানে না। তাই যাকে চেনে তার বাড়িতেই এসে হাজির হয়েছে।

চোখের জলে সামনের সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে গেছে মোহনের। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে মোহন আবার ছুটতে আরম্ভ করল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর বাড়িতে নয়। কোনদিন আর সে এখানে ফিরবে না। তার নিজের মা থাকলে কখনো তাকে এভাবে মার খেতে হতো না। মাকে সব ঘটনা বুঝিয়ে বললে নিশ্চয় বিশ্বাস করত। মা জানত, মোহন মিথ্যে কথা বলে না।

হঠাৎ তীব্র একটা শব্দে মোহন চমকে উঠল। জঙ্গলের ওপাশ দিয়ে ট্রেন চলছে। সার্চলাইটের তীব্র আলোয় জঙ্গলের এক অংশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ট্রেনের গতি খুব জোর নয়। তার মানে স্টেশন কাছে।

মোহন মন ঠিক করে ফেলল। ট্রেনে চড়ে শহরে চলে যাবে। শহর কলকাতা। যে শহরে উঁচু উঁচু বাড়িগুলো হাত বাড়িয়ে আকাশ ছোঁবার চেষ্টা করে। গভীর রাত্রেও আলোর মায়ায় দিন বলে মনে হয়। মানুষগুলো হাঁটে না, ছোটে।

মোহন কখনো কলকাতা যায়নি। স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে যারা দু-একজন

NOT FOR SALE

গেছে, তাদের কাছে গল্প শুনেছে। চিড়িয়াখানা, লেক, মিউজিয়ম, সার্কাস আরো কত কি!

মোহনের বাবাও বেশ কয়েকবার কলকাতায় গেছে এবং এখনো যথারীতি যেতে হয় তাকে। হাওড়ায় বুঝি হাট হয়, সেখান থেকে কাপড় কিনে এনেছে দোকানের জন্য। ফিরে এসে নতুন মায়ের কাছে কলকাতার ঐশ্বর্যের কাহিনী বলেছে।

গাছের তলায় বসে মোহন একটু বিশ্রাম করল। একটানা ছুটে দুটো পা-ই টনটন করছে। খিদেও কম পায়নি। সেই ভোর বেলা ভাত খেয়ে স্কুলে গিয়েছিল। টিফিনের সময় একটা পেয়ারা আর গোটা কয়েক কুল খেয়েছে।

বেশিক্ষণ বসে থাকতে মোহনের সাহস হলো না। ঘাসের মধ্যে সাপ কিংবা বিছা থাকতে পারে।

এতক্ষণ সে বাঁচা-মরার কথা ভাবেনি। বাড়ির লোকদের ওপর, পৃথিবীর ওপর তার বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল।

কিন্তু ট্রেনটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁচবার ইচ্ছা মনে জাগল। আর জাগল শহরে যাবার ইচ্ছা।

স্টেশনে পৌঁছে মোহন একটা বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল।

কাছেই কেরোসিনের আলো। সেই আলোতে দেখল, দুটো হাতে কালসিটে পড়েছে। মার আটকাবার জন্য হাত তোলার সময় চোট হাতের ওপর পড়েছে।

দু' পায়ে রক্তের ধারা। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছোটবার সময় খেয়াল ছিল না, কাঁটাগাছের ওপর পা গিয়ে পড়েছিল।

মোহন আস্তে আস্তে উঠে টেপাকলে পা ধুয়ে নিল, মুখহাতও। তারপর বেঞ্চে ফিরে এসে পকেটে হাত দিয়ে দেখল, প্রায় চল্লিশ পয়সা রয়েছে। রোজ বাবার দেওয়া জল-খাবারের পয়সা জমিয়ে রেখেছিল। ইচ্ছা ছিল সামনের বিশ্বকর্মা পূজার আগে ঘুড়ি আর সুতো কিনবে।

কিন্তু এখনই কিছু মুখে না দিলে মোহন দাঁড়াতেই পারবে না। মারের ব্যথা তো রয়েইছে, তার ওপর পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে। খিদের যন্ত্রণায়।

NOT FOR SALE

স্টেশনের পাশেই দোকান। লুচি আছে, ডাল, তরকারি, কিছু মিষ্টি। মোহন লুচি আর তরকারি খেল কুড়ি পয়সার।

পয়সা দিয়ে স্টেশনে এসে খেয়াল হলো, পকেটে আর মাত্র কুড়ি পয়সা আছে। সর্বনাশ, কলকাতা যাবার ভাড়া? মাত্র কুড়ি পয়সায় নিশ্চয় কলকাতা যাওয়া যায় না। অথচ বাড়ি ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়।

যেখানে টিকিট দেয় মোহন পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। ভিতরে একজন লোক খুব মনোযোগ দিয়ে মোটা একটা বই পড়ছে। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল।

মোহন জিজ্ঞেস করল, কলকাতার ট্রেন কখন আসবে?

লোকটা মুখ না তুলেই বলল, আটটা পঁচিশ।

মোহন নীচু হয়ে দেখল। লোকটার পিছনের দেয়ালে একটা বড় ঘড়ি। সেই ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। এখনো ট্রেন আসতে প্রায় ঘন্টাখানেক।

আবার মোহন স্টেশনের বেঞ্চে গিয়ে বসল।

দু'একজন করে লোক জমছে স্টেশনে। প্রায় সকলেরই কাঁধে গোটানো বিছানাপত্র, হাতে লাঠি।

এক সময় ট্রেন এল। স্টেশন কাঁপিয়ে। ঝম-ঝম-ঝম।

ট্রেনের অবস্থা দেখে মোহনের চোখ কপালে উঠল। কামরায় লোক যেন উপচে পড়ছে। পাদানিতে পর্যন্ত লোক। কি করে মোহন ট্রেনে উঠবে? পা রাখবারও স্থান নেই।

এক জায়গায় গোটা চারেক লোক নামল। উঠল আরো বেশি। মোহনের যখন খেয়াল হলো, দেখল লোকগুলোর ধাক্কায় সে কামরার মধ্যে ছিটকে পড়েছে—বিরাট এক বিছানার বাণ্ডিলের পিছনে।

ট্রেন ছাড়তে লোকগুলোর কথায় বুঝতে পারল, কয়েক স্টেশন পরেই বিরাট এক মেলা শুরু হয়েছে। জায়গাটার নাম শুকদেবপুর। সেই স্টেশনেই অনেক লোক নেমে যাবে।

চোখ ঘুরিয়ে মোহন এদিক ওদিক দেখল। কাছের বেঞ্চে তার বয়সী একটি ছেলে বসে আছে। সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে।

মোহনের চোখ তার দৃষ্টির সঙ্গে মিলতেই সে প্রশ্ন করল, তোমার সারা গা এত কেটে গেল কি করে?

NOT FOR SALE

মোহন একটু ইতস্ততঃ করল, তারপর বলল, সাইকেল থেকে পড়ে গেছি।

কোন ওষুধ দাওনি?

মোহন মাথা নাড়ল, না।

ছেলেটি মাথার কাছে টাঙ্গানো ঝোলা থেকে একটা মলমের কৌটো বের করে মোহনের হাতে দিয়ে বলল, এটা লাগিয়ে দাও। দেখবে ব্যথা অনেক কমে গেছে।

হাতে পায়ে মলম লাগিয়ে কৌটোটা ছেলেটিকে ফেরত দেবার সময় মোহন জিজ্ঞাসা করল, কখন কলকাতায় পৌঁছাব?

রাত সাড়ে দশটা। আমরা অবশ্য তার আগেই নেমে যাব।

ছেলেটির কথা শুনে মোহন একটু চিন্তিত হলো।

ভেবেছিল, ছেলেটি যদি কলকাতা পর্যন্ত যায় তাহলে তার সঙ্গে যাবার সুবিধা হবে। অজানা, অচেনা ওই বিরাট মহানগরীতে একলা একলা মোহন কি করবে? কোথায় যাবে?

তাছাড়া ভিড় কমে গেলে টিকিট চেকার ট্রেনে উঠতে পারে।

মোহনের সামনে যদি টিকিটের জন্য হাত পেতে দাঁড়ায়, তাহলে মোহন কি করবে? তার সম্বল তো মাত্র কুড়িটা পয়সা। ছেলেটা থাকলে হয়তো কিছু সুরাহা হতে পারে। ট্রেনের কামরায় টিকিট চেকার ওঠার কথা মোহন তার বাবার কাছেই শুনেছে।

যারা টিকিট দেখাতে পারে না, তাদের চেকার নামিয়ে রেলের পুলিশের হাতে জমা দিয়ে দেয়। মোহনকেও কি তাই করবে!

ট্রেনের দোলানির সঙ্গে মোহনের ঝিমুনি এল। চোখ দুটো আর সে খোলা রাখতেই পারছে না। হেলান দিয়ে মোহন চোখ বন্ধ করল।

যখন চোখ খুলল তখন বেশ রাত। কামরায় ভীড় অনেক কম।

মোহন চোখ খুলেই সামনের বেঞ্চের ছেলেটিকে খুঁজল। সে নেই। তার সঙ্গের ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা বোধহয় তার বাবা মা-ই হবেন, কেউ নেই। কামরা জুড়ে সব নতুন লোক।

চোখে ঘুমের ঘোর রয়েছে। মোহন বেশিক্ষণ চোখ মেলে থাকতে পারল না, আবার চোখ বন্ধ করল।...

NOT FOR SALE

এবার ঘুম ভাঙ্গল হৈ চৈ চীৎকারে।

কাঁমরা খালি ট্রেন আর চলছে না। দু'জন ঝাড়ুদার মোহনের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে।

সব যাত্রী নেমে গেছে। ঝাড়ুদার কামরা পরিষ্কার করতে এসেছে।

উঠে বসতে গিয়ে মোহন টের পেল সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। গায়ে হাত রাখা যায় না এমন গরম। কাতর চোখে ঝাড়ুদারদের দিকে চেয়ে মোহন বলল, আমাকে একটু ধরবে, আমি উঠতে পারছি না।

একজন ঝাড়ুদার এগিয়ে এসে মোহনের হাত ধরল। ধরেই বলল, ইস, তোমার তো খুব বোখার হয়েছে। সঙ্গে কে আছে তোমার?

মোহন মাথা নাড়ল। কেউ নেই।

একজন ঝাড়ুদার সাবধানে মোহনকে ধরে নামিয়ে আনল। সারা প্ল্যাটফর্মে জল। একটু আগে ধুয়েছে। এখানে বসবার উপায় নেই।

ঝাড়ুদার বলল, চল, তোমাকে ওদিকে বসিয়ে দিই। মোহনকে নিয়ে সে প্ল্যাটফর্মের এদিকে এসে দাঁড়াল।

দেয়ালের ধারে একগাদা ভিখারি শুয়েবসে রয়েছে। তার মধ্যে মোহনের বয়সী অনেক ছেলেও আছে। মোহনকে সেখানে বসিয়ে ঝাড়ুদার চলে গেল।

মোহনের বসে থাকার মতো শক্তি নেই। সে প্ল্যাটফর্মের ওপর শুয়ে পড়ল। তেষ্টায় গলার ভিতরটা পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে। একটু জল পেলে হতো।

ধারেকাছে যে ভিখারির ছেলেগুলো রয়েছে, তাদের বললে টিনের কৌটো করে একটু জল নিশ্চয় এনে দেবে। কিন্তু বলতে গিয়ে মোহনের গলা থেকে স্বর বের হলো না। দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা গালের ওপর গড়িয়ে পড়ল। প্রথমে মনে হলো, রাগের ঝোঁকে বাড়ি ছেড়ে এসে সে ভুলই করেছে। এর চেয়ে নতুন মায়ের গালাগাল, মার খাওয়া ভাল ছিল। বাবার বকুনিও।

এই খোকা, এই!

প্রথমে খুব অস্পষ্ট, তারপর মোহনের কানে গেল। চোখ খুলে দেখল ভোর হয়ে গেছে। সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে। পরনে গরদের ধুতি, গায়ে গরদের চাদর। এই মাত্র স্নান করে এসেছে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। লোকটি বলল, কাদের ছেলে? এখানে শুয়ে আছ কেন?

NOT FOR SALE

অনেক কষ্টে মোহন উঠে বসে বলল, খুব জ্বর হয়েছে। উঠতে পারছি না।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। মুখ থমথম করছে। এখানে যাবে কোথায়? কে আছে তোমার শহরে?

মোহন মাথা নীচু করে রইল।

ওঠ বাবা, ওঠ। আমার সঙ্গে চল। তোমাকে সারিয়ে-টারিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আমার শান্তি। লোকটি নীচু হয়ে মোহনের একটা হাত ধরল। আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আবার বলল, ছি বাবা, মা-বাবা হচ্ছেন গুরুজন। তাঁদের ওপর কি রাগ করতে আছে! একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে, তাঁদের চেয়ে আপনজন আর সংসারে কেউ নেই। তাঁরা বকেন মারেন ভালোর জন্যেই।

স্টেশনের বাইরে এসে মোহন অবাক। এই বুঝি হাওড়ার পুল। লোহার ওপর লোহা সাজিয়ে কি বিরাট ব্যাপার, ভাবাই যায় না। ওপর দিকে দেখলে ঘাড় টন টন করে।

সামনের রাস্তা দিয়ে জনস্রোত চলেছে। কেবল মানুষ আর মানুষ। তা ছাড়া, বাস, ট্যাক্সি আর ট্রাম। অগুণতি। জীবনে মোহন এই প্রথম ট্রাম দেখল।

বাস সে দেখেছে। আর একবার জমিদার বাড়ির ছেলেরা শহর থেকে একটা ট্যাক্সি করে এসেছিল। মোহনদের স্কুলের সামনেই ট্যাক্সি থেমেছিল। স্কুলের ছেলেরা ভিড় করেছিল ট্যাক্সি দেখবার জন্যে।

পুলের তলায় ঘোলাটে জলের স্রোত। বহু লোক স্নান করছে। এই তাহলে গঙ্গা!

মোহন যখন গঙ্গা দেখতে ব্যস্ত, তখন তার পাশে নিঃশব্দে একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে, লক্ষ্যই করেনি।

নাও বাবা, উঠে পড়।

মোহন দেখল, লোকটা একহাতে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে।

মোহন জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাব?

গরীবের কুঁড়েঘরে একটু বিশ্রাম করবে। অসুখটা সেরে গেলে তোমার বাবার হাতে তোমায় তুলে দিয়ে আসব। দেশ কোথায় তোমার?

দেবীগড়। অ, বর্ধমান জেলায়। আমি গেছি তোমাদের গাঁয়ে। নাও বাবা উঠে পড়, আর দেরি করো না।

NOT FOR SALE

মোহন উঠে পড়ল। লোকটি উঠে মোহনের পাশে বসল। বসে নিজের গায়ের গরদের চাদর খুলে মোহনের গায়ে জড়িয়ে দিল।

বিশ্রী হাওয়া দিচ্ছে। এটা জড়ানো থাক।

মোহন আড়চোখে চেয়ে দেখল, লোকটার গলায় ধবধবে সাদা পৈতে। ডান হাতে সোনার তাবিজ।

প্রায় আধ ঘন্টাখানেক। অনেক গলি, উপগলি পার হয়ে ট্যাক্সি একটা বাড়ির সামনে এসে থামল।

বিরাট বাড়ি, কিন্তু জরাজীর্ণ। কার্নিশে পায়রার ঝাঁক। বট-অশথের চারা বেরিয়েছে।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে লোকটি নামল। তারপর মোহনের হাত ধরে নামাল।

ট্যাক্সির শব্দ হতেই দারোয়ান গেট খুলে দাঁড়িয়েছিল।

লোকটি দারোয়ানের দিকে ফিরে বলল, দারোয়ানজী, এই ছেলেটিকে দোতলায় নিয়ে যাও তো। এর শরীর খারাপ। শোবার ব্যবস্থা করে দাও। আমি নীচে বাবুর সঙ্গে দেখা করে যাই।

যাবার সময় লোকটি মোহনের গা থেকে গরদের চাদরটা খুলে নিয়ে বলল, যাই বাবা, আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

বাড়ির তুলনায় সিঁড়ি খুব সরু। সরু আর অন্ধকার। এত অন্ধকার যে দিনের বেলাতেও আলোর দরকার।

দারোয়ান মোহনের হাতটা শক্ত করে ধরে ওপরে উঠতে লাগল। প্রশস্ত দ্বিতল, কিন্তু জনশূন্য। পাশে সার সার কামরা। সামনের কামরার চাবি খুলে দারোয়ান মোহনকে তার মধ্যে ঢোকাল।

আশ্চর্য ঘর। একটাও জানলা নেই। অনেক উঁচুতে কেবল একটা ঘুলঘুলি। অন্ধকার চোখে সহ্য হয়ে যেতে মোহন দেখল, কোণের দিকে একটা খাটিয়া পাতা।

ওই খাটিয়ায় গিয়ে বসো, আমি তোমার জন্য বিছানা নিয়ে আসছি।

মোহন খাটিয়ার ওপর বসলে দারোয়ান চলে গেল। যাবার সময় বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

মোহন খাটিয়ার ওপর বসে এদিক ওদিক দেখল। কামরাটা যেন জেলখানার মতন। দরজা বন্ধ হলে আর বের হবার পথ নেই।

NOT FOR SALE

একটু পরেই দারোয়ান ফিরল। কাঁধে বিছানা আর কম্বল। মোহন উ দাঁড়াতে খাটিয়ার ওপর বিছানা পেতে দিল। কম্বলটা মোহনকে গায়ে জড়া বলল।

এবার একটি প্রৌঢ়া ঘরে ঢুকল।

ছোট একটা টুলের ওপর থালায় করে রুটি, তরকারি এনে রাখল। গ্লা দুধ। সামনে খাবার দেখে মোহনের তেষ্টাটা আবার জেগে উঠল।

আমাকে একটু জল দাও।

দারোয়ান চৌকাঠের কাছ বরাবর চলে গিয়েছিল। মোহনের কথা শু ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আরে ওকে অত আস্তে বললে শুনতেই পাবে না। বোবা আর কালা। যা বলবে খুব চেঁচিয়ে বলবে! আচ্ছা, আমিই বলছি।— যামিনীর মা, খোকাকে এক গ্লাস জল দাও।

প্রৌঢ়া হেসে বলল, ঝাল? তরকারি না খেয়ে ঝাল বুঝলে কি করে?

আরে কি মুশকিল, একেবারে বদ্ধ কালা।

দারোয়ান প্রৌঢ়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব চেঁচিয়ে বলল, জল, জ জল দাও এক গ্লাস।

এবার প্রৌঢ়া বুঝতে পারল, আনছি—বলে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই জল এনে রাখল।

মোহন খাওয়া শেষ করে খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ল। এখনো শরী ব্যথা আছে। জ্বরটা একটু কম।

প্রৌঢ়া থালা-গ্লাস নিয়ে যেতেই দারোয়ান বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক দিল।

ক্লান্তিতে মোহনের দু'চোখে ঘুম নেমে এল।

অনেকক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দে মোহন উঠে বসল।

ঘরের মধ্যে এত অন্ধকার, দিন কি রাত বোঝা মুশকিল। দেখল, বিরা চেহারার একটা লোক ঘরে ঢুকছে। হাতে একটা ব্যাগ। খাটিয়ার এক পা লোকটা বসে বলল, দেখি, জামাটা তোল, বুক পিঠ দেখব।

মোহন জামাটা তুলল।

হাতের টর্চ জ্বেলে লোকটা মোহনের পিঠের দিকে দেখেই বলল, ইস অনেকগুলো কালসিটের দাগ যে। পেটালে কে?

NOT FOR SALE

খুব আস্তে মোহন উত্তর দিল, বাবা।

বাবা? কি করেছিলে? লোকটার কণ্ঠস্বর যেন বাজের মতন।

তারই টর্চের আলোয় দেখা গেল লোকটার রং কুচকুচে কালো। মুখচোখের চেহারা অনেকটা গরিলার মতন। খোঁচা খোঁচা চুল। লোকটার কথায় মোহন কোন উত্তর দিল না।

প্রায় আধঘন্টা ধরে লোকটা মোহনকে পরীক্ষা করল, তারপর ব্যাগ খুলে গোটা ছয়েক সবুজ রংয়ের বড়ি বের করে দিয়ে বলল, খাবার পর আর শোবার আগে একটা করে বড়ি খাবে। আজ আর কাল। কাল এমনই সময়ে আবার আমি আসব। বলে ব্যাগ বন্ধ করে লোকটা উঠে পড়ল।

তারপর রাতের খাওয়া যামিনীর মা-ই নিয়ে এল। কলাইয়ের বাটিতে ভাত, ডাল আর আলু ভাজা।

মোহন যখন খাচ্ছে, তখন যামিনীর মা ইশারায় দেখাল। পাশেই কলঘর আছে। দরকার হলে যেতে পারে।

যামিনীর মা চলে গেল।

বাথরুমে ঢুকে মোহন দেখল চৌবাচ্চায় জল রয়েছে। একটা মগ। কোন কল নেই।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে মোহন ভাবল, কি আশ্চর্য, গরদ পরা লোকটা, যে মোহনকে হাওড়া স্টেশন থেকে এখানে এনে তুলল, সে তো সারা দিনের মধ্যে একবারও দেখা করতে এল না।

এটা কাদের বাড়ি? খেতে দিচ্ছে, ডাক্তার আসছে, সবই হচ্ছে, কিন্তু আগাগোড়া ব্যাপারটা কেমন দয়ামায়াশূন্য। রুক্ষ ব্যবহার, কঠোর কণ্ঠস্বর। ডাক্তারেরও যেন মমতার বালাই নেই।

রাত্রিবেলা ঘুম ভেঙ্গে গেল। কটা বেজেছে জানবার উপায় নেই। ঠিক পাশের ঘর থেকে একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। চাপা গলায় কে কাঁদছে। মাছে মাছে ভারী গলায় ধমকের আওয়াজ।

মোহন বিছানার ওপর উঠে বসল। দেয়ালে কান পেতে শুনল। যে কাঁদছে তার যেন খুব কষ্ট হচ্ছে। যন্ত্রণার জন্য মুখ ফুটে ভাল করে কাঁদতেও পারছে না। মোহনের মনে হলো, এটা কি হাসপাতাল! রোগের যন্ত্রণায় হয়তো কেউ চেঁচাচ্ছে। ডাক্তার ধমকে থামাবার চেষ্টা করছে।

NOT FOR SALE

পরের দিন সকালে দারোয়ান দরজা খুলে দিল। যামিনীর মা ঘরে ঢুকে এঁটো থালা তুলে নিতে এল।

যামিনীর মাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, তাই মোহন দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, রাতে কে কাঁদছিল?

দারোয়ান ভ্রূ কোঁচকাল, কাঁদছিল, কোথায়?

পাশের ঘরে বলেই মনে হলো।

দারোয়ান কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, ও পাশের ঘরে একটা পাগল আছে। মাঝে মাঝে চীৎকার করে। উত্তর দিয়ে দারোয়ান আর দাঁড়াল না। দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

মোহন ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরল। ছোট সাইজের ঘর। কতদিন তাকে এভাবে থাকতে হবে কে জানে? বাড়িতে এতক্ষণে নিশ্চয় হুলস্থূল পড়ে গেছে। রাত্রেই বাবা বেরিয়ে পড়েছে গাঁয়ের চেনা-জানা বাড়িতে। মোহনের বন্ধুদের বাড়ি। মোহনের খোঁজে। তারপর এক সময় হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছে।

মোহনের ভাবনা বন্ধ হয়ে গেল।

আবার দরজা খুলে গেল। এবার দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল বেঁটে একটি লোক। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। পরনে গেঞ্জী আর লুঙ্গী। শক্ত সমর্থ চেহারা। লোকটা বলল, কি নাম রে তোর ছোকরা? যেমন কথার ভঙ্গী, তেমনই কর্কশ কণ্ঠ।

মোহন ভয়ে ভয়ে বলল, মোহন সরকার।

বাপের নাম কি?

অভয় সরকার।

হুঁ, কি করে?

দোকান আছে। কাপড়ের দোকান।

কাপড়ের দোকানের মালিক? তাহলে দু' পয়সা আছে। তা বাড়ি থেকে পালিয়ে এলি কেন?

মোহন কেন পালিয়েছে তা বলল, সব শেষে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ জানাল, গরদ পরা লোকটি বলেছিল যে, আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। এখন আমি অনেকটা ভাল আছি, এবার আমাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন।

NOT FOR SALE

গরদ পরা লোক?-ঠাকুরমশাই? কথা শেষ করে লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। তারপর এক সময়ে হাসি থামিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠাব বৈ কি। এই বাজারে তোকে অমনি অমনি দিনের পর দিন পুষব নাকি! তোদের দেশের ঠিকানাটা কি?

মোহন ঠিকানা বলল।

লোকটা উঠে দাঁড়াল, ঠিক আছে, তোর বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। এসে তোকে নিয়ে যাবে।

লোকটা বেরিয়ে যেতেই যামিনীর মা ঢুকল। একটা মগে চা আর থালায় দু'খানা আধপোড়া রুটি।

মোহন যখন খাচ্ছে, তখনই যামিনীর মা ঘরটা পরিষ্কার করে নিল। তারপর খাওয়া হতেই মগ আর থালা নিয়ে চলে গেল।

মোহন আবার পায়চারি শুরু করল। পায়চারি করতে করতেই থেমে গেল। বাথরুমের মধ্যে ঢুকে এদিক ওদিক দেখল। এপাশে একটা জানলা আছে, কিন্তু সে জানলা খোলবার উপায় নেই। পেরেক দিয়ে বন্ধ করা।

জানলার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোর রেখা এসে বাথরুমে পড়েছে। মোহন বাথরুমের দরজা বন্ধ করে সেই ফাঁকে চোখ রাখল। উঠোনের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। এক জায়গায় সার দিয়ে অনেকে দাঁড়িয়েছে। প্রায় মোহনেরই বয়সী, কিন্তু কেউই-পূর্ণাঙ্গ নয়—কেউ নুলো, কেউ খোঁড়া, কেউ অন্ধ, কারো কোমর ভাঙ্গা, ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকালের লুঙ্গী পরা বেঁটে লোকটা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কি বলছে।

এতগুলো পঙ্গু ছেলে এখানে জড় হয়েছে কেন? সবাই কি এখানে থাকে? এটা তাদের আস্তানা! এখান থেকে সবাই ভিক্ষা করতে বের হয়? আসবার সময় স্টেশনে, গঙ্গার ধারে সামনে বাটি সাজিয়ে অনেক ছেলেকে ভিক্ষা করতে দেখেছে।

জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মোহন চুপচাপ দাঁড়াল। সব ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে।

দিন পাঁচ-ছয় একভাবে কাটল।

প্রত্যেক দিনই মোহন আশা করে, তার বাবা তাকে নিতে আসবে। দরজা খোলার শব্দ হলেই উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। কিন্তু না, কেউ এল না।

NOT FOR SALE

পরনের শার্ট প্যান্ট ময়লা হয়ে গিয়েছে। শার্টটা নিজেই কেচে নিয়েছিল। কিন্তু আবার নোংরা হয়েছে।

সাতদিন পর আবার সেই বেঁটে লোকটা এসে ঘরে ঢুকল। এবার উগ্রমূর্তি। দুটো চোখ লাল। সে বলল, কি রে, বাবার নাম-ঠিকানা ঠিক দিয়েছিলি তো?

উত্তর দেবে কি, মোহন প্রশ্নটা বুঝতেই পারল না।

উত্তর দিচ্ছিস না যে? লোকটা ধমক দিয়ে উঠল।

কাঁদো কাঁদো গলায় মোহন বলল, মিথ্যা নাম-ঠিকানা দিতে যাব কেন? বাবার নাম কেউ মিথ্যা বলে?

তা হলে তোর বাবা উত্তর দিল না কেন? একেবারে যে চুপচাপ।

এ কথার মোহন কি উত্তর দেবে! সে মাথা নীচু করে রইল। তাহলে কি বাবার মোহনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা নেই?

তা যদি হয়, তাহলে কি করবে মোহন? এরা আর কতদিন খাওয়াবে? একদিন দরজা খুলে রাস্তায় বের করে দেবে নিশ্চয়ই। তখন মোহন কোথায় যাবে? পথে পথে ঘুরে বেড়াবে?

লিখতে জানিস? লোকটা আবার গর্জন করে উঠল।

মোহনের রীতিমত অপমান বোধ হলো। সে বলল, কেন জানব না? ইংরেজি বাংলা দু-ই লিখতে জানি। আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। প্রত্যেক বছর ফার্স্ট হই।

বাবাকে ইংরেজিতে চিঠি লিখতে হবে না। বাংলাই যথেষ্ট। নে, যা বলছি লেখ। লোকটা একটা কাগজ এগিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ফাউন্টেনপেন।

মোহন ভাবল, এ একরকম ভালই হলো। নিজের কথা বাবাকে সে নিজেই লিখবে। তা হলে নিশ্চয় বাবার মন গলবে। কাগজ-কলম নিয়ে সে বলল, ঠিক আছে, আমি লিখে রাখছি।

লোকটা চোখ পাকিয়ে তেড়ে এল; ফাজলামি করিসনি। যা বলে দেবো, ঠিক তাই লিখবি। একটু এদিক-ওদিক হলে এক থাপ্পড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবো।

মোহন আর কথা বলল না। কলম ধরে চুপচাপ বসল।

লোকটা বলল, বাবাকে কি বলিস? বাবা, না আজকালকার ঢংয়ে বাপী?

মোহন বলল, বাবা।

NOT FOR SALE

তবে লেখ।—

বাবা, পত্রপাঠ মাত্র তুমি নগদ পাঁচ হাজার টাকা হাওড়া স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঘড়ির নীচে দাঁড়ানো লোকটির হাতে দেবে, তা না হলে আমাকে জীবন্ত দেখতে পাবে না। এ চিঠির তারিখ থেকে পনরো দিন পর্যন্ত এরা অপেক্ষা করবে, তার পর যা করার করবে। যদি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ কর, তাহলে কি ফল হবে আশা করি বুঝতে পারবে। ইতি তোমার আদরের মোহন।

হাতটা থর থর করে কাঁপছে। ঢিপ ঢিপ করছে বুক। তবু থেমে থেমে মোহন সবটা লিখল।

সে ভাবল, ছেলেধরার খপ্পরে পড়েছে নিশ্চয়। গরদ পরা লোকটা বোধহয় এদেরই চর।

লেখা শেষ হতে লোকটা কাগজটা ছিনিয়ে নিল— কি লিখেছিস দেখি। কাগজটা চোখের সামনে ধরে বলল, হাতের লেখাটা তো ভালই দেখছি। আমার পেটে বোমা মারলেও একটি অক্ষর বের হবে না, কাজেই পড়বার চেষ্টা করে লাভ নেই। কালুবাবুকে দিয়ে পড়িয়ে নেব। যদি দেখি একটু এদিক-ওদিক লিখেছিস, তাহলে দেয়ালে মাথা ঠুকে একেবারে ঘিলু বের করে দেবো। মনে থাকে যেন।

মোহন কোন কথা বলল না। মাথা নীচু করে রইল। এতদিন বিশেষ ভয় পায়নি। ভেবেছিল, এরা সত্যিই হয়তো বাবার হাতে একদিন তুলে দেবে। এভাবে বাড়ি থেকে চলে আসার জন্য ধমক কিংবা দু'একটা চড়-চাপড়, তার বেশি কিছু নয়। ঘরের ছেলে ঘরে চলে যেতে পারবে। কিন্তু এখন ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াচ্ছে।

পাঁচ হাজার টাকা তো অনেক টাকা। অত টাকা বাবার আছে কি না মোহনের জানা নেই। থাকলেই যে মোহনের জন্য অত টাকা বের করে দেবে, এমন সম্ভাবনা কম।

যদি টাকা না আসে, তাহলে এরা মোহনকে খতম করে দেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লোকটা ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই মোহন বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

NOT FOR SALE

লোকটার কানে বোধহয় কান্নার আওয়াজ গিয়ে থাকবে। সে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। সে বলল, কি রে, কান্না হচ্ছে কেন? দেবো গলাটা টিপে, জন্মের শোধ কান্না বন্ধ করে?

মোহন থেমে গেল। তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠে বসে বলল, বড্ড পেটের যন্ত্রণা হচ্ছে।

হোক, শুয়ে থাক মুখ বুজে। নবাবপুত্তুরের একটা না একটা লেগেই আছে। যামিনীর মাকে বলে দিচ্ছি রাত্রে কিছু খেতে না দেয়। উপোস করলেই সব অসুখ সেরে যাবে।

দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

মোহন বাথরুমের জানলায় আবার চোখ রাখল, উঠোন খালি। কেউ নেই। মোহন চোখ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখল। না, কাছাকাছি কোন গাছ নেই। অনেক কাহিনীতে মোহন পড়েছে, ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য অনেক ছেলে জানলা ভেঙ্গে কাছাকাছি গাছের ওপর লাফিয়ে পড়েছে। তারপর ডাল ধরে ধরে নেমে—দে ছুট।

কিন্তু এখানে তা হবার উপায় নেই। গাছ তো নেইই, আবার জানলায় গরাদ। লোহার গরাদ ভাঙ্গবার সাধ্য মোহনের নেই।

মোহন বিছানায় ফিরে এল।

আজ সমস্ত দিন খাওয়া বন্ধ। সেই একবার সকালে চা আর রুটি খেয়েছে। আর কিছু পাবে বলে মনে হয় না। তবু মোহন স্নান সেরে নিল। তারপর খালি গায়ে প্যান্ট পরে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে গেল। মোহনের চেয়ে একটু বড় একটা ছেলে ভাত, তরকারি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

আনন্দে মোহন চেঁচাতে গিয়েও সামলে নিল। যাক, উপোস করে কাটাতে হবে না। লোকটা শুধু ভয় দেখাচ্ছিল।

টুলের ওপর থালা-বাটি নামিয়ে রাখতে মোহন জিজ্ঞাসা করল, যামিনীর মায়ের কি হলো?

মা'র অসুখ করেছে।

মা? তুমি তাহলে কে?

NOT FOR SALE

আমি যামিনী। নাও, খেয়ে নাও। তোমার সঙ্গে কথা বলছি দেখলে বাবুরা রাগ করবে। আমি পরে এসে বাসন নিয়ে যাব।

যামিনী সন্ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

ঝি নারকেলপাতা চিরে চিরে ঝাঁটা তৈরি করছে, সৎমা লীলা দাওয়ায় বসে তারই তদারক করছিল।

আজ ক'দিন মোহন নিখোঁজ। জলজ্যান্ত ছেলেটা কোথায় গেল, এটাই আশ্চর্য। লীলার ধারণা ছিল, রাত হলেই ঠিক গুট-গুট করে বাড়ি এসে পৌঁছবে। কিন্তু কত রাত কেটে গেল, ছেলেটার দেখা নেই।

অবশ্য মোহনের জন্য লীলার মায়া-মমতা মোটেই নেই। ইদানীং ছেলেটা বেশ বেয়াড়া হয়ে উঠেছিল। পাছে বাড়ির কাজ করতে হয়, তার জন্য স্কুল ফেরত টো টো করে এদিক-ওদিক কাটিয়ে আসত।

কতদিন বাবা বলেছে, আহা, ওকে দিয়ে কাজ করাও কেন? স্কুলের পড়ুয়া, লেখাপড়া আছে। কাজ করার জন্য তোমার তো আলাদা লোক আছে।

লীলা তেড়ে উঠেছে। আদর দিয়ে ছেলেটাকে একেবারে মাথায় তুলেছ। কি এমন কাজ করাই। সব রকম কাজ শিখে রাখা দরকার। বলা যায় কি, মানুষের জীবনে কখন কি রকম সময় আসে!

মোহনের বাবা আর কথা বলেনি। চুপ করে থেকেছে।

একথা লীলা খুবই জানে, মনে মনে মোহনের বাবা মোহনকে খুবই ভালবাসে।

তবে সেদিন সন্ধ্যায় মারের বহর দেখে লীলাও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। লীলা ভেবেছিল, বড়জোর কানটা মলে দেবে, কিংবা পিঠে একটা চড়। কিন্তু মোহনের বাবা যে অমন নির্মমভাবে মারবে, তা ভাবতেও পারেনি।

অবশ্য কারণটা পরে বুঝতে পেরেছে। সেদিন দোকানে বেশ লোকসান হয়েছিল। একদল খদ্দের কিভাবে চোখে ধুলো দিয়ে খানকয়েক কাপড় সরিয়ে ফেলেছিল, কেউ বুঝতেও পারেনি। দোকান বন্ধ করার আগে হিসাব

NOT FOR SALE

মেলাবার সময় লোকসান ধরা পড়েছিল। কাজেই মেজাজ খুব খারাপ হয়েই ছিল। তারপর বাড়িতে ঢুকতেই হলধর মালী আর লীলার অভিযোগ কানে যেতেই নিজেকে আর সামলাতে পারেনি। খেপে গিয়েছিল।

যাই হোক, পরের দিনই মোহনের বাবা খবর এনেছিল। আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত গাঁয়ের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছিল। পরের দিন স্কুলে যেতেই পল্টু আর শিবে সব স্বীকার করেছিল।

মোহনের হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনে তারা মোহনের বাবার কাছে বলেছিল, মোহন তো মালীকে ঢিল ছুঁড়ে মারেনি, মেরেছে শিবু। মোহন দূরে দাঁড়িয়েছিল। মালী মিথ্যা কথা বলেছে।

মোহনের বাবা হলধরের কাছেও গিয়েছিল। আমতা আমতা করে সে বলেছে, ঠিক বুঝতে পারিনি বাবু। দু'জনের গায়েই সবুজ জামা ছিল। এখন মনে হচ্ছে, মোহনদাদাবাবু দূরে গাছের তলায় যেন দাঁড়িয়েছিল।

ছি, ছি, ছি, মোহনের বাবার কপাল চাপড়াতে ইচ্ছা করল। ভাল করে খোঁজ-খবর না নিয়ে ছেলেটাকে এভাবে মারা খুবই অন্যায় হয়েছে। ছেলেটা কি দুঃখে আত্মহত্যা করল? মা-মরা ছেলের অভিমান একটু বেশিই হয়।

কথাগুলো লীলাকে বলতে সে কিন্তু মানতে চাইল না। সে বলেছে, না হয় ঢিলই ছোঁড়েনি, কিন্তু ওসব খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশতেই বা গিয়েছিল কেন? তুমি অত ভাবছ কেন? কোথায় যাবে? দেখো গুটগুট করে ঠিক এসে হাজির হবে।

মোহনের বাবা কোন উত্তর দেয়নি। গুম হয়ে বসেছিল। লীলা আর কথা বাড়ায়নি। সে ঠিক জানত, কয়েকদিন এখানে ওখানে কাটিয়ে মোহন বাড়িতে ফিরে আসবে।

লীলা দাওয়ায় বসে থেকেই হঠাৎ দেখল, উঠানের বাইরে গাঁয়ের পিয়ন দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতেই সে বলল, মা চিঠি।

উঠানে ঝাঁটার কাঠি ছড়ানো বলে পিয়ন আর এগলো না।

লীলা বলল, বিন্দুর মা, চিঠি নিয়ে এস তো।

এ বাড়িতে কালেভদ্রে চিঠি আসে। যা আসে লীলার বাপের বাড়ি থেকেই।

লীলা হাত বাড়িয়ে খামটা নিয়ে খুলল। কয়েক লাইন পড়েই ভ্রূ

NOT FOR SALE

কোঁচকালো। চিঠির কোণে মড়ার খুলির ছাপ। কোন ঠিকানা নেই। তলায় কোন নাম নয়।

চিঠিতে লেখা : আপনার ছেলে মোহন আমাদের আশ্রয়ে আছে। আপনি যদি তাকে ফেরত চান, তাহলে নগদ পাঁচ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঘড়ির নীচে সামনের মঙ্গলবার বেলা দুটো থেকে চারটের মধ্যে আসবেন। ইতি—তলায় কোন নাম নেই।

পাঁচ হাজার টাকা!

লীলার মনে হলো, এ চিঠি মোহনই কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। বাবার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করার ফন্দি। বারো-তেরো বছরের ছেলের পেটে পেটে কি শয়তানী বুদ্ধি! কিন্তু ছেলেটা কলকাতায় গেলই বা কি করে? এখান থেকে কলকাতা যাবার ভাড়া পেল কোথা থেকে!

লীলার মুখচোখের ভঙ্গি দেখে বিন্দুর মা জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ নতুন মা, বাপের বাড়ির খবর সব ভাল তো?

লীলা সামলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, মোটামুটি ভালই আছে সব।

চিঠি হাতে করে লীলা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর তক্তপোশের ওপর বসে ভাবতে লাগল। এ চিঠিটা মোহনের বাবাকে দেওয়া উচিত হবে না। মানুষটার মতিগতির কোন ঠিক নেই। হয়তো টাকাটা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়েই হাজির হবে। পাঁচ হাজার বড় কম নয়! একটা বদমাশ ছেলের পিছনে এত টাকা ঢালার কোন মানে হয় না।

লীলা চিঠিটা নিয়ে খিড়কি পুকুরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক দেখে চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে কচুগাছের মধ্যে ফেলে দিল। নিশ্চিন্ত, আর কোন ভয় নেই। মোহনের বাবা কিছু জানতেও পারবে না।

রাত্রে মোহনের বাবা ফিরে হাতপাখা নিয়ে দাওয়ায় বসল। গুমোট গরম। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না।

লীলা পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, আজ ফিরতে যে এত রাত হলো?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোহনের বাবা বলল, থানায় একবার খোঁজ নিয়ে এলাম। সেখানেও তো কোন খবর নেই।

সেখানে আবার কি খবর পাবে?

যদি পুকুরেও ডুবে গিয়ে থাকে, তা হলে তো লাশ ভেসে উঠবে।

NOT FOR SALE

তুমিও যেমন! মোহন খুব ভাল সাঁতার জানে। খিড়কি-পুকুর কতবার এপার-ওপার করত। জলে ডুবতে পারে না।

যদি বাসের তলায় চাপা পড়ে থাকে। দুর্ঘটনার কথা কিছু বলা যায়! আমার মন বলছে, মোহন আর নেই। বলতে বলতে শেষদিকে মোহনের বাবার গলার স্বর ভেঙ্গে গেল। কাপড়ে দু'চোখ মুছে বসে রইল চুপচাপ।

লীলা উঠে দাঁড়াল। ছেলের শোকে লোকটা মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। একবার যদি চিঠির কথা জানতে পারে, তাহলে এখনই পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে লাফাতে লাফাতে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে হাজির হবে। তার চেয়ে ক' দিন কেটে গেলে মোহন যখন বুঝতে পারবে যে, টাকা নিয়ে বাবা আসবে না, তখন সুড় সুড় করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে। ঠিক জব্দ হবে।

দিন কয়েক পর মোহনের বাবা দোকানে বসেছিল, হঠাৎ একটা ভিখারি এসে দাঁড়াল। বাবা, একটা পয়সা দাও বাবা। দু'দিন কিছু খাইনি।

মোহনের বাবা কর্মচারীর দিকে ফিরে বলল, ওকে দশটা পয়সা দিয়ে দাও তো।

কর্মচারী দশটা পয়সা নিয়ে ভিখিরির দিকে এগিয়ে দিল। ভিখারি তখন একটা মুখ-আঁটা খাম কর্মচারীর হাতে দিয়ে বলল, এটা মালিককে দিয়ে দিন।

কর্মচারী অবাক। খামটা মোহনের বাবার সামনে ফেলে দিয়ে কর্মচারী বলল, আপনার চিঠি।

আমার? ক্ষিপ্রহাতে মোহনের বাবা খামটা খুলল। গভীর মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়ল। পড়েই গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর চিঠিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি মোহনের বাবা বের হয়ে গেল।

ভিখারিটা ততক্ষণে খালের ধারে বাবলা গাছের তলায় গিয়ে বসেছিল, মোহনের বাবা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে?

খেয়াঘাটে বসেছিলাম, এক বুড়োবাবু হাতে দিয়ে বলল, এই চিঠিটা ওই দোকানের মালিককে দিয়ে এস।

বুড়োবাবু? এ গাঁয়ের?

NOT FOR SALE

এ গাঁয়ে তো কখনো দেখিনি। বুড়োবাবু খেয়ানৌকায় উঠে চলে গেল।

হুঁ। মোহনের বাবা আবার দোকানে ফিরে এল।

সব ব্যাপারটা কেমন রহস্যজনক মনে হচ্ছে। মোহন তাহলে বদমাশ লোকের পাল্লায় পড়েছে। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ধারধোর করে পাঁচ হাজার টাকা হয়তো যোগাড় করা যায়, কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা দিলেই যে মোহনকে ফিরে পাওয়া যাবে, তার কি স্থিরতা! লোভের কি শেষ আছে? আরো হয়তো টাকা চেয়ে বসবে। থানায় গিয়ে পুলিশকে চিঠিটা দেখালে হয়, কিন্তু তার ফল যে ভাল হবে না, সে কথা চিঠিতে লেখাই আছে।

মোহনের বাবা তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে দিল। চিঠিতে কি লেখা আছে, কাউকে কিছু জানাল না। শুধু বলল যে শরীরটা খারাপ। পথে বেরিয়ে সে ভাবল, জমিদার বাড়ির মেজবাবুর সঙ্গে একবার আলোচনা করে দেখলে হয়। ছেলেবেলায় একসঙ্গে তারা খেলাধুলা করেছে। সে কলকাতায় বড় চাকরি করে। খুব বুদ্ধিমান। গতকালও দোকানে আসবার সময় তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। নিজের আমবাগানে দাঁড়িয়ে গাছের তদারক করছিল। তখন বলেছিল যে, দিন পনেরো গাঁয়ে থাকবে।

মোহনের বাবা জমিদার বাড়ির দিকে সাইকেল ঘোরাল। ভাগ্য ভাল। মেজবাবু বাড়িতেই ছিল। নীচের ঘরে বসে হ্যাজাকের আলোয় বই পড়ছিল। মোহনের বাবাকে দেখে বলল, মোহন তো ভারি ভাল ছেলে। হঠাৎ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার মতন তো নয়। কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

মোহনের সম্বন্ধেই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।

তাই নাকি? বলো, কি পরামর্শ। মেজবাবু সামনের দিকে ঝুঁকে বসল।

মোহনের বাবা দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দাও। কথাটা খুবই গোপনীয়।

মেজবাবু রীতিমত আশ্চর্য হলো। চেঁচিয়ে বলল, ওরে, এখানে কে আছিস, দরজাটা বন্ধ করে দে। কেউ এলে ঢুকতে দিসনি। অপেক্ষা করতে বলবি।

দরজা বন্ধ হলো।

মোহনের বাবা পকেট থেকে চিঠিটা বের করে মেজবাবুকে দিল, পড়ে দেখ।

NOT FOR SALE

একবার, দু'বার, তিনবার পড়ল মেজবাবু। তারপর বলল, খুব সাবধানে আমাদের এগোতে হবে। একটু ভুল হলেই মোহনকে তুমি আর জীবন্ত পাবে না। এদের কোনরকম দয়ামায়া নেই।

মোহনের বাবা বলল, তাহলে উপায়?

এক উপায় আছে। পারিজাত বক্সির কাছে একটা চিঠি দিতে পারি ভদ্রলোক আমার বিশেষ পরিচিত। তাঁর সঙ্গে দেখা করো।

পারিজাত বক্সি। তিনি কে?

বিখ্যাত গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সির নাম শুনেছ তো?

তোমার কাছেই তাঁর অনেক গল্প শুনেছি।

তিনি আর নেই। পারিজাত বক্সি তাঁরই ভাইপো। এর মধ্যেই ভদ্রলোক খুব নাম করেছেন। চিঠিটা নিয়ে তাঁকে দেখাও। তিনি যদি কেসটা হাতে নেন তাহলে আর চিন্তার কিছু থাকবে না।

মোহনের বাবা বলল, কিন্তু এরা যে লিখেছে চিঠি পাবার পনেরো দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি দেরি হয়ে যায়?

মেজবাবু মাথা নাড়ল, না না, এত তাড়াতাড়ি ওরা কিছু করবে না এতগুলো টাকার ব্যাপার। নিশ্চয় বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করবে।

তাহলে তুমি চিঠিই একটা লিখে দাও, আমি গিয়ে দেখা করি ভদ্রলোকের ফি কত?

কাজ শেষ হলে ফি। এখন কিছু দিতে হবে না।

মেজবাবু দাঁড়িয়ে উঠে আলমারি থেকে চিঠির কাগজ আর কলম বের করল। চিঠি লিখে খামে এঁটে মোহনের বাবার হাতে দিয়ে বলল, শ্যামবাজারে রতন সিকদার লেন। বাঁ-হাতি লাল বাড়ি। চিনতে কোন অসুবিধা হবে না। তিনি কি বলেন, এসে আমাকে জানিও।

।। তিন।।

চিঠি নিয়ে মোহনের বাবা উঠে পড়ল। মনে মনে ঠিক করে নিল, লীলাকে একটি কথাও বলবে না। মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। কোথা থেকে কার কানে উঠে যাবে, তারপর বিপদ ঘটবে।

লীলাকে বলল যে, মাসে একবার যেমন কলকাতায় কাপড়ের গাঁট কিনতে যায়, তেমনই যাচ্ছে।

NOT FOR SALE

হাওড়া থেকে সোজা শ্যামবাজারের বাসে চড়ল। যথাস্থানে পৌঁছে পারিজাত বক্‌সির বাড়ি খুঁজে নিতেও মোটেই অসুবিধা হলো না।

একটি চাকর তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে ভিতরে খবর দিতে গেল।

একটু পরেই ভিতর থেকে এক থুড়থুড়ে বুড়ো এসে দাঁড়ালেন। বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গেছেন। একটা চোখ কালো কাঁচে ঢাকা। বোধ হয় ছানির জন্য সবে চোখ কাটানো হয়েছে। বুক পর্যন্ত ধবধবে সাদা দাড়ি। পরনে চীনে কোট আর ধুতি। বললেন, কী চান বলুন, আমিই পারিজাত বক্‌সি।

মোহনের বাবা হতাশ হলো। সর্বনাশ, এ তো বুড়ো লোক, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না, সারা শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। এত বয়সের লোক বদমাশদের কবল থেকে মোহনকে উদ্ধার করে আনবে, তাও কি সম্ভব?

মোহনের বাবা পকেট থেকে দু'খানা চিঠি—একখানা মেজবাবুর, আর একখানা মোহনের, পারিজাত বক্‌সির হাতে তুলে দিল।

অনেকটা সময় নিয়ে তিনি চিঠি দুটো পড়লেন, বিশেষ করে মোহনের লেখা চিঠি। তারপর মোহনের বাবার দিকে ফিরে বললেন, এটা আপনার ছেলের হাতের লেখা তো ঠিক?

মোহনের বাবা ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

চিঠিটা থাক আমার কাছে। আপনার বন্ধুকে বলবেন যে, কেসটা আমি হাতে নিলাম। এ চিঠিটা আপনি পেলেন কার কাছ থেকে?

ভিখারি দোকানে দিয়ে গেল। সে বলল, খেয়াঘাটে এক বুড়ো নাকি তার হাতে দিয়ে গেছে। আমি আর খোঁজ করিনি।

ভালই করেছেন। খোঁজ করলে হয়তো শুনতেন, বুড়োকে এক মাঝি দিয়েছে, মাঝিকে দিয়েছে এক কারখানার মজুর। মজুরকে দিয়েছে হাটের ডিমওয়ালা। এ চক্রের শেষ পেতেন না।

মোহনের বাবা উঠে দাঁড়াল। যাবার মুখে প্রশ্ন করল, মোহনকে আবার ফিরে পাব তো?

আশা তো করছি, তবে জোর করে কিছু বলতে পারছি না। কাল থেকেই আমি কাজে লাগব। আপনি দিন দশেক পরে মঙ্গলবার একবার খবর নেবেন। এ বাড়িতে নয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে সন্ধ্যা সাতটার সময়।

মোহনের বাবা বেরিয়ে এল।

NOT FOR SALE

পকেটের মধ্যে হাজার পাঁচেক টাকা এনেছিল। হাওড়া স্টেশনে নেমে অনেকক্ষণ এদিক ওদিক দেখছিল। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঘড়ির নীচে বিশেষ করে। তার ধারণা, মোহনের হাত ধরে কেউ হয়তো সামনে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু সেরকম কেউ এগিয়ে আসেনি।

গাঁয়ে ফিরে মোহনের বাবা মেজবাবুকে সব জানাল। তার সন্দেহের কথাও। পারিজাত বক্সি অত বুড়ো লোক, তাঁর দ্বারা কিছু কাজ হবে, এমন সম্ভাবনা কম।

মেজবাবু হেসে উঠল, পারিজাত বক্সি বুড়ো হতে যাবে কেন? একেবারে জোয়ান। বুড়োর ছদ্মবেশ ধরেছিল, তাই বুঝতে পারনি। তাঁর বয়স বছর ত্রিশের বেশি নয়।

মোহনের বাবা অবাক। অমন নিখুঁত ছদ্মবেশ ধরা কি সম্ভব!

যাই হোক, মোহনের বাবা দোকানে বসে বটে, কিন্তু খুব অন্যমনস্ক। বিক্রির দিকে একেবারে মন নেই। কেবল মোহনের কথা ভাবে। ছেলেধরাদের কথা কিছু বলা যায়! হয়তো মোহনকে মেরেই ফেলবে। মেরে ফেলে মোহনের বাবাকে মোহনের মাথাটা পার্শেল করে পাঠাবে, গোয়েন্দা কাহিনীতে যেমন পড়া যায়।

দশদিন কাটতেই এক মঙ্গলবার মোহনের বাবা কলকাতায় এসে হাজির হলো। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে যখন পৌঁছাল, তখন সাতটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি।

অনেক লোক ময়দানে বেড়াচ্ছে, কিন্তু পারিজাত বক্সিকে দেখা গেল না।

মোহনের বাবা মনে মনে বিরক্ত হয়ে গেল। যার কথার ঠিক নেই, এত বড় কাজের ভার তার ওপর দেওয়াই উচিত হয়নি।

সাতটা কুড়ি। মোহনের বাবা কি করবে যখন ভাবছে, তখন রাস্তা পার হয়ে একজন কাবুলি সামনে এসে দাঁড়াল। পরিষ্কার বাংলায় বলল, কিছু মনে করবেন না। আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

আপনি?

কাবুলি হাসল, যার এখানে অপেক্ষা করার কথা ছিল, আমি সেই

NOT FOR SALE

পারিজাত বক্সি। চলুন, ওদিকটা একটু নির্জন আছে। ওই গির্জার বাগানে বসে কথাবার্তা বলি।

দু'জনে গির্জার বাগানে গিয়ে বসল।

পারিজাত বক্সি বললেন, আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে মোহনের একটা ফটো আনতে বললে ভাল হতো, তাকে চেনবার পক্ষে আমার সুবিধা হতো।

মোহনের বাবা পারিজাত বক্সির দুটো হাত আঁকড়ে ধরল। আমার বড় ভয় হচ্ছে। মোহনকে হয়তো মেরেই ফেলবে। দশ দিন কেটে গেছে, আর মাত্র পাঁচদিন বাকি।

অবশ্য এদের অসাধ্য কোন কাজ নেই। তবে আমার মনে হচ্ছে, আপনার ছেলেকে মেরে ফেলে ওদের বিশেষ লাভ হবে না, যা করবে তা হয়তো মেরে ফেলার চেয়েও সাংঘাতিক।

সে কী ?

এ শহরে গোটা কয়েক দল আছে যারা ছোট ছেলেদের ভুলিয়ে নিয়ে এসে অন্ধ, খোঁড়া কিংবা অন্য কোন রকমভাবে বিকলাঙ্গ করে দেয়। তারপর তাদের দিয়ে পয়সা রোজগার করে। অবশ্য ওরা যথেষ্ট চালাক। এক প্রদেশের ছেলেকে অন্য প্রদেশে চালান দেয়। আপনার ছেলেকে হয়তো কানপুর কিংবা কাশীতে পাঠিয়ে দেবে, যাতে চট করে ধরা না পড়তে পারে।

তাহলে উপায় ?

আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এরকম গোটা তিনেক দলের ওপর নজর রেখেছি। পুলিশ-স্টেশনেও খবর দেওয়া আছে। আপনি শুধু মোহনের একটা ফটো আমায় পাঠিয়ে দেবেন।

কোথায় পাঠাব বলুন ?

আপনি হাওড়া রেলওয়ে পুলিশের কাছে আমার নাম লিখে জমা করে দেবেন, তাহলেই আমি পেয়ে যাব।

মোহনের বাবা উঠে পড়ল। ট্রেনে বসে ভাবতে লাগল, সব যেন ধীর গতিতে চলেছে। মোহনকে ফিরে পাবার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। মানুষ এত নির্মম হতে পারে, ভাবাই যায় না। একটা জলজ্যান্ত ছেলের দুটো চোখ কি করে নষ্ট করে দেয়, কিংবা হাত পা ভেঙে তাকে বিকলাঙ্গ করে

NOT FOR SALE

ফেলে, মোহনের বাবা ভেবেই উঠতে পারল না। এইসব বদমাশদের নিজেদের ছেলেপুলে নেই?

ট্রেন একটা স্টেশনে থামতে একটা নুলো ছেলে জানলার কাছে এ দাঁড়াল। একটা পয়সা দিন বড়বাবু। সকাল থেকে না খেয়ে আছি।

অন্যদিন হলে মোহনের বাবা মুখ ফিরিয়ে নিত। কিন্তু এবার ভাল ক ছেলেটাকে দেখল। কিছু বলা যায় না, এ হয়তো আর এক মোহন। বদম লোকেরা ধরে নিয়ে গিয়ে এভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে।

পকেট থেকে পঞ্চাশ পয়সা বের করে ছেলেটার হাতে দিল মোহ বাবা।

তারপর গ্রামে ফিরে বাড়ির কাছ বরাবর গিয়েই তাকে থমকে দাঁড়ি পড়তে হলো।

জ্যোৎস্না রাত। চারদিক দিনের আলোর মতন পরিষ্কার।

বাড়িতে ঢোকার মুখে একটা বটগাছ। তার নীচু ডালে সাদা মতন একটা বাতাসে দুলছে। মোহনের বাবা কাগজটা খুলে নিল। তাতে লেখ সাবধান। পারিজাত বক্সির সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের সর্বনাশ নি ডেকে আনছ।

এদিক ওদিক দেখে মোহনের বাবা কাগজটা পকেটের মধ্যে রেখে দি বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই লীলার সঙ্গে দেখা।

মোহনের বাবা বলল, আচ্ছা, আমাদের বাড়ি কেউ এসেছিল?

হ্যাঁ, একজন এই কাগজটা দিয়ে গেছে।

মোহনের বাবা চমকে উঠল। আবার কিসের কাগজ? একটা কাগজ গাছের ডালে আটকে দিয়ে গেছে। সে বলল, কি কাগজ দেখি!

লীলা বলল, পলাশডাঙ্গার মাঠে যাত্রা হবে—তারই কাগজ। প দেখবে, এখন রাত হয়েছে, খেয়ে নাও।

সে রাত্রে মোহনের বাবা ঘুমোতে পারল না। এ-পাশ ও-পাশ করল।

পারিজাত বক্সির কাছে যাওয়া-আসা করছে, সে খবরও বদমাশদে কাছে পৌঁছে গেছে। তার মানে, এরা সাধারণ দল নয়। মোহনের বাবা গতিবিধির ওপর নজর রাখছে।

পরের দিন মোহনের বাবা আলমারি খুলে একটা কাগজের ব্যাগ বে

NOT FOR SALE

করল। এর মধ্যে অনেক পুরোনো ফটো রাখা আছে। খুঁজতে খুঁজতে মোহনের একটা ফটো পাওয়া গেল। স্কুলে প্রাইজের সময় অন্য কয়েকজন ছেলের সঙ্গে তোলা। মোহনের বাবা কাঁচি দিয়ে মোহনের ছবিটা কেটে নিল। ভাগ্য ভাল, এই সময় লীলা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকে। নইলে হাজার কৈফিয়ত দিতে হতো।

একটা খামে ফটো আর কাগজটা পুরে এবং সেইসঙ্গে নিজেও একটা চিঠি লিখে মোহনের বাবা খামের মুখটা ভাল করে আঁটকে নিল।

এর দিন দুই পরেই কলকাতা গিয়ে রেলওয়ে পুলিশের হাতে খামটা জমা দিল সে।

পুলিশ অফিসার বলল, আপনি একটু বসুন। পারিজাতবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আমাকে বলেছেন, আপনি এলে তাঁকে ফোন করে দিতে।

মোহনের বাবা অপেক্ষা করল।

প্রায় আধ ঘন্টা পর প্যান্ট-কোট পরা একটি ভদ্রলোক পাশে এসে বলল, এনেছেন খামটা?

মোহনের বাবা ফিরে দেখল। টকটকে রং। কোঁকড়ানো চুল, মুখে পাইপ। এই কি পারিজাত বক্সির আসল চেহারা!

পুলিশ অফিসার খামটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এই যে।

আসুন আমার সঙ্গে।

মোহনের বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সে বাইরে দাঁড়ানো একটা দামী মোটরে গিয়ে উঠল। তারপর চিঠিটা পড়তে পড়তে তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

মোহনের বাবা বলল, আপনার ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও ওরা আপনাকে চিনতে পেরেছে।

হুঁ, তাই দেখছি। তবে আমিও চিনে গেছি ওদের। আস্তানার সন্ধান পেয়ে গেছি। প্রথম দিন বাড়িতে আসাটাই আপনার ভুল হয়েছিল। আপনাকে যে অনুসরণ করেছিল সে খোঁজ পেয়ে গেছে। আপনার আর আসবার দরকার নেই। দরকার হলে আমিই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। মনে রাখবেন, সর্বদাই আপনার পিছনে লোক আছে।

তাহলে আজও তো, আপনাকে ওরা দেখে ফেলেছে?

তা দেখতে পারে, তবে আমি পারিজাত বক্সি নই।

NOT FOR SALE

তবে কে আপনি? মোহনের বাবা আঁতকে উঠল। তার ভয় হলো, বদমাশের দলের কেউ হয়তো ছলনা করে তাকে নিজের কব্জায় এনেছে।

আমি পারিজাত বক্সির সাগরেদ। নাম বললে চিনবেন না, কারণ আমি নামকরা লোক নই। পারিজাত বক্সি এই মুহূর্তে চন্দননগরে গঙ্গার ঘাটে বজরায়। সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা, বদমাশদের দলকে তাই বোঝানো হয়েছে। তাদের আস্তানার দরজায় ভুল করে একটা চিঠি ফেলে রাখা হয়েছিল। তাতেই তারা চন্দননগর দৌড়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সে আস্তানায় আপনার ছেলে নেই। সে হয়তো অন্য কোন দলের পাল্লায় পড়েছে।

।। চার ।।

চারদিন কামাইয়ের পর সন্ধ্যাবেলা যামিনীর মা এল। তবু মোহন যামিনীর সঙ্গে দু'একটা কথা বলত, যদিও যামিনী হ্যাঁ বা না ছাড়া কোন উত্তরই দিত না। এই বাড়ি বা বাড়ির লোকদের সম্বন্ধে যামিনী একটি কথাও বলত না।

সন্ধ্যার সময় মোহনকে খেয়ে নিতে হতো। তার খাওয়া হলে দারোয়ান তালা দিয়ে চলে যেত।

সেদিন খাবারের ব্যবস্থা দেখে মোহন অবাক হয়ে গেল। আধাপোড়া রুটি নয়, ভাল ভাল চারখানা রুটি। সঙ্গে বেশ বড় সাইজের দু'খানা মাছ। আবার পেঁয়াজ কুচি।

মোহন বুঝতে পেরেছিল, তার বাবা আর তাকে উদ্ধার করতে আসবে না। পাঁচ হাজার টাকা জোগাড় করতে পারলেও নতুন মা সেটা দিতে দেবে না। মোহন ফিরে যাক এটা নতুন মা'র ইচ্ছা নয়।

যা চেষ্টা করার, মোহনকে নিজেই করতে হবে।

খাওয়া হতে মোহন বাথরুমে ঢুকল। সঙ্গে নিল মাছের বেশ বড় একটা কাঁটা আর কাগজের টুকরো। এই কাগজের টুকরোটা টুলের ওপর পেতে তার ওপর খাবারের পাত্র রাখা হতো।

বিকাল থেকে গানবাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। বাড়ির লোকেরা কোন কারণে হয়তো ফুর্তি করছে। সেই জন্য আজ খাবার-দাবারের এমন সুব্যবস্থা।

NOT FOR SALE

বাথরুমে ঢুকে মোহন মাছের কাঁটাটা নিজের বুড়ো আঙুলে ফুটিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

বাথরুমে রাখা দাঁতন সেই রক্তে মাখিয়ে মোহন সাবধানে কাগজের ওপর লিখল : বড় বিপদ। আমাকে বাঁচান—মোহন।

হাত ধুয়ে বেরিয়ে এসে দেখল, রোজকার মতন যামিনীর মা বসে বসে ঢুলছে। অবশ্য বাইরে দারোয়ান সজাগ। মোহনের পালাবার কোন সুযোগ নেই।

পা টিপে টিপে যামিনীর মা'র পিছনে গিয়ে মোহন কাগজটা কাঁটা দিয়ে তার থান কাপড়ে আটকে দিল, তার পর তাকে মৃদু ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিল।

যামিনীর মা উঠে বাসন নিয়ে বেরিয়ে গেল।

যদি এই কাগজ এ বাড়ির কোন লোকের চোখে পড়ে, তাহলে মোহনের অদৃষ্টে দারুণ নির্যাতন আছে, কিন্তু মোহন মরীয়া। যা হবার হবে, এভাবে বন্দী থাকার চেয়ে মরণও ভাল।

যামিনীর মা এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুটো গলি পার হয়ে আর এক বাড়ি কাজ করতে গেল। ভাগ্য ভাল মোহনের, এ বাড়ির কেউ টের পায়নি। সবাই গানবাজনায় মত্ত।

অন্য যে বাড়িতে যামিনীর মা কাজ করতে ঢুকল, সেখানে লোক মাত্র দু'জন। মা আর ছেলে। ছেলে কলেজে পড়ায়।

যামিনীর মা যখন বাসন মাজছে, তখন ছেলেটি কাগজের ওই টুকরোটি হঠাৎ দেখতে পেল। যামিনীর মা'র সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। সে কিছু শুনতেও পায় না। আস্তে আস্তে গিয়ে কাগজটা খুলে নিল।

কি ব্যাপার! কেউ যেন খুব বিপদে পড়েছে আর বাইরের লোকদের সেটা জানিয়ে দিতে চায়।

ছেলেটি আর অপেক্ষা করল না। কাগজটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

থানা কাছেই। দারোগা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল। সামনে একজন পুলিশ। কাগজটা পেয়েই দারোগা সোজা হয়ে বসল। বলল, এটা পেলেন কোথায়?

কোথায় পেয়েছে ছেলেটি বলল।

রক্ত দিয়ে লেখা বলেই মনে হচ্ছে। তলায় নাম লেখা—মোহন।

NOT FOR SALE

মোহন নামটা পড়েই দারোগা ভ্রূ কোঁচকাল। আরে মশাই, পারিজাত বক্সি তো এই মোহন নামের একটি ছেলেকে খুঁজছিলেন। লালবাজার থেকে আমরা এই রকম নির্দেশ পেয়েছিলাম। দাঁড়ান, দাঁড়ান।

দারোগা ফোন তুলে কার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর বলল, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, পারিজাত বক্সি এখনই আসছেন।

পারিজাত বক্সি এলেন প্রায় ঘন্টা খানেক পরে। সাধারণ পোশাক। এসেই প্রথমে কাগজটা নেড়েচেড়ে দেখলেন, তারপর ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের এ ঝি কোথায় থাকে জানেন?

ছেলেটি মাথা নাড়ল, হ্যাঁ জানি। একটু দূরে একটা বস্তিতে থাকে। কাজে না এলে আমাকেই মাঝে-মধ্যে খোঁজ করতে যেতে হয়। ও বোবা, কানেও শোনে না, তবে কাজকর্ম ভাল করে।

চলুন, এখনই একবার তার বস্তিতে যাব। তাকে একবার আমার দেখা দরকার।

পারিজাত বক্সি আর ছেলেটি যখন বস্তিতে এসে পৌঁছল, তখন বেশ রাত হয়েছে, কিন্তু তখনো লোকেরা জেগে। কেউ খাটিয়ার ওপর, কেউ দাওয়ায় বসে গল্প করছে।

যামিনীও বসেছিল। ছেলেটি তাকে ডাকল। তোমার মা কোথায়?

শুয়ে পড়েছে।

একবার ডেকে দিতে পার?

যামিনী মাকে ডেকে দিল। যামিনীর মা ঘুমোয়নি। ঘুমোবার আয়োজন করছিল।

ছেলেটি তখন যামিনীকে বলল, তোমার মাকে বলো, কাল ভোরবেলা যেন আগে আমাদের বাড়ি যায়। মা কালীঘাটে যাবে। আমাদের বাড়ির কাজ শেষ করে তবে অন্য জায়গায় যাবে।

যামিনী মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে, হাতের বিচিত্র ভঙ্গি করে মাকে বুঝিয়ে দিল। যামিনীর মা ঘাড় নাড়ল, বুঝেছে।

পারিজাত বক্সি ছেলেটির সঙ্গে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে বলল, এবার চলুন, আপনার বাসাটা একবার দেখে আসি।

ছেলেটি তাকে নিয়ে এসে তার বাসাটা দেখিয়ে দিল।

NOT FOR SALE

পারিজাত বলল, ঠিক আছে, কাল ভোরে আবার আমি আসব। আপনার আর বের হবার দরকার নেই। যা করার আমিই করব।

পরের দিন খুব ভোরে ছেলেটির বাড়ির সামনের ফুটপাতে আধময়লা গেঞ্জী আর হাঁটুর ওপর কাপড় পরা একটি লোককে দেখা গেল। চেহারা দেখে চাকর শ্রেণীর বলেই মনে হলো।

একটু পরে যামিনীর মা ঢুকল। লোকটি আড়াচোখে লক্ষ্য করল। প্রায় আধঘন্টা পর যামিনীর মা যখন বের হলো তখন বেশ একটু দূরে থেকে লোকটি তাকে অনুসরণ করল।

কাল ছেলেটির কাছে খবর সংগ্রহ করেছে যে, যামিনীর মা শুধু দু' জায়গায় কাজ করে। ছেলেটির বাড়ি আর সম্ভবত বদমাশদের আড্ডায়।

যামিনীর মা একটা পানের দোকানে থামল। পান আর দোক্তা কিনে মুখে দিল, তারপর আবার চলতে শুরু করল।

সরু গলি। কোন রকমে একটা মোটর যেতে পারে।

একটা বাড়িতে লোহার গেটে একটা গুর্খা দারোয়ান বসে। যামিনীর মা যেতেই সে গেট খুলে ভিতরে চলে গেল।

লোকটি বাড়িটাকে ভাল করে লক্ষ্য করল। কোন জানলা নেই। সারি সারি ঘুলঘুলি। হঠাৎ দেখলে গুদাম ঘর বলেই মনে হয়।

মিনিট দশেক। তারপরই বিরাট একটা কালো ভ্যান এসে দাঁড়াল। পুলিশ বোঝাই।

ভ্যানটা থামতেই পুলিশগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল। হাতে রাইফেল।

সঙ্গে একজন সহকারী কমিশনার। উদ্যত রিভলবার নিয়ে লোকটির পাশে দাঁড়িয়ে বলল, এই বাড়িটাই তো?

তাই তো মনে হচ্ছে।

সহকারী কমিশনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশদের নির্দেশ দিল। পুলিশরা সারা বাড়ি ঘিরে ফেলল।

ব্যাপার দেখে পথচারীর দল ভীড় করে দাঁড়াল।

সহকারী কমিশনার, ছদ্মবেশে পারিজাত বক্সি আর কয়েকজন পুলিশ মিলে গেটের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

NOT FOR SALE

একতলায় কেউ নেই। আলকাতরার অনেকগুলো পুরানো ড্রাম পড়ে রয়েছে।

সকলে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার সিঁড়ি। একজন পুলিশ টর্চ জ্বালল। সবাই ওপরে উঠতে লাগল।

দোতলায় কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পুলিশ নিজেদের অস্ত্র ঠিক করে ধরল।

সকলে ওপরে উঠে দেখল দোতলা ফাঁকা। শুধু যামিনীর মা দাঁড়িয়ে আছে। আর কেউ কোথাও নেই।

পারিজাত বক্সি অবাক হয়ে গেলেন। ছুটে এ-ঘর ও-ঘর দেখলেন, কেউ নেই। এত অল্প সময়ের মধ্যে সব গেল কোথায়?

সহকারী কমিশনার যামিনীর মাকে প্রশ্ন করল, এরা সব কোথায় পালাল? তুই নিশ্চয় জানিস, বল ঠিক করে। না হলে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাব।

পারিজাত বক্সি ছুটে এলেন। বললেন, আরে ও বোবা, কালা। ওকে কিছু বলে লাভ নেই। চলুন, ছাদে উঠে দেখা যাক।

সকলে ছোট সরু সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠল।

ঘেষাঘেঁষি বাড়ি। দুটো বাড়ির মধ্যে কোন ফাঁক নেই। সহজেই এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে যাওয়া যায়। একটা ছোট ছেলেও পারে।

সহকারী কমিশনার বলল, আশপাশের দু'একটা বাড়ি দেখলে হয়।

পারিজাত বক্সি বললেন, দেখুন। তাঁর গলায় কোন জোর নেই। এভাবে পাখি উড়ে যাবে সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। কি করে পুলিশ আসার খবর পেল, সেটাই আশ্চর্য।

ঘণ্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পর সহকারী কমিশনার পুলিশ বাহিনী নিয়ে ফিরে গেল।

আশপাশের সব বাড়িগুলো গুদাম ঘর। তুলো আছে, সর্ষে আছে, কয়লা আছে। সব আছে, কেবল বদমাশগুলোই নেই।

পারিজাত বক্সি চলে এলেন। তিনি রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এভাবে বদমাশের দল চোখে ধুলো দিয়ে পালাবে, তার পক্ষে এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা।

NOT FOR SALE

দিন দুয়েক পরে হাওড়া পুলের পাশে যেখানে সার সার ভিখারি বসে থাকে—কানা, খোঁড়া, নুলো—সেখানে নতুন এক ভিখারির আমদানি হলো। অন্ধ ভিখারি, পাকা চুল চোখের ওপর এসে পড়েছে। সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। পথচারীর দিকে হাত বাড়িয়ে কেঁদে কেঁদে পয়সা চায়।

রাত হলে আর একটি লোক এসে অন্ধের পাশে দাঁড়ায়। তার কাঁধে ভর দিয়ে অন্ধ লোকটি বড়বাজারের দিকে চলে যায়।

অন্ধ লোকটির ঠিক পাশেই বসে একটি নুলো ছেলে। দুটো হাত কনুই থেকে কাটা। সারা দিন রাস্তায় মাথা ঠুকে ভিক্ষা চায়।

কয়েক দিন পর অন্ধ লোকটি নুলো ছেলেটিকে বলল, শুনছি, সরকার থেকে আমাদের জন্য একটা আশ্রম তৈরি করে দেবে। এভাবে রোদে পুড়ে জলে ভিজে আমাদের আর ভিক্ষা করতে হবে না। তাও যদি ভিক্ষার সব ক'টা টাকা নিজে পেতাম তা হলেও কথা ছিল, কিন্তু বেশির ভাগ টাকা তো অন্য লোকে ছিনিয়ে নেয়।

নুলো চুপচাপ বসে শুনল। কোন উত্তর দিল না।

অন্ধ লোকটা আবার বলল, তোমার সব টাকা তুমি পাও?

নুলো এবার উত্তর দিল, কেন পাব না? আমার ভিক্ষা করা টাকা আবার কে পাবে! এই পয়সায় আমাকে গোটা সংসার চালাতে হয়।

অন্ধ লোকটি আর কিছু বলল না।

পরের দিন থেকে তাকে আর সে জায়গায় দেখা গেল না।

যে লোকটি অন্ধকে সকালে বসিয়ে যায় আর বিকেলে উঠিয়ে নিয়ে যায়, তাকে অন্ধ লোকটি বলল, এখানে সুবিধা হবে না। অন্য কোথাও আমাকে বসিয়ে দেবে।

কোথায় বসবেন বলুন?

মেয়ো রোডের ওপর অন্য ভিখারিদের পাশে বসিয়ে দাও, বরাত ঠুকে দেখি একবার।

সঙ্গের লোকটি বলল, মোহনের বাবা ক'দিন দেখা করতে এসে ফিরে যাচ্ছেন।

NOT FOR SALE

বেচারা মোহনের বাবা! সত্যি তাঁর কাছে আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই। সেদিন এভাবে বদমাশগুলো হাওয়া হয়ে যাবে, ভাবতেই পারিনি।

একটা কথা মনে হয় পারিজাতদা।

কি বলো?

ওই যে যামিনীর মা, ও কি সত্যি বোবা আর কালা? আমার তো সন্দেহ হয়। সম্ভবত সব খবর আগে থেকে ও-ই দিয়ে রেখেছিল। কেউ যে ওকে অনুসরণ করছে, সেটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল।

পারিজাত বক্সি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এই রকম একটা সন্দেহ আমারও হয়েছিল। বস্তিতে আমার একটা চর বসিয়ে রেখেছিলাম। সে রিপোর্ট দিল, যামিনীর মা সত্যিই বোবা এবং কালা। এ বস্তিতে যামিনীর মা বহু বছর আছে। সবাই একথা জানে।

তাহলে?

সেটাই বুঝতে পারছি না। এটুকু বুঝতে পারছি, ওদের দলের কেউ নিশ্চয় আমার গতিবিধির ওপর নজর রেখেছে। তুমি একটা কাজ করো।

কি বলুন?

তুমি মোহনের বাবাকে দিন সাতেক পরে দেখা করতে বলো।

কিন্তু ভদ্রলোক যে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

খুবই স্বাভাবিক। উদ্বিগ্ন আমিও হয়ে উঠেছি। মোহনকে শেষ হয়তো করবে না, কিন্তু তাকে অন্ধ বা খোঁড়া করে দিয়ে অন্য প্রদেশে চালান দেওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

আপনার কথামত পালা করে হাওড়া আর শেয়ালদা স্টেশনে আমি লোক বসিয়ে রেখেছি। সেরকম কিছু সন্দেহ হলেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

পারিজাত বক্সি ম্লান হাসলেন।

আরে, ওরা কি আর ছেলেটাকে ওভাবে নিয়ে যাবে। হয়তো বোরখা পরিয়ে মেয়েছেলে সাজিয়ে ট্রেনে তুলবে। তার চেয়ে একটা কাজ করো।

কি কাজ?

যেখানে যেখানে ভিখারিদের ঘাঁটি আছে, কাল সকাল থেকে তুমি আর আমি সেখানে ঘুরে বেড়াব। এ বেশে নয়, মোটরে ঘুরব। তাহলে অল্প সময়ে

NOT FOR SALE

অনেকটা ঘোরা হবে। মোহনের ফটো তো রয়েইছে আমার সঙ্গে। মিলিয়ে দেখব।

আপনার কি মনে হয়, এর ভেতর ওরা মোহনের সর্বনাশ করেছে?

কিছু বুঝতে পারছি না। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে দলটা বেশ পাকা। যা হোক মোহনের বাবার সঙ্গে দেখা করার আগে একবার ভিখারিদের জগতটা দেখে নিতে চাই।

আমি আর একটা কথা ভাবছিলাম।

কি?

ধরুন যদি মোহনের বাবা টাকাটা নিয়ে হাওড়া স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঘড়ির নীচে দাঁড়ান, তাহলে নিশ্চয় কেউ টাকাটা নিতে এগিয়ে আসবে।

সম্ভবত।

তখন তাকে গ্রেপ্তার করা যায় না?

তাতে লাভ? গ্রেপ্তার করা হলে দেখবে, সে হয়তো স্টেশনের কুলি কিংবা কোন ভিখারি। সে বলবে, এক বাবু তাকে প্যাকেটটা নিতে নির্দেশ দিয়েছিল। তারপর সারা শহর খুঁজেও সে বাবুকে তুমি পাবে না।

দু'জনে আস্তে আস্তে গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

সরু গলি। দু'পাশে উঁচু উঁচু বাড়ির সার। লোকজন বিশেষ নেই।

এক ধারে কালো রংয়ের ছোট্ট একটা মোটর। এদিক-ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে পারিজাত বক্সি মোটরের মধ্যে গিয়ে বসল। সঙ্গের লোকটি চালকের আসনে।

মোটরের দু' পাশের কাচে এমন রং করা যে, ভিতর থেকে দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে আরোহীদের লক্ষ্য করা যায় না। তা ছাড়া বন্দুকের গুলি এ কাচের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

মোহনের বাবাকে পারিজাত বক্সি দুপুর বেলা গঙ্গার ধারে দেখা করতে বলেছিলেন।

কথামতো একটা বট গাছের তলায় মোহনের বাবা দাঁড়িয়েছিল, পারিজাত বক্সির মোটর সেখানে এসে দাঁড়াল।

শিগ্‌গীর উঠে আসুন।

NOT FOR SALE

মোহনের বাবা উঠে বসল।

গঙ্গার তীর ধরে মোটর সোজা ছুটল। মেটিয়াবুরুজের কাছাকাছি এসে থামতে পারিজাত বক্সি বললেন, ইস্, আপনার চেহারা তো বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে।

সত্যিই মোহনের বাবার দেহ আধখানা হয়ে গিয়েছিল। কোটরাগত চোখ, গালের চোয়াল ঠেলে উঠেছে। মনে হলো, রাতে বোধহয় একতিল ঘুমও হয় না।

মোহনের বাবা ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, আপনার কথা শুনে আমি খুব ভুল করেছি। আমার উচিত ছিল, চিঠিটা পেয়েই পাঁচ হাজার টাকা লোকটাকে দিয়ে দেওয়া। তাহলে আমার ছেলেটাকে ফিরে পেতাম।

তখনই পারিজাত বক্সি এ কথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না। একটু ইতস্তত করে বললেন, আমি আপনার কাছে খুবই লজ্জিত। এতদিন কেটে গেল, আপনার ছেলের ব্যাপারে কোন সুরাহা করতে পারছি না। বিশ্বাস করুন, আমি চেষ্টার ত্রুটি করছি না। আমি গত তিন দিন ধরে এ শহরে যেখানে যেখানে ভিখারি বসে, সেখানে ঘুরেছি কিন্তু আপনার ছেলের হদিশ পাইনি। আমার খুবই বিশ্বাস যে, বদমাশগুলো আপনার ছেলের চরম সর্বনাশ এখনো করেনি।

সে আমিও জানি।

পারিজাত বক্সি বিস্মিত হলেন। আপনিও জানেন? মানে?

মোহনের বাবা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। বলল, এই দেখুন, কাল আমি আর একটা চিঠি পেয়েছি।

কাগজটা হাতে নিয়ে পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন, চিঠিটা কিভাবে পেলেন?

সকালে দোকান খুলতে গিয়ে দেখি দরজার ওপর এটা আটকানো রয়েছে।

পারিজাত বক্সি চিঠিটা পড়তে লাগলেন—এই শেষবার আপনাকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। টিকটিকির সাহায্য নিয়ে কোন ফল হবে না। দরকার হলে তাকেও আমরা খতম করব। আজ থেকে পনেরো দিন পর শনিবার কালীঘাট মন্দিরের দরজায় সন্ধ্যাবেলা নগদ টাকা পৌঁছে দিতে হবে। তবে এবার আর পাঁচ হাজার টাকায় হবে না। সাত হাজার টাকা চাই।

NOT FOR SALE

টাকা পেলে আপনার ছেলে পরের দিনই দেবীগড় রওনা হবে, কিন্তু যদি টাকা না পাওয়া যায় তাহলেও আপনার ছেলে দেবীগড় রওনা হবে, তবে সম্পূর্ণ দেহে নয়, শুধু তার মুণ্ডুটি। এই শেষ চিঠি।

আগাগোড়া চিঠিটা লাল কালিতে লেখা। পারিজাত বক্সি চিঠিটা কোলের ওপর রেখে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন।

অল্প দিনেই এ লাইনে বেশ নাম করেছেন তিনি। অনেক জটিল কেসের রহস্য উদঘাটন করেছেন। পুলিশ মহলের ওপরতলায় তাঁর দারুণ প্রতিপত্তি। কিন্তু সামান্য একটা ছেলে চুরির ব্যাপারে এমন অবস্থা হবে, তা তিনি ভাবতেই পারেননি। তাঁর মনে হলো, হঠাৎ হয়তো মোহনের কিছু বিপদ হবে না। বদমাশের দল খোঁজ নিয়েছে মোহনের বাবা দোকানের মালিক, কাজেই বেশ কিছু পয়সার অধিকারী। তারা এটুকুও বুঝতে পেরেছে যে, পারিজাত বক্সির চোখে ধুলো দিতে পারলে, মোহনের বাবা শীঘ্রই তার ওপর আস্থা হারাবে। বুঝতে পারবে, তার দ্বারা মোহনের উদ্ধার সম্ভব নয়, তখন হতাশ হয়ে ছেলে ফিরে পাবার আশায় টাকাটা দিয়ে দেবে।

পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নি পনেরো দিন পর টাকাটা ওদের দিয়ে দিতে চান?

হ্যাঁ, সেই ইচ্ছাই আছে। পাঁচ হাজার টাকা আমি যোগাড় করেছি। বাকি দু' হাজার টাকা আমি জমি বিক্রি করে সংগ্রহ করব। এ ছাড়া আমার অন্য পথ নেই।

ঠিক আছে, আমাদের হাতে পনেরো দিন সময় আছে। দেখি এর মধ্যে কি করতে পারি।

মোহনের বাবার মুখ দেখে মনে হলো, পারিজাত বক্সির কথায় সে বিশেষ গুরুত্ব দিল না।

মোহনের বাবাকে হাওড়া স্টেশনের একটু দূরে নামিয়ে দিয়ে পারিজাত বক্সি লালবাজারে হাজির হলেন।

একেবারে কমিশনার সাহেবের কামরায়।

কমিশনার চুরুট মুখে দিয়ে কতকগুলো ফটো দেখছিলেন। মুখ তুলে বললেন, আরে কি খবর বক্সি, অনেক দিন তোমার খবর পাইনি।

NOT FOR SALE

পারিজাত বক্সি চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, আর খবর! একটা ব্যাপার নিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কমিশনার হাসলেন, আরে, তোমরা তো ঝঞ্ঝাট নিয়ে থাকতেই ভালবাস। আমাদের চাকরিটাই ঝঞ্ঝাটের আর তোমরা শখ করে ঝামেলা মাথায় নাও। দাঁড়াও, এক কাপ কফি আনতে বলি।

কমিশনার কফির অর্ডার দিলেন।

পারিজাত বক্সি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এখন এ শহরে নামকরা ছেলেধরার দল ক'টা আছে?

কমিশনার হাসলেন, সব মহাপুরুষের নাম কি আর জানা যায়! তবে বড় দল ছিল গোটা চারেক। একটা দল অবশ্য পাঞ্জাবে চলে গেছে।

আস্তানার খোঁজ রাখেন?

এদের কি আর স্থায়ী আস্তানা থাকে। তোমার-আমার জ্বালায় অনবরত আস্তানা বদল করতে হয় ওদের। কেন হে, ছেলেধরার খোঁজ কেন?

পারিজাত বক্সি মোহনের কাহিনী সব বললেন।

কমিশনার খুব মন দিয়ে শুনে বললেন, ছেলেটাকে ইতিমধ্যে অন্ধ কিংবা খোঁড়া করে দেয়নি তো?

তা যদি করত তাহলে কি তার বাপের কাছে ওরকম চিঠি লিখত—টাকা দিলে ছেলে ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে!

কিছু বলা যায় না। এরা সব পারে। টাকাটা পেলেই যে ছেলেটাকে বাপের কাছে ফেরত দেবে, তার গ্যারান্টি আছে?

পারিজাত বক্সি চুপচাপ বসে ভাবতে লাগলেন।

অসৎ লোকের অসাধ্য কোন কাজ নেই। মোহনকে হয়তো বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। যদি বাড়তি টাকা হাতে আসে, মন্দ কি!

আচ্ছা, এ-দলের কোন লোকের ফটো আপনাদের কাছে আছে?

কয়েকজন বছর তিনেক আগে ধরা পড়েছিল, তাদের ফটো থাকা সম্ভব। তুমি বসো, আমি দেখছি।

কমিশনার বোতাম টিপলেন। একজন কনেস্টবল এসে দাঁড়াতে তিনি বললেন— চৌধুরী সাব্।

NOT FOR SALE

পুলিশ বেরিয়ে গেল। একটু পরেই একজন ছোকরা পুলিশ অফিসার এসে ঢুকল। বলল, ডেকেছেন স্যার?

এঁকে চেন তো?

হ্যাঁ, চিনি বই কি। বিখ্যাত লোক। অনেক গোলমেলে কেসের সমাধান করে দিয়েছেন।

আচ্ছা, ছেলেধরাদের যে অ্যালবামটা আছে এঁকে দেখতে দাও।

মিনিট পনরোর মধ্যে একটা অ্যালবাম এনে পারিজাত বক্সির হাতে দিল অফিসারটি।

পারিজাত বক্সি পাতা উল্টে ফটোগুলো দেখতে লাগলেন। প্রায় আটজন লোকের বিভিন্ন দিক থেকে তোলা অনেকগুলো ফটো।

পারিজাত বক্সি লক্ষ্য করেছেন, একটু রাত হলে অন্ধ খোঁড়া ভিখারিদের নিয়ে যাবার জন্য লোক এসে দাঁড়ায়। কাউকে চলতে সাহায্য করে, আবার কারও জন্য কাঠের গাড়ি আসে, তাতে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য তারা দলের কেউ নয়। চাঁইদের নির্দেশে কাজ করে। বলতে গেলে মাইনে-করা চাকর। তাদের ফটো এ অ্যালবামে থাকা সম্ভব নয়।

তবু পারিজাত বক্সি মন দিয়ে ফটোগুলো দেখলেন, তারপর অ্যালবামটা টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

কমিশনার বললেন, যাচ্ছ! যদি পুলিশের সাহায্যের দরকার হয় তো জানাবে।

হ্যাঁ, নিশ্চয় জানাব।

লালবাজার থেকে বেরিয়ে পারিজাত বক্সি ফুটপাথে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। এদিক ওদিক দেখলেন। তাঁর ওপর কারও নজর রাখা কিছু বিচিত্র নয়। সাবধানে তিনি নিজের মোটরে গিয়ে উঠলেন।

।। পাঁচ ।।

অন্ধকার ঘর। আশেপাশে অনেকগুলো তেলের খালি পিপে। তার মধ্যে মোহন বসে আছে। দুটো হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। দুটো পায়ে শিকল। সামনে একটা টুলের ওপর সেই বেঁটে লোকটা।

আমাদের আর দোষ নেই। তোর বাবাকে টাকাটা দিয়ে দেবার অনেক

NOT FOR SALE

সুযোগ দিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত দেবার নাম নেই। এক টিকটিকির পাল্লায় পড়েছে বুঝতে পারছি। সে-ই মতলব দিচ্ছে।

মোহন কোন উত্তর দিল না। দেবার মতন উত্তরও তার কিছু নেই। সে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছে। আর তার বাবা সাহায্যের জন্য আসবে না সেটুকু বুঝতে পেরেছে। অভিমানে তার বুক ভরে গেল। ধারণা ছিল, নতুন ম যেমন তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না, তেমনই বাবা কিন্তু খুব ভালবাসে কিন্তু কই, টাকা নিয়ে তো বাবা এগিয়ে আসছে না। এদিকে দিন দিন এরা নানারকম নির্যাতন শুরু করেছে। প্রায়ই খাওয়া বন্ধ করে দেয়। হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে।

যাক, তোর বাপকে শেষ চিঠি দিয়েছি। আর কিছুদিন দেখব, তারপর আমাদের মনে যা আছে তাই করব। গালাগাল দিতে দিতে লোকটা বেরিয়ে গেল।

বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগানোর শব্দ এল।

আগের বাড়িটা তবু ভাল ছিল, কিন্তু হঠাৎ এক সকালে দুটো লোক মোহনের চোখমুখ বেঁধে একটা থলির মধ্যে পুরে কাঁধে তুলে নিল। তারপর এইখানে এনে ফেলল।

তেলের একটা বিশ্রী গন্ধ। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। কাঠের দেওয়াল, কাঠের মেঝে। দিনের বেলাও ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বোঝাই যখন যাচ্ছে, বাবা টাকা দিয়ে উদ্ধার করতে আসবে না, তখন নিজের উপায় নিজেকেই করতে হবে। যেমন করে হোক পালাতে হবে এখান থেকে। তা না হলে, কিছুই বলা যায় না, এরা হয়তো জোর করে অন্ধ কিংবা খোঁড়া করে দেবে। আজীবনের মতন পঙ্গু।

পায়ে শিকল বাঁধা থাকলেও বসে বসে চলতে মোহনের কোন অসুবিধা হলো না। একেবারে কোণের দিকে খালি ড্রামের পিছন থেকে মোহন একটা ভাঙা পাইপের টুকরো কুড়িয়ে পেল। দেড় ফুট লম্বা, বেশ ভারি। অস্ত্র হিসাবে চমৎকার।

মোহন সেটাকে বেশ সতর্কতার সঙ্গে লুকিয়ে রাখল। যা হবার হোক, মোহন একেবারে মরীয়া।

পরের দিন ভোরবেলা দারোয়ান রোজকার মতন দরজা খুলল। ভিতরে

NOT FOR SALE

ঢুকে মোহনের হাত-পায়ের বাঁধনও খুলে দিল। এ সময় মোহনের কলঘরে যাবার কথা, তাই এ ব্যবস্থা।

মোহন কলঘরে গিয়ে দরজাটা সজোরে বন্ধ করল বটে, কিন্তু কলঘরের ভিতরে গেল না।

ড্রামের মধ্যে থেকে ভাঙা পাইপটা তুলে নিয়ে পা টিপে টিপে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

দারোয়ান চৌকির ওপর বসে সুর করে দুলে দুলে কি গাইছে। দরজার দিকে পিছন ফিরে। মোহন ভাঙা পাইপটা তুলে প্রাণপণ শক্তিতে দারোয়ানের মাথায় আঘাত হানল। অস্ফুট আর্তনাদ করেই দারোয়ান লুটিয়ে পড়ল।

মোহন আর তিলমাত্র দেরি করল না। পাইপের টুকরোটা ফেলে দিয়ে তীর বেগে ছুটতে আরম্ভ করল।

কিছুটা এগিয়েই নীচে নামার সিঁড়ি। মোহন বুঝতে পারল, সিঁড়ি দিয়ে নামা উচিত হবে না। দলের লোকেরা নিশ্চয় নীচে আছে। সে উল্টোদিকে ছুটল।

বারান্দার কোণে ছোট একটা জানালা। তার ফাঁক দিয়ে একটা অশ্বত্থ গাছ দেখা গেল।

বহু কষ্টে মোহন নিজের শরীরটা সেই ছোট জানলার মধ্য দিয়ে গলিয়ে দিল।

এদিকে ওদিকে ভোরের ঝাপসা কুয়াশা। একটু দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। জানলা থেকে লাফ দিয়ে মোহন গাছের একটা ডাল ধরল। পাড়াগাঁয়ের ছেলে। গাছে চড়া খুব অভ্যাস আছে। তরতর করে ডাল বেয়ে নীচে নেমে এল সে।

ছোট ছোট আগাছার ঝোপ। ঝোপের আড়ালে বসে একবার বাড়িটার দিকে দেখল। না, কোথাও কোন চাঞ্চল্য নেই। মনে হয় কেউ এখনো জাগেনি। মোহনের পালিয়ে যাবার কথা কেউ জানতে পারেনি।

গুড়ি দিয়ে মোহন এগিয়ে গেল। সামনের ইটের স্তূপ দেখে মনে হলো, এখানে এক সময় বাড়ির ভিটে ছিল। বাড়িও থাকতে পারে। হয়তো পুরানো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে গেছে, কিংবা আদৌ বাড়ি তৈরিই হয়নি। ভিত পর্যন্ত গাঁথা হয়েছিল।

NOT FOR SALE

মোহনের ভয় হলো, দিনের আলোয় চলাফেরা করলে কারো চোখে পড়ে যাবে। বদমাশদের দল খুঁজতে খুঁজতে নিশ্চয় এদিকে আসবে। তার চেয়ে ঝোপের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকাই ভাল। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে মোহন ঢুকে পড়ল।

ঘাস খুব নরম। যেন বিছানা।

দুপুর কাটিয়ে বিকাল হলেই মোহন উঠে পড়বে। শীতকালে তাড়াতাড়ি অন্ধকার নামে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালাবার খুব সুবিধা। একবার রাস্তায় পৌঁছতে পারলে, লোককে জিজ্ঞাসা করে করে ঠিক হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যাবে। তারপর টিকেট চেকারবাবুদের হাতে-পায়ে ধরে দেবীগড় যেতে খুব অসুবিধা হবে না।

তীক্ষ্ণ একটা হাসির শব্দে মোহনের ঘুম ভেঙে গেল। সব ব্যাপারটা বুঝতে তার বেশ একটু সময় নিল। চোখ খুলে দেখল, সামনে ঘাসের ওপর বেঁটে মোটা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। একে আগে কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারল না মোহন। লাল চোখ, নাক প্রায় নেই বললেই হয়, সারা মুখে বসন্তের দাগ, হলদে ছোপ লাগা দাঁত। লোকটা বলল, কি রে, খুব চালাক হয়েছিস? এবার তো ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হবে।

মোহনের গলা থেকে স্বর বের হলো না। আস্তে আস্তে বলল, ফাঁসি কাঠে?

আলবত। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে দারোয়ানকে খতম করে পার পেয়ে যাবি ভেবেছিস? ওঠ, পুলিশ তোকে খুঁজছে।

ঠিক বেড়াল যেমন ইঁদুরকে মুখে ঝুলিয়ে নেয়, ঠিক তেমনই লোকটা মোহনের শার্টের কলার ধরে তুলে নিল।

কথা বলা দূরে থাক, মোহনের কিছু চিন্তা করারও শক্তি নেই। সর্বনাশ! মানুষ মারার জন্য শেষকালে তার ফাঁসি হবে। কিন্তু এই লোকগুলো যে তাকে বন্দী করে রেখে নির্মম অত্যাচার করছিল, শুধু এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই যে সে দারোয়ানকে মারতে বাধ্য হয়েছে, একথা পুলিশ শুনবে না?

লোকটা তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

গাছ থেকে নামবার সময় দু'এক জায়গা ছড়ে গিয়েছিল, এবারের টানা-হেঁচড়ানিতে অনেক জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

NOT FOR SALE

দোতলায় নিয়ে গিয়ে মোহনকে আছড়ে ফেলল লোকটা।

মোহন উঠে বসেই অবাক। দারোয়ানের শুধু মাথায় ব্যাণ্ডেজ। সে দিব্যি বহাল তবিয়তে রয়েছে। সামনে কোমরে হাত দিয়ে বদমাশের দলের সর্দার দাঁড়িয়ে। তার হাতে একটা চাবুক। সে বলল, উঠে দাঁড়া। তোকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি।

কাঁপতে কাঁপতে মোহন উঠে দাঁড়াল।

সর্দার চাবুকটা উঁচুতে তুলে নামিয়ে আনার মুহূর্তেই থেমে গেল। একটা লোক ছুটতে ছুটতে আসছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কোমরে লাল গামছা বাঁধা। জোয়ান চেহারা। কাছে এসে সে ইশারায় সর্দারকে ডাকল।

চাবুক গুটিয়ে সর্দার তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দু'জনে ফিসফিস করে কি কথা হলো। মনে হলো, সর্দারের চোখমুখে যেন চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। লোকটা আবার দৌড়াতে দৌড়াতে চলে গেল।

সর্দার মোহনের কাছে এসে তাকে একটা লাথি মারল। মোহন ছিটকে গিয়ে কামরার মধ্যে পড়ল। তারপর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

মোহনের মনে হলো, তার কোমরটা বুঝি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। সে বুঝি আর উঠে দাঁড়াতেই পারবে না।

এক সময় আস্তে আস্তে দেয়াল ধরে মোহন উঠে দাঁড়াল। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করল।

নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, তা না হলে লোকটার কথায় সর্দার অত চিন্তিত হয়ে উঠল কেন? তাহলে কি পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে? মোহন এগিয়ে এসে দরজায় কান পাতল। না, কোন শব্দ নেই। সব চুপচাপ।

মোহন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। মেঝের ওপর বসে পড়ল। বসে বসে ভাবতে লাগল, সে ভুল করেছে। ওভাবে ঘাসবনের মধ্যে বসে না থেকে আরও দূরে চলে যেতে পারত। এদের নাগালের বাইরে।

সন্ধ্যার পর দরজা খুলে গেল। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। পরিশ্রান্ত দেহ।

মোহন ভাবল, কেউ নিশ্চয় খাবার নিয়ে এসেছে, কিন্তু না। যে লোকটা মোহনকে ধরে নিয়ে এসেছিল, সে এসে ঢুকল, তার হাতে কালো কাপড়ের

NOT FOR SALE

একটা বাণ্ডিল। সে বলল, নে, এটা পরে নে। লোকটা কাপড়ের বাণ্ডিলটা মোহনের দিকে ছুঁড়ে দিল।

মোহন জানে, এদের কথা অমান্য করলে আবার শাস্তি পেতে হবে। কাপড়টা তুলে দেখল, একটা বোরখা। বলল, এটা পরব? এটা তো মেয়েদের।

লোকটা খিঁচিয়ে উঠল। বেশী কথা বলিসনি। যা বলছি, তাই কর।

মোহন বোরখাটা পরে নিল। চোখের সামনে জাল দেওয়া। সামনের পথ দেখবার জন্য।

দেখি, তোর হাত দুটো।

মোহন দুটো হাত বাড়িয়ে দিল।

লোকটা মোহনের হাতের চেটোয় কি মাখিয়ে দিল।

মোহন নিজের দুটো হাত চোখের সামনে এনে দেখল। মেহেদি বাটা। চেটো দুটো হলদে হয়ে গিয়েছে।

নে চল। রাস্তায় যদি একটা কথা বলবি তো গর্দান থেকে ধড় আলাদা করে দেবো।

এভাবে চলা মুশকিল। ঠোক্কর খেতে খেতে মোহন এগিয়ে চলল। বুঝতে পারল, লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে।

বেশী দূর নয়। কিছুটা গিয়েই মোহনকে থামতে হলো।

সঙ্গের লোকটা কর্কশ কণ্ঠে বলল, দাঁড়া এইখানে।

মোহন দাঁড়াল।

একটা মোটরের শব্দ। মনে হলো, মোটরটা সামনে এসে থামল।

লোকটা মোহনের হাত ধরে মোটরে উঠল।

মোটর নক্ষত্রবেগে ছুটে চলল।

জালি-কাটা নক্সা দিয়ে মোহন দেখল, মোটর সরু গলি ছাড়িয়ে চৌরাস্তায় এসে পৌঁছল। চারদিকে ট্রাম-বাস, অগণিত লোকজন।

এত ভীড়ের মধ্যেও মোহন কত অসহায়। চীৎকার করে উঠতে সাহস হলো না। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আগেই সঙ্গের লোকটা হয়তো গলা টিপে তাকে শেষ করে দেবে। এদের অসাধ্য কোন কাজ নেই। অনেকটা চলার পর মোহনের মনে হলো, মোটরটা যেন এবার থামল। মনে হলো, একটা রেল স্টেশন।

NOT FOR SALE

মোটর থামতেই আর একটা লোক এসে চাপা গলায় বলল, সব ঠিক আছে।

সে কথায় উত্তর না দিয়ে সঙ্গের লোকটা বলল, কত দেরি?

মিনিট দশেক।

মোহনকে ধরে রাস্তায় নামিয়ে লোকটা আবার সাবধান করে দিল, একটি কথা যেন মুখ থেকে না বের হয়।

তিনজনে স্টেশনে এসে ঢুকল। একটু পরেই ইঞ্জিনের গর্জন। ঝম্ ঝম্ শব্দ করতে করতে ট্রেন এসে দাঁড়াল।

যাত্রীদের হৈ-চৈ। ফেরিওয়ালাদের সোরগোল। তারই মধ্যে দু'জন দু'ধার থেকে মোহনের হাত ধরে ট্রেনে তুলল। একেবারে কোণের বেঞ্চে— মাঝখানে মোহন, দু'পাশে দু'জন তার দেহের সঙ্গে চেপে বসল।

এক সময় ট্রেন ছাড়ল।

মোহনের মনে হলো, তাহলে কি এরা তাকে নিজের গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? দেবীগড়ে?

হয়তো বাবার সঙ্গে কোন কথা হয়েছে। যে টাকা এরা চেয়েছিল সেটা পেয়ে গেছে। মনে খুবই আনন্দ হলো মোহনের। কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না।

ট্রেনের কামরায় অন্য যাত্রীও রয়েছে। তাদের মুখগুলো মোহন অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল।

একটু পরেই মোহনের চাপা আনন্দ বিষাদে পরিণত হলো।

সামনের বেঞ্চে বসা একটি লোক প্রশ্ন করল, মিঞাসায়েব কতদূর যাবেন?

মোহনের ডানপাশের লোকটি বলল, আর বলেন কেন ভাই। বোনের এই মেয়েটাকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে গেলাম। ডাক্তার, বদ্যি, হেকিম কিছু করতে পারল না। এখন দৈব ভরসা।

অসুখটা কি?

মাথার রোগ। এলোমেলো বকে। তাই পাণ্ডুয়া পীরসাহেবদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। শুনেছি, তাঁর ফুল পড়ায় খুব কাজ হয়।

মোহন কথা বলতে গিয়েই সহসা উঃ করে থেমে গেল। পাশের লোকটা

NOT FOR SALE

সজোরে চিমটি কেটেছে পাঁজরার নীচে। বোধহয় সে আন্দাজ করেছিল যে, মোহন প্রতিবাদ করে উঠবে।

অন্য লোকটি ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কি হলো মরিয়ম, আবার শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে? শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।

একরকম জোর করেই তারা মোহনকে শুইয়ে দিল।

মোহনের চিন্তার শেষ নেই। তাকে এরা কোথায় নিয়ে চলেছে? তাহলে সম্ভবত তার বাবা এদের টাকা দেয়নি। সেই জন্য এরা মোহনকে মেরে ফেলবে। মরার পরে মোহনের দেহ নিয়ে এরা যা ইচ্ছা করুক, তাতে মোহনের কিছু যায় আসে না। কিন্তু এক কামরা লোক সঙ্গে চলেছে। এরা কি কেউ মোহনকে একটু সাহায্য করতে পারে না? মোহন যদি চীৎকার করে ওঠে! বোরখা খুলে ফেলে বলে, আমি মরিয়ম নয়, মোহন। তোমরা আমাকে বাঁচাও। এরা আমাকে মেরে ফেলতে নিয়ে চলেছে। তাহলে কি কেউ সাহায্য করবে না? এমন সুযোগ হয়তো জীবনে আর আসবে না।

কিন্তু একটা লোক তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তার আসল উদ্দেশ্য অন্য। যদি মোহন কোন রকম বেয়াদবি করে কিংবা চেঁচামেচি করার চেষ্টা করে, তাহলে তার মুখ চেপে ধরবে। গলা টিপে ধরাও বিচিত্র নয়। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল। যা হবার তাই হবে।

মোহন জানে, বাবার জমিজমা আছে। অত বড় কাপড়ের দোকানের মালিক। আসল কথা, ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার মন বাবার নেই। থাকলে বাবা টাকাটা নিশ্চয় দিয়ে দিত। মোহন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, একটা হাত তার গলার ওপর চেপে বসল।

ট্রেন থামতে মোহনকে নিয়ে দু'জনে উঠে পড়ল। অন্ধকার স্টেশন। টিম টিম করছে আলো। জালি-কাটা নক্সার ফাঁক দিয়ে মোহন চেয়ে চেয়ে দেখল।

স্টেশনের এলাকা পার হয়ে সবাই রাস্তায় নামল। তারপর হাঁটা বেশ অনেকটা পথ।

এক জায়গায় এসে সঙ্গের একজন বলল, দাঁড়া।

মোহন দাঁড়াল। ওর বোরখা টেনে খুলে দিল সে লোকটা।

মোহন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

চারদিকে জঙ্গল। দূরে দূরে আলোর আভাস। অজ পাড়াগাঁ বলেই মনে

NOT FOR SALE

হচ্ছে। মোহনের ভয় হলো। নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে এরা বোধহয় মোহনকে শেষ করে দেবে। কেউ জানতেও পারবে না।

চলতে চলতে মোহন জিজ্ঞাসা করল, তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

কোন উত্তর নেই। আবার সাহস করে মোহন জিজ্ঞাসা করে ফেলল, তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলবে?

এবার সঙ্গের একজন কর্কশ কণ্ঠে বলল, ফেলব বই কি। আবার পালাবার চেষ্টা করলে একদম খতম। তোর জন্যে আমাদের কম হয়রানি কি! বিচ্ছু কোথাকার।

সামনে ভাঙা একটা মন্দির। অনেক পুরানো। এত পুরানো যে, ফাটলে ফাটলে বুনো গাছ গজিয়েছে। তার পাশে একতলা একটা বাড়ি। তারও জরাজীর্ণ অবস্থা।

এখন অন্ধকার অনেকটা কম। আকাশে চাঁদ উঠেছে। ম্লান আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

মোহনকে দাঁড় করিয়ে একজন মেঠো রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। বাড়িটার সামনে গিয়ে চেঁচাল—মেঘা, মেঘা!

বারকয়েক ডাকবার পর যে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে মোহন আঁতকে উঠল। কালো কুচকুচে রং। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। জবাফুলের মতন টকটকে রাঙা চোখ। খালি গা। বাঁ হাতে তাবিজ বাঁধা।

মেঘা, এই ছেলেটাকে তোর কাছে রাখতে হবে। এক নম্বরের শয়তান। একবার পালাবার চেষ্টা করেছিল। খুব চোখে চোখে রাখবি।

মেঘার দুটো চোখ যেন জ্বলে উঠল। হা হা করে এমনভাবে সে হেসে উঠল যে, কাছে গাছের ডালে বসে থাকা গোটা কয়েক পাখি ঝটপট করে উড়ে গেল। হাসতে হাসতেই সে বলল, পালাবে আমার কাছ থেকে! একেবারে চণ্ডেশ্বরীর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়ে দেবো না! হুঁ।

মেরে ফেলার ভয় মোহনকে বদমাশ দলের অনেকেই দেখিয়েছে, কিন্তু এই লোকটার কথা শুনে মোহনের বুকটা গুরগুর করে উঠল। মনে হলো, কিছুই যেন এর অসাধ্য নয়।

বইতে আগের যুগের যে সব ডাকাতের কাহিনী মোহন পড়েছিল—বিশে

NOT FOR SALE

ডাকাত, নিধিরাম সর্দার—তাদের সঙ্গে লোকটার মিল আছে। কে জানে, লোকটা হয়তো ডাকাতও হতে পারে।

নে আয়। মেঘা বজ্রমুষ্টিতে মোহনের হাত ধরে টানল।

আর একটু হলে মোহন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেত মাটির ওপর।

তাহলে আমরা চলি মেঘা। সর্দারকে গিয়ে বলব, ছোকরাকে তোর জিম্মায় দিয়ে গেলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন চিন্তা নেই। আমি ঠিক শায়েস্তা করে রাখব।

ছোট একটা ঘর। দেয়ালগুলো ফেটে গেছে। মেঝেও চৌচির। সেখানে নিয়ে গিয়ে মেঘা একটা চাটাই নিয়ে ছুড়ে দিয়ে বলল, নে তোর বিছানা। জিরিয়ে নে।

মোহনকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মেঘা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করল।

বাড়িটা জরাজীর্ণ কিন্তু মজবুত শাল কাঠের দরজা। বড় বড় লোহার হুড়কো।

রাতের ফিকে আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। পরিশ্রান্ত মোহন কোন রকমে টলতে টলতে চাটাইয়ের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ল। সকাল থেকে পেটে একবিন্দু খাবার পড়েনি। তেষ্টায় বুকটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে।

আসতে আসতে পথে একটা ডোবা দেখেছিল। একবার যদি কিছুক্ষণের জন্যও ছাড়া পেত, তাহলে মোহন ছুটে গিয়ে আঁচল ভরে সেই ডোবার জল খেয়ে আসত।

কতক্ষণ যে এভাবে কেটে গেছে মোহনের খেয়াল নেই। হঠাৎ দরজায় শব্দ হতেই সে চমকে উঠে বসল। ঘর অন্ধকার, চাঁদ সরে গেছে। কে যেন দরজা খোলার চেষ্টা করছে।

দরজা খুলে যেতে ঘরের মধ্যে আলোর রেখা এসে পড়ল। কেরোসিনের কুপি হাতে নিয়ে কে একজন ঢুকল। কাছে আসতে মোহন ভাল করে দেখতে পেল। কালো কুৎসিত চেহারা। শনের নুড়ির মতন চুল। সামনের গোটা তিনেক দাঁত বীভৎস ভাবে বেরিয়ে আছে। এক হাতে তেলের কুপি, অন্য হাতে একটা মাটির সরা। সরাটা মোহনের সামনে নামিয়ে রেখে বুড়ি খনখনে গলায় বলল, নে গিলে নে। আমি সরাটা নিয়ে যাব।

NOT FOR SALE

মোহন সোৎসাহে এগিয়ে এসেই হতাশ হলো। পান্তা ভাত। বিশ্রী একটা গন্ধ বের হচ্ছে। পাশে শাকের তরকারি।

কিন্তু তার পেটে তখন আগুন জ্বলছে। খাবারের বাছবিচার করার সময় তার নেই। সে কোন রকমে পান্তা ভাত শেষ করে ফেলে বলল, একটু জল।

বুড়ি খিঁচিয়ে উঠল। নবাবপুত্তুরের কিছু ত্রুটি হবার জো নেই। বেরিয়ে গিয়ে মাটির গেলাসে জল এনে রাখল। তারপর মোহনের খাওয়া শেষ হলে সরা গেলাস তুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

তেলের কুপিটা জ্বলছে। কতটুকুই বা আলো। মোহনের দীর্ঘ ছায়া দেয়ালের ওপর কাঁপছে। একটু পরে মোহন চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ল।

রাত কত হলো খেয়াল নেই, হঠাৎ হাতের ওপর ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ পেয়ে মোহন চীৎকার করে জেগে উঠল। বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখছিল মোহন। কতকগুলো ষণ্ডামার্কা লোক তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। সামনে চণ্ডেশ্বরীর মূর্তি। কালীমূর্তিরই মতন। লাল টকটকে জিভ। দু'চোখে যেন আগুন ছুটছে। তার সামনে হাঁড়িকাঠ। মূর্তির সামনে এক পুরোহিত বসে পূজা করছে।

তার চেহারাও ভয়াবহ।

সবাই মিলে মোহনকে ধরে হাঁড়িকাঠে ফেলল। গলাটা আটকে দিল। সেই মুহূর্তে মোহনের চোখের সামনে বাবার চেহারা ভেসে উঠল। বিড়বিড় করে মোহন বলল, তুমি আমার জন্য কিছু করলে না বাবা। দেখ, এরা আমায় শেষ করে দিচ্ছে। আর জীবনে কোনদিন আমাকে দেখতে পাবে না।

তারপর একটা লোক বিরাট একটা খাঁড়া নিয়ে মোহনের ঘাড়ে স্পর্শ করাল। কনকনে ঠাণ্ডা স্পর্শ। মোহন জেগে উঠল।

তেলের কুপির আলোটা কমে এসেছে। সেই আবছা আলোয় মোহন সভয়ে দেখল, বিরাট কালো রংয়ের একটা সাপ মোহনের হাতের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে দেয়ালের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সাপের মাথায় খড়মের মতো চিহ্ন আঁকা।

মোহন গাঁয়ের ছেলে। অনেক রকম সাপ দেখেছে। সাপও চেনে। এটা গোখরো সাপ। দারুণ বিষধর। এক ছোবলেই শেষ।

কেউটের মতন এরা সহজে তেড়ে আসে না। কিন্তু মোহন এর আস্তানায়

NOT FOR SALE

হানা দিয়েছে, কাজেই রাগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যদি তেড়ে আসে, তাহলে মোহনের পালাবার কোন পথ নেই। জানলা নেই। ঘুলঘুলি। তাও অনেক ওপরে।

তাহলে এদের উদ্দেশ্য বোধহয় মোহনকে এইভাবে মেরে ফেলা। নিজের হাতে কিছু করবে না। তাতে অনেক হাঙ্গামা। সাপের কামড়ে মারা গেলে বলবার কিছু নেই।

সাপটা আস্তে আস্তে একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকে গেল।

সারাটা রাত মোহন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শুতে আর সাহস হলো না। কি জানি, সাপটা যদি আবার বেরিয়ে পড়ে। তাছাড়া চারদিকে অজস্র ফাটল। সাপের থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা। আরও কত সাপ আছে বলা যায়!

সকালে যখন দরজা খুলল তখন মোহন ঘুমিয়ে পড়েছে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে কখন মোহন দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়েছে। তারপর এক সময়ে চাটাইয়ের ওপর ঢলে পড়েছে।

আরে এই, ওঠ ওঠ।—বাজখাঁই গলার আওয়াজে মোহনের ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে উঠে বসল। চোখ মুছে দেখল, সামনে মেঘা দাঁড়িয়ে।

মেঘা বলল, নে বাইরে চল।

মোহন উঠে দাঁড়াল। তাহলে কি তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে? মেঘার পিছন পিছন মোহন বেরিয়ে এল।

বিরাট মাঠ। মাঝে মাঝে আকন্দ বনতুলসী আর কেয়াগাছের ঝোপ। পাশে একটা ডোবা। শ্যাওলার জল সবুজ হয়ে আছে।

নে, মুখহাত ধুয়ে নে।

মোহন ডোবার জলে মুখ ধুতে লাগল।

বিশ্রী পাঁকের গন্ধ জলে। মুখে দিলেই বমি হয়ে যাবে যেন। কিন্তু উপায় নেই।

মুখ ধুয়ে মোহন আবার ঘরে ফিরে এল। আশ্চর্য হয়ে দেখল, এবার আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হলো না। দরজা খোলাই রইল।

কি ব্যাপার? মোহন একটু পরেই তা বুঝতে পারল।

খোলা দরজা দিয়ে বুড়ি ঢুকল। হাতে মাটির সরা। সরাতে দু'খানা

NOT FOR SALE

আধপোড়া রুটি আর একটু গুড়। সরাটা নামিয়ে বুড়ি যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন সাহস করে মোহন ডাকল, দিদিমা।

বুড়ি ভ্রূ কুঁচকে থমকে দাঁড়াল।

দিদিমা! এ আবার কি ডাক? কে তুই সাতপুরুষের কুটুম? আমার কেউ কোথাও নেই। সব শেষ হয়ে গেছে।

একটা কথা দিদিমা! মোহন কাতর কণ্ঠে বলল।

কি বলবি বল। তখন থেকে দিদিমা দিদিমা করছিস।

এ ঘরে থাকতে বড় ভয় করছে।

ভয়? কিসের ভয়?

সাপের। কাল রাত্তিরে আমার হাতের ওপর দিয়ে একটা সাপ গিয়েছে।

বুড়ি কথাটা শুনে হাসতে শুরু করল। হাসির চোটে চোখ দুটো বুজে গেল। সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল— অ-মা, ও সাপে ভয় কি? ওরা তো বাস্তু সাপ। ওরা কিচ্ছু করে না। এখানে একজোড়া আছে। প্রতি মঙ্গলবার আমি ওদের দুধ-কলা খাওয়াই।

একটা নয়, এক জোড়া? সর্বনাশ! মোহন রীতিমত ভয় পেয়ে গেল।

এই ঘরে জোড়া সাপের সঙ্গে থাকতে হবে! ঘুমিয়ে থাকার সময় কখন তাদের গায়ে হাত-পা গিয়ে পড়বে। ব্যস, অমনি ছোবল। অবশ্য বাঁচবার মোহনের আর ইচ্ছা নেই। বাবাই যখন আর তাকে চায় না তখন তার কি হবে বেঁচে!

দেবীগড়ে গিয়েই বা কি হবে। কিন্তু এভাবে সাপের ছোবলে নির্জন জঙ্গলে মরতে হবে! কেউ টেরও পাবে না! নতুন-মা'র কাছে, বাবার কাছে খবরও পৌঁছবে না?

মোহন আর কিছু বলল না। বুঝতে পারল, বলেও কোন লাভ নেই। অন্য কোন ঘরে পাঠিয়ে দেবার ক্ষমতা খুব সম্ভব বুড়িরও নেই।

সে রুটি গুড় খাওয়া শেষ করে দেখল, দরজার গোড়ায় বসে বুড়ি চাল বাচছে। বোধহয় চোখে ভাল দেখতে পায় না, তাই চালের ওপর খুব ঝুঁকে পড়েছে।

মোহন ডাকল, দিদিমা, অ দিদিমা!

না, ছেলেটা জ্বালালে দেখছি! বুড়ি জিজ্ঞেস করল, কি বলবি বল?

NOT FOR SALE

আমি তোমার চাল বেছে দেবো দিদিমা?

তুই কি করে বাছবি? ঘরের মধ্যে তো অন্ধকার।

তোমার মতন দরজার গোড়ায় বসে!

দরজার গোড়ায় বসে? না বাছা, মেঘা দেখলে রাগ করবে।

কোথায় পালাব দিদিমা, চারদিকে তো জঙ্গল। তাছাড়া কাছে তো তুমি বসেই রয়েছ।

বুড়িটা কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, তা হলে আয় এখানে, চালগুলো বেছে দে। পালাবার চেষ্টা করলে খবরদার, একেবারে তোকে খতম করে দেবে। চারদিকে আমাদের লোক রয়েছে।

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মোহন বুড়ির পাশে গিয়ে বসল। বলল, সর দিদিমা, আমি বাচছি।

বুড়ি খুব একটা সরে বসল না। ছেলেটাকে হাতের নাগালের মধ্যে রাখাই ঠিক। কার কি মতিগতি হয় বলা যায়! অবশ্য পালিয়ে কোথাও যেতে পারবে না। সে আশা দুরাশা। বাড়িতে শাঁখ আছে। সেই শাঁখে বুড়ি একবার ফুঁ দিলেই লোকেরা জঙ্গল ঘিরে ফেলবে। মাছিটির পর্যন্ত পালাবার পথ থাকবে না। সে কথা বুড়ী জানিয়ে রাখল।

চাল বাছতে মোহনের বেশি সময় লাগল না। নতুন-মা'র কল্যাণে এসব কাজ তার জানা।

বুড়ি খুব খুশি। একগাল হেসে বলল, বা, খাসা হয়েছে। মেঘা আবার ভাতে একটু কাঁকর থাকলে খেতে পারে না। আমাকে গালাগালি করে। আমার কি আর সে চোখ আছে?

মোহন বলল, তুমি রোজ আমাকে চাল বাছতে দিও দিদিমা, আমি বেছে দেবো।

বুড়ি একথায় সোজাসুজি কোন উত্তর দিল না, কিন্তু চোখ দেখে মনে হলো, খুশিই হয়েছে। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, হ্যাঁরে ছেলে, তোর বাড়িতে কে-আছে?

বাবা আছে। সৎমা আছে!

সৎমা? তোকে ভালবাসে? আদর-যত্ন করে?

ছাই করে!

NOT FOR SALE

আহা-হা খুব কষ্ট দেয় বুঝি।

মোহন কোন উত্তর দিল না। সে তখন অন্য কথা ভাবছে।

বুড়ি পাশে বসে। আচমকা যদি দুহাতে বুড়ির গলাটা চেপে ধরে! মারবে না। অজ্ঞান করে ফেলবে। তারপরই সে অনেক দূরে ওই যে একটা রাখাল ছেলে গরুর পাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছুটে তার কাছে চলে যাবে। গিয়ে বলবে, ভাই, আমাকে বাঁচাও। এই জঙ্গল থেকে বাইরে যাবার রাস্তাটা একটু দেখিয়ে দাও।

বুড়ি তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে। শাঁখে ফুঁ দেবে কি করে? শাঁখের আওয়াজ না পেলে মোহনের পালাবার খবর মেঘার লোকেরা পাবে কি করে?

হঠাৎ বুড়ির কথায় মোহনের চমক ভাঙল, নে ওঠ, ঘরের মধ্যে যা। মেঘার আসার সময় হয়েছে।

মোহন উঠে পড়ল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

মোহন বসে বসে ভাবতে লাগল, এভাবে তাকে আটকে রেখে এদের কি লাভ! কতদিন এভাবে রাখবে?

এবারে এরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, মোহনের বাবা আর টাকা দেবে না। মোহনকে উদ্ধার করার কোন ইচ্ছে তার নেই। কাজেই খাইয়ে-দাইয়ে মোহনকে কেন এরা বাঁচিয়ে রাখবে! এইবার একদিন খতম করে দেবে।

মোহন অপেক্ষা করতে লাগল।

যেমন করেই হোক পালাবার চেষ্টা করবে। কেউ তাকে সাহায্য করবে না। যা করার তাকে নিজেই করতে হবে।

যদি ধরা পড়ে, এরা তাহলে হয়তো মেরে ফেলবে। তার জন্য মোহন প্রস্তুত।

।। ছয় ।।

মোহনের বাবাকে চেনা যায় না। এই ক'মাসে যেন তার বয়স বেশ কয়েক বছর বেড়ে গেছে। মুখে হিজিবিজি আঁচড়। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। কাজে তার মন নেই। কোনরকমে দোকান খুলে বসে।

NOT FOR SALE

পারিজাত বক্‌সি সবই লক্ষ্য করলেন। তাঁর সামনের চেয়ারে মোহনের বাবা চুপচাপ বসেছিল।

পারিজাত বক্‌সি বললেন, অভয়বাবু, আপনি অমন দমে যাবেন না। আমি বলছি, আপনার ছেলেকে ওরা মেরে ফেলেনি।

মোহনের বাবা আস্তে আস্তে মুখ তুলে করুণ গলায় বলল, প্রাণে হয়তো মারবে না, কিন্তু পঙ্গু করে দিয়েছে হয়তো। কিংবা যদি অন্ধ করে দিয়ে থাকে, তাহলেও আমার ছেলের অবস্থা ভেবে দেখুন।

কথাগুলো বলবার সময় মোহনের বাবার দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ল। পারিজাত বক্‌সি উঠে গিয়ে মোহনের বাবার পিঠে একটা হাত রাখলেন, আপনি ওভাবে ভেঙ্গে পড়বেন না। আমি যা বলছি, তাই করুন।

কি বলুন? আপনি একটা চিঠি লিখে তিন মাস সময় নিন—সাত হাজার টাকা যোগাড় করতে কিছু সময় নেবে। অত টাকা হাতে নেই।

বেশ, তাই করব।

তাই করব নয়—এখনই করুন। আমি কাগজ এনে দিচ্ছি।

কাগজ-কলম এল। পারিজাত বক্‌সি যেমন বললেন, মোহনের বাবা ঠিক তেমনই লিখলেন। লেখা শেষ হতে পারিজাত বক্‌সি আবার বললেন, আপনি চলে যান হাওড়া স্টেশনে। ন' নম্বর প্ল্যাটফর্মে চিঠিটা ঘড়ির নীচে রাখবার কথা, তাই না?

মোহনের বাবা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

মোহনের বাবা বেরিয়ে যাবার মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পরে এ-বাড়ি থেকে একজন চীনা ভদ্রলোক বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াল।

মাথায় টুপি। সামনের দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। পরনে টাইট কোট-প্যান্ট।

একটু পরে হাওড়া স্টেশনে ন'নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে চীনা ভদ্রলোককে দেখা গেল।

একটা খবরের কাগজ খুলে চোখের সামনে ধরা।

মোহনের বাবা প্ল্যাটফর্মে ঢুকে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে পকেট থেকে চিঠিটা বের করে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে আর সেখানে দাঁড়াল না।

কিছুক্ষণ কাটল।

NOT FOR SALE

একটা কুলি চিঠিটা তুলে নিয়ে চীনা ভদ্রলোকের সামনে দিয়ে স্টেশনের বাইরে গেল।

খবরের কাগজের আড়াল দিয়ে চীনা ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সব দেখল।

বাইরে একটা ফেরিওয়ালা বসে ছিল। তার ডালায় বাদাম ভাজা।

কুলি চিঠিটা বাদামের ডালায় রেখে আবার স্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মিনিট পনরো ফেরিওয়ালা চুপচাপ বসে রইল, তারপর উঠে দাঁড়াল।

এইবার চীনা ভদ্রলোক চলতে আরম্ভ করল। হাওড়া স্টেশনের বাইরে মোটর সাইকেলের ওপর একটি ছোকরা বসে ছিল। সে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়েই মোটর সাইকেল চালিয়ে দিল।

রাস্তার এক পাশে কালো রংয়ের একটা মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। চীনা ভদ্রলোক মোটরে উঠে মোটর চালু করল।

হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে মোটর সাইকেল ছুটল। পিছন পিছন মোটর।

এ-গলি সে-গলি পেরিয়ে শহর ছাড়িয়ে শহরতলীর এক পুরনো ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে মোটর সাইকেল থামল।

আরোহী নেমে কিছুক্ষণ একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কি করল, তারপর পকেট থেকে চিঠিটা বের করে গাছের কোটরে রেখে দিল। তারপর লোকটা আবার মোটর সাইকেলে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চীনা ভদ্রলোক মোটর থেকে নেমে এদিক ওদিক দেখল। তারপর এগিয়ে এসে এক ফাঁকে চিঠিটা তুলে নিল।

এটা মোহনের বাবার চিঠি, কিন্তু এ চিঠি নিতে তো কেউ আসছে না। খুব সম্ভব দিনের বেলা কেউ আসবে না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে এই ভাঙ্গা বাড়ির মধ্য থেকে লোক বেরিয়ে চিঠিটা নেবে। তাহলে ততক্ষণ তাকে কাছাকাছি অপেক্ষা করতে হবে!

চীনা ভদ্রলোক ভাঁজকরা চিঠিটা খুলেই চমকে উঠল। না, এটা তো মোহনের বাবার লেখা নয়। একই রংয়ের কাগজ; কিন্তু লেখা আছে—টিকটিকি সাবধান। পিছু ধাওয়া করে কোন লাভ হবে না।

আশ্চর্য, এ চিঠি কখন লিখল লোকটা?

NOT FOR SALE

তাছাড়া ছদ্মবেশ ধরার ব্যাপারে পারিজাত বক্সির খুব নাম ছিল, কিন্তু এ দলের চোখে ধুলো দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, কি লজ্জার কথা!

মোটরে উঠতে গিয়েই পারিজাত বক্সি থেমে গেলেন। গাছের নীচে সাদা রঙের কী একটা পড়ে রয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে পারিজাত বক্সি সেটা তুলে নিলেন। রুমাল। চারধারে সবুজ বর্ডার।

সঙ্গে পুলিশের কুকুর থাকলে এই রুমালের গন্ধ শুঁকিয়ে লোকটার অনুসরণ করানো যেত। অবশ্য লোকটা এখন বহু দূর সরে পড়েছে।

রুমালটা নিয়ে পারিজাত বক্সি মোটরে উঠলেন। বড় রাস্তায় পাশাপাশি দুটো লন্ড্রি। মোটর সামনে রেখে পারিজাত বক্সি নামলেন।

লন্ড্রির মালিক ভিতরে ছিল। পারিজাত বক্সি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

মালিক ভ্রূ কোঁচকাল।

আমার সঙ্গে? আমার সঙ্গে কি কথা?

পারিজাত বক্সি পকেট থেকে তাঁর নাম লেখা কার্ড বের করে মালিককে দেখালেন।

মালিক উঠে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার স্যর, আমার দোকানে আপনি কেন? আমি তো সাদাসিধে লোক। কোন গোলমালে থাকি না।

পারিজাত বক্সি রুমালটা বের করে মালিকের টেবিলের ওপর রাখলেন। বললেন, কোণের দাগটা দেখে বলুন তো এটা পাড়ার কোন্ বাড়ির রুমাল!

মালিক রুমাল তুলে নিয়ে ভাল করে দেখল। কোণে গুণ চিহ্নের মত দাগ। একটু দেখে নিয়ে সে বলল, এ দাগ আমাদের দোকানের নয়। আপনি পাশের দোকানে খোঁজ করুন।

রুমাল তুলে নিয়ে পারিজাত বক্সি পাশের দোকানের দিকে এগোলেন। দোকানের নাম পূর্ণিমা লন্ড্রি।

একটি প্রৌঢ় বাইরে বসে আছে।

NOT FOR SALE

সেখানে গিয়েও নিজের নাম-লেখা কার্ড দেখিয়ে পারিজাত বক্সি রুমালটা বের করলেন। —দেখুন তো এটা কোন্ বাড়ির হতে পারে?

একবার চোখ বুলিয়েই প্রৌঢ় লোকটি বলল, আরে, এ তো সদাশিববাবুর বাড়ির রুমাল।

কে সদাশিববাবু?

সদাশিব পাল। চব্বিশ নম্বর বাড়ি।

আপনি চেনেন তাঁকে?

সে কি মশাই, আমার দশ বছরের খদ্দের। আমি চিনব না?

কি করেন তিনি? ব্যবসা আছে। তেঁতুলের ব্যবসা।

পারিজাত বক্সি আর দাঁড়ালেন না। রাস্তায় নেমে এলেন।

যেটুকু খবর পেয়েছেন লণ্ড্রি থেকে, এর বেশি কিছু যোগাড় করা সম্ভব নয়।

হনহন করে এগিয়ে পারিজাত বক্সি চব্বিশ নম্বর বাড়ির সামনে পৌঁছলেন।

টিম টিম করে জ্বলছে ইলেকট্রিকের আলো। তার নীচে একটি প্রৌঢ় বিরাট খাতা খুলে কি সব হিসাবপত্র করছে।

পারিজাত বক্সিকে ঢুকতে দেখে প্রৌঢ় মুখ তুলল। কে? কি চাই আপনার?

আপনি কি সদাশিববাবু?

হ্যাঁ।

দেখুন তো এ রুমালটা কি আপনার?

আপনার মাথা খারাপ! ওই রকম বর্ডার দেওয়া রুমাল এ বয়সে আমি ব্যবহার করব? তাছাড়া আমি রুমাল ব্যবহারই করি না।

এখানে আর কে থাকে?

কে থাকবে! আমি আর তেঁতুলের বস্তা থাকি।

আমি এ গুদামঘর সার্চ করব।

আপনি কে মশাই সার্চ করবার? আপনাকে আমি সার্চ করতে দেবোই বা কেন?

ঠিক আছে। যাতে দেন সে ব্যবস্থা করছি। কথাটা বলেই, পারিজাত

NOT FOR SALE

বক্সি সমস্যায় পড়লেন। যদি এখন তিনি সার্চের ব্যবস্থা করতে থানায় যান, তাহলে সদাশিববাবু হয়তো সেই ফাঁকে কাজ গুছিয়ে রাখবে। কিন্তু ওয়ারেন্ট ছাড়া সার্চ করাও সম্ভব নয়।

হঠাৎ পারিজাত বক্সির খেয়াল হলো। তাঁর মোটরের মধ্যে তো সব বন্দোবস্ত রয়েছে। সেখান থেকে কাছের থানায় সবকিছু জানাতে পারবেন।

তাই হলো।

আধ ঘন্টার মধ্যে থানার দারোগা দু'জন পুলিশ নিয়ে হাজির। সঙ্গে সার্চ ওয়ারেন্ট।

প্রথমে একতলাটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। তেঁতুলের বস্তা, দাঁড়িপাল্লা, হিসাবের খাতাপত্র ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই।

সকলে ওপরে উঠল। দোতলায় সারি সারি ঘর।

কোন ঘরে কিছু নেই, শুধু শেষের দিকের একটা ঘরে একটা ছোট ছেলের নীল প্যান্ট। পাশে একটা চাবুক।

পারিজাত বক্সি প্যান্ট আর চাবুক দুটোই তুলে নিলেন। প্যান্টে অল্প অল্প রক্তের দাগ।

এ প্যান্ট কার?

কি করে জানব বলুন? এখন বাজার খুবই খারাপ। ওপরতলায় তেঁতুলের বস্তা রাখার আর দরকার হয় না। আমি দোতলায় আসিই না।

কিন্তু এসব কামরা দেখে তো মনেই হচ্ছে না যে, কোনদিন এখানে তেঁতুলের বস্তা রাখা হতো।

এবার সদাশিববাবু রেগে উঠল। আপনার মনে না হলে আর কি করতে পারি বলুন! আমার হিসাবের খাতা দেখলেই বুঝতে পারবেন।

পারিজাত বক্সি আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত সদাশিববাবু। কিছু মনে করবেন না। আমাদেরই ভুল হয়েছিল।

পারিজাত বক্সি বেরিয়ে গেলেন।

রাত নেমে এলে গলিটা যখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, তখন একটি ছায়ামূর্তি খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে এল।

NOT FOR SALE

ঝাঁকড়া একটা অশ্বত্থ গাছ। চোখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে ছায়ামূর্তি তরতর করে ওপরে উঠে গেল। এক ডাল থেকে অন্য ডালে।

মোটা একটা ডাল দোতলার জানলা পর্যন্ত এসেছে। মূর্তিটা ডাল আঁকড়ে চুপচাপ পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল।

পাশের বাড়ি অন্ধকার। কোথাও আলোটালো নেই। চারদিকে ঝিঁঝি ডাকছে। দূরে দূরে পথের কুকুরের চীৎকার। জনমানবের সাড়াশব্দ নেই।

হঠাৎ টুং টুং করে আওয়াজ।

রাত কত বোঝবার উপায় নেই। মূর্তি ঝুঁকে পড়ে দেখল।

এঁকে বেঁকে একটা সাইকেল এসে গাছের নীচে দাঁড়াল।

আরোহী ওপর দিকে চোখ ফেরাতেই দোতলার একটা জানলা থেকে একটা টর্চের আলো দপ দপ করে দু'বার জ্বলেই নিভে গেল। বোঝা গেল, কোন রকম সংকেত।

তারপর সাইকেল নিয়ে আরোহী ভিতরে ঢুকে পড়ল।

দোতলার একটা ঘরে অল্প জোরালো একটা বাতি জ্বলে উঠল।

ছায়ামূর্তি আরো সরে এসে জানলার ধারে বসল।

কামরার মধ্যে সদাশিব আর মোটর-সাইকেল আরোহী। এই লোকটাই প্লাটফর্ম থেকে চিঠি নিয়ে এসেছিল।

সদাশিব লোকটাকে খিঁচিয়ে উঠল, তুই কি দিন দিন ছেলে মানুষ হচ্ছিস বিনোদ?

কেন, কি হলো?

কি হলো? পকেট থেকে রুমালটা রাস্তার ওপর ফেলে গেছিস। সেই রুমালের মার্কা ধরে টিকটিকি এসে হাজির।

বিনোদ একটু ঘাবড়ে গেল। বলল, সেইজন্যই রুমালটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম কোথায় পড়ে গেল। তারপর কি হলো?

হবে আবার কি! বাড়ি তো খালি। সব তো সর্দার সরিয়ে দিয়েছে।

হুঁ, আমিও টিকটিকিকে খুব ধোঁকা দিয়েছি। আমি জানতাম, ওই ছেলেটার বাপ সব কাজ টিকটিকিকে জানিয়ে করছে। টিকটিকি ঠিক আমার পিছু নেবে। তাই আমি একটা চিঠি তৈরি করে পকেটে নিয়ে রেখেছিলাম। সুযোগ বুঝে অশ্বত্থগাছের তলায় সেটা রেখে দিয়েছিলাম।

NOT FOR SALE

যাক, সর্দার কি বলে?

সর্দারের ইচ্ছা, অপেক্ষাই করা যাক।

কি জানি, তার চেয়ে ছেলেটাকে অন্ধ করে দিয়ে কিংবা পা দুটো খোঁড়া করে দিয়ে আয় বাড়াতে পারলেই ভাল হতো।

সর্দারের ধারণা, ছেলেটার বাপ ইচ্ছে করলে টাকা দিতে পারে। গাঁয়ের লোকের কাছে খবর পেয়েছে, বাপ ছেলেকে ভালবাসে। কাজেই একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু দেবে টাকাটা ঠিক। অবশ্য টাকাটা পেলেই যে ছেলেকে ছাড়া হবে এমন কোন কথা নেই।

ছায়ামূর্তি বসে বসে ভাবল। এই সময় আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে পুলিশে খবর দিয়ে এই দু'জন লোককে সহজেই গ্রেপ্তার করা চলে, কিন্তু তাতে আসল কাজ হবে না। তা ছাড়া এদের বিরুদ্ধে প্রমাণই বা কি!

সব ব্যাপারটাই এরা বেমালুম অস্বীকার করে বসবে। তবে এই সদাশিব লোকটাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। তেঁতুলের কারবার যে তার স্রেফ বাইরের সাজানো ব্যাপার, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

একটু পরেই লোকটা উঠে দাঁড়াল। সাইকেল চড়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার বেশ কিছুক্ষণ পর ছায়ামূর্তি নামল। এদিক-ওদিক দেখে, খুব সাবধানে। কিন্তু একটু এগিয়েই মুশকিলে পড়ল।

একটা কুকুর ঘুমোচ্ছিল। তার পা গিয়ে পড়ল একেবারে ঘুমন্ত কুকুরের ওপর।

ভাগ্য ভাল, কুকুরটা কামড়ায়নি কিন্তু বিকট শব্দে চীৎকার শুরু করল।

কান পাতা দায়। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে বেঁটে মোটা একটা লাঠি এসে পড়ল ছায়ামূর্তির পায়ে। ছায়ামূর্তি পথের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

একবার মনে হলো, একটা হাঁটুর হাড় বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আর জীবনে উঠে দাঁড়াতেই পারবে না।

এক সময় অনেক কষ্টে ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়াল।

টলতে টলতে কয়েক পা যেতেই আবার বিপদ। পেছন থেকে কে একজন তাকে সজোরে জাপটে ধরল। আর একজন রুমাল দিয়ে মুখ বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে একেবারে কাঁধের ওপর তুলে নিল।

NOT FOR SALE

কিছু দূরেই একটা মোটর দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে ছায়ামূর্তিকে পিছনের সীটে ছুঁড়ে দিল।

চীৎকার করার সুযোগ নেই। শুধু দুটো হাত খোলা। দুটো পা-ই শক্ত করে বাঁধা।

খোলা হাত দিয়ে ছায়ামূর্তির কিছু করার নেই।

তার পায়ের কাছে একজন বসে রয়েছে। মনে হচ্ছে তার হাতে কালো মোটা একটা লাঠি। এটা ছুঁড়েই বোধহয় ছায়ামূর্তির পা জখম করেছিল। একটু বেচাল দেখলে হয়তো লাঠি দিয়ে সোজা মাথাতেই আঘাত করে বসবে।

ছায়ামূর্তি চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইল। বুঝতে পারল, মোটর তীরবেগে ছুটে চলেছে।

অনেকক্ষণ। অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে।

ছায়ামূর্তি মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখে নিচ্ছিল।

এক সময়ে মোটর থামল। দু'জন লোক ধরাধরি করে ছায়ামূর্তিকে নামিয়ে আনল। একটা খাটিয়ার ওপর তাকে শুইয়ে লোক দু'জন চৌকাঠের বাইরে বসল।

এখন বেশ আলো ফুটেছে। কোথাও কোন অন্ধকার নেই।

এবার ছায়ামূর্তিকে চেনা গেল। ছায়ামূর্তি পারিজাত বক্সি স্বয়ং।

পারিজাত বক্সি অজ্ঞান হয়ে যাবার ভান করে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলেন। বাইরে থেকে লোক দুটোর কথাবার্তা তাঁর কানে ভেসে এল।

তুই তাহলে থাক এখানে। লোকটাকে পাহারা দে। আমি চলি।

কোথায় যাবি তুই?

তারক গাড়ি নিয়ে শহরে গেছে, যদি সর্দারকে পায় ওখানে। আমি একবার মান্দারনপুর ঘুরে আসি মেঘার ওখানে। যদি সর্দার ওখানে গিয়ে থাকে। সেই ছেলেটাকে মেঘার কাছে রাখা হয়েছে কিনা।

কি করতে যে ছোকরাটাকে কইমাছের মতন জিইয়ে রেখেছে কে জানে? শেষ করে দিলেই আমাদের হয়রানি কমে।

যাক, ও-সব উঁচুতলার ব্যাপার আমাদের ভেবে লাভ নেই।

তুই ভেতরে গিয়ে ওর অবস্থাটা দেখে আয়, তারপর বাজারে গিয়ে খেয়ে নিয়ে আবার পাহারায় বসবি।

NOT FOR SALE

লোকটার পায়ের শব্দ পাওয়া মাত্রই পারিজাত বক্সি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস বন্ধ।

লোকটা ঝুঁকে পড়ে একবার দেখল। নাকের তলায় হাত দিল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, না রে, এখনো দেখছি জ্ঞান ফেরেনি। এসব শহরের ফুলবাবু তো, ভয়েই বোধহয় সিঁটিয়ে গেছে।

আর একজন বলল, এত ভয় তো এসব কাজে আসা কেন?

পয়সা ভাই, পয়সা। সবই পেটের জন্য। আমাদের কথাই ভাব না। যাক চল, দরজা বন্ধ করে বের হয়ে পড়ি।

বাইরে দরজায় তালা দেওয়ার শব্দ হলো।

তারপরও কিছুক্ষণ পারিজাত বক্সি চুপচাপ শুয়ে রইলেন। অনেকটা সময় কাটিয়ে খাটিয়ার ওপর উঠে বসলেন। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলেন।

মাটির দেয়াল। টিনের চাল। একটি জানলা, একটি দরজা। দরজা-জানলা ঘরের তুলনায় বেশ মজবুত।

কোনমতে খাটিয়াটা ঠেলে ঠেলে তিনি জানলার কাছে নিয়ে এলেন। হাত দুটোও এবার বেঁধেছে।

চারিদিকে ধু ধু মাঠ। কোথাও বসতির চিহ্নমাত্র নেই।

পারিজাত বক্সি খাটিয়ায় শুয়ে দুটো পা জানলার মধ্যে গলিয়ে দিলেন। মরচে পড়া গরাদ প্রায় লাল হয়ে রয়েছে। দড়ির বাঁধন সেই গরাদের গায়ে ঘষতে লাগলেন।

পা দুটো টনটন করছে। বেশ ব্যথা রয়েছে, কিন্তু সময় নষ্ট করা চলবে না।

ঘষতে ঘষতে এক সময় বাঁধন ছিঁড়ে গেল। হাতের বাঁধনও একইভাবে খোলা হলো। পারিজাত বক্সি উঠে দাঁড়ালেন। ঘুরে বেড়ালেন ঘরের মধ্যে। পায়ে ব্যথা রয়েছে বটে, কিন্তু এ নিয়ে চলাফেরা করতে পারবেন।

প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, রিভলবারটি ঠিক ঠিক আছে। এটার অস্তিত্ব কেউ টের পায়নি। কাল এটা ব্যবহার করার বিশেষ সুযোগ ছিল না। পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করলেই লোকগুলো হয়তো তাকে শেষ করে দিত।

পারিজাত বক্সি উঠে দরজার কাছে গেলেন। টেনে দেখলেন, মোটা একটা চেনের সঙ্গে বাঁধা।

NOT FOR SALE

এ দরজা দিয়ে বের হবার কোন আশা নেই। পারিজাত বক্সি খাটিয়ায় ফিরে এলেন। চুপচাপ শুয়ে ভাবতে লাগলেন।

যেমন করেই হোক এ কেস্টার একটা কিনারা করতেই হবে। দলটা বারবার তার চোখে ধুলো দিয়ে পালাচ্ছে।

আর একটা ব্যাপার, কেউ যেন চুপি চুপি তার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। প্রত্যেকবার তাঁর ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যাচ্ছে।

দরজায় শব্দ হতেই পারিজাত বক্সি চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

তালা খুলল। কে একজন যেন ঢুকল। খাটিয়ার কাছ বরাবর এসে বলল, এ কী রে বাবা, লোকটা এখনো চুপচাপ পড়ে আছে! শেষ হয়ে গেল নাকি?

লোকটা পারিজাত বক্সির গায়ে ঝুঁকে পড়তেই পারিজাত বক্সি প্রবল বেগে ঘুষি চালালেন লোকটার চোয়াল লক্ষ্য করে।

বাপস্। বলে লোকটা ছিটকে দেয়ালের কোণে গিয়ে পড়ল।

পারিজাত বক্সি এক মুহূর্তও নষ্ট করলেন না। পকেট থেকে রিভলবার বের করে লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, খবরদার, একটু চেঁচালেই খুলি ফুটো করে দেবো।

লোকটা চেঁচাবে কি, বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছে!

হাতের এত শক্তি তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। চোয়ালে ঘুষি খেয়ে তখনো সে চোখে সর্ষে ফুল দেখছে।

উঠে দাঁড়াও!

লোকটা দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল। তার পরনে পাতলা একটা গেঞ্জি আর ফুলপ্যান্ট। প্যান্টের পেছনে পকেট।

দুটো হাত ওপরে তোল।

লোকটা হাত তুলল।

পারিজাত বক্সি প্যান্টের পকেট দেখল। একটা চামড়ার মানিব্যাগ, তাতে চার টাকা ত্রিশ পয়সা। আর আধময়লা একটা বড় রুমাল।

ব্যাগটা আবার রেখে দিয়ে পারিজাত বক্সি বললেন, মেঘা কে?

লোকটা কিছুক্ষণ চোখ পিট পিট করে বলল, আমাদের দলের একজন।

মোহন বলে একটা ছেলেকে ধরে এনে কোথায় রেখেছ?

ও নামে কাউকে জানি না।

NOT FOR SALE

মেঘার কাছে কে আছে তাহলে?

নতুন ছেলে একটা।

তার নাম কি?

জানি না।

এসব ছেলেদের নিয়ে কি করা হয়?

জানি না।

সোজা উত্তর না দিলে অদৃষ্টে দুঃখ আছে।

মা কালীর দিব্যি, জানি না। আমাদের কাজ শুধু টিকটিকি আগলানো। বলেই লোকটা জিভ কাটল।

পারিজাত বক্সি বুঝতে পারলেন, লোকটার কাছ থেকে এর বেশি আদায় করা যাবে না।

পিছন ফেরো।

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল।

পারিজাত বক্সি পকেট থেকে নাইলনের দড়ি বের করে লোকটার দুটো হাত পিছমোড়া করে বাঁধলেন। তারপর তাকে টানতে টানতে খাটিয়ার ওপর শুইয়ে ফেললেন। তারপর পা দুটোও বাঁধলেন।

রুমাল বের করে তার মুখে এমন ভাবে গুঁজে দিলেন, যাতে লোকটার দুটো চোখ ছানাবড়ার মতন বেরিয়ে এল।

পারিজাত বক্সি হেসে বললেন, এইভাবে শুয়ে থাক। আমি চলি।

বাইরে বেরিয়ে চেনে তালা লাগিয়ে দিলেন। চাবি তালাতেই ঝুলছিল।

প্রথমে চলতে বেশ একটু কষ্ট হচ্ছিল। উঁচু-নীচু জমি, তারপর পায়ে-চলা পথ পাওয়া গেল।

চলতে চলতে পারিজাত বক্সি ভাবলেন, একটা ভুল হয়ে গেল। এখান থেকে বাইরে যাবার রাস্তাটা লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে নিলে হতো। কোনদিক দিয়ে গেলে সোজা হবে কে জানে!

তারপর আবার তাঁর মনে হলো, কিছু বলা যায় না, জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সে উল্টো পথই বাতলে দিত। যাতে সারাক্ষণ কেবল মাঠে মাঠেই ঘুরতে হতো। ইতিমধ্যে সঙ্গীরা এসে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করত।

NOT FOR SALE

অনেকটা যাবার পর পারিজাত বক্‌সি দেখলেন, শাক-সব্‌জি মাথায় নিয়ে একটা লোক এগিয়ে আসছে।

ও কত্তা, একটা কথা শোন।

লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

এখান থেকে রেল স্টেশন কোনদিকে?

লোকটা অবাক হয়ে গেল।

রেল স্টেশন? এদিকে ওসব নেই।

তাহলে বাইরের লোকেরা যাওয়া-আসা করে কিসে?

বাবুরা হাওয়া গাড়িতে আসে, আর সবাই আসে খেয়া পার হয়ে।

খেয়াঘাট এখানে কোথায়?

এখান থেকে দেড় ক্রোশ। ওই ওদিকে।

পারিজাত বক্‌সি এগিয়ে চললেন।

রোদ বাড়ছে। বেশ তাপ। চলতে কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে রাস্তার দু'পাশে বাবলা গাছ। তার তলায় মোটেই ছায়া নেই।

অনেকটা পথ গিয়ে খেয়াঘাট নজরে এল।

নদীর ধারে সারি সারি অনেকগুলো চালাঘর। দুটো চায়ের দোকান, একটা কবিরাজখানা আর একটা চুল কাটার সেলুনও আছে সেখানে।

পারিজাত বক্‌সি প্রথমে চায়ের দোকানে ঢুকলেন। খিদে তো পেয়েইছে, তো ওপর তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

পারিজাত বক্‌সি চা আর বিস্কুটের অর্ডার দিলেন। এ ছাড়া অবশ্য কেক ছিল, কিন্তু কেকের অবস্থা দেখে আর খাবার ইচ্ছা হলো না।

দু'কাপ চা আর গোটা আষ্টেক বিস্কুট খেয়ে পারিজাত বক্‌সি অনেকটা ধাতস্থ হলেন। তারপর গিয়ে ঢুকলেন কবিরাজের দোকানে।

একজন বুড়ো ভদ্রলোক বসে। মাথায় সাদা ধবধবে চুল, পাকা পাকা গোঁফ। তাকে পা দুটো দেখালেন।

কি করে হলো? খুব ব্যথা কি? দাঁড়ান ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি।

সব বুড়ো মানুষের মতন কবিরাজ একটু বেশি কথা বলে, সেটা বোঝা গেল। ওষুধ লাগানো হতে পারিজাত বক্‌সি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, এ জায়গার নাম কি?

NOT FOR SALE

বাজে মল্লিকপুর।

মান্দারনপুর এখান থেকে কত দূর?

কবিরাজ ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

মান্দারনপুর বলে তো এদিকে কোন জায়গা নেই। এক মান্দারনপুর আছে, খেয়া পার হয়ে রেলে করে যেতে হয়। যেখানে চণ্ডেশ্বরীর মন্দির আছে! বাবার কাছে শুনেছিলাম, অনেক আগে খুব ধুমধাম করে পুজো হতো। মেলা হতো। এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। কেন, সেখানে আপনার কি দরকার?

আমার কিছু পৈতৃক জমি ছিল। সেগুলো দেখাশুনো করতে যাব।

অ। কবিরাজ টেবিলের ওপর রাখা একটা খবরের কাগজে মন দিল।

আচ্ছা, খেয়া নৌকা কখন আসবে?

কবিরাজ মুখ তুলে দেখে বলল, ওই তো আসছে।

মাঝ-নদীতে একটা নৌকা। যাত্রী বোঝাই। এদিকেই আসছে।

পারিজাত বক্সি সাবধানে নেমে খেয়াঘাটে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আরও কয়েকজন যাত্রী মোটঘাট নিয়ে বসে আছে। সবাই প্রায় চাষাভুষো শ্রেণীর।

এ নৌকা যেখানেই যাক, এ জায়গা পারিজাত বক্সিকে ছাড়তেই হবে। শয়তানের দল হয়তো তার সন্ধানে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এবার ধরলে আর— এত সহজে উদ্ধার পাওয়া যাবে না।

নৌকা পারে এসে লাগল।

।। সাত ।।

সেই রাত্রেই এক ব্যাপার।

সারাটা দিন মোহনকে খাটতে হয়েছে। সকালে মেঘা দরজা খুলে বলেছে, ভারি আমাদের রাজপুত্তুর এসেছেন! আমরা কেবল ওঁর সেবা করব। নে ওঠ।

ভয়ে ভয়ে মোহন উঠে পড়েছে।

আধপোড়া রুটি আর গুড় খাওয়া হতে, মেঘা তার হাতে একটা মাটির ঘড়া তুলে দিয়ে বলেছে, ওই পুকুর থেকে জল তুলে আমার বাগানে দে। কাজ কর। বসে থেকে থেকে হাত-পায়ে মরচে ধরে যাবে যে।

NOT FOR SALE

মোহনের প্রথমে ধারণা হয়েছিল, বার দুই-তিন জল ঢাললেই বুঝি কাজ শেষ হয়ে যাবে।

ডোবার পাশেই মেঘার বেগুন ক্ষেত। একটা খাটিয়া নিয়ে মেঘা বেগুন ক্ষেতের পাশে বসল। হাতে হুঁকো। কাজের তদারকি করাও হবে, আবার ছেলেটাকে নজরেও রাখতে পারবে।

তালগাছের লম্বা সিঁড়ি। ভীষণ পিছল।

শ্যাওলা সরিয়ে ঘড়াতে জল ভরতে হবে, তারপর সেই ভারি ঘড়া বয়ে এনে বেগুন ক্ষেতে জল দেওয়া।

একটু দেরি হলেই মেঘার বজ্রকণ্ঠের চীৎকার, কি রে, মরলি নাকি। উঠব একবার?

প্রায় টানা দু'ঘণ্টা?

মেঘা যখন বলল, ব্যস, আজ এই পর্যন্ত, তখন মোহনের দুটো হাত তুলবার ক্ষমতা নেই। কাঁধ পর্যন্ত টনটন করছে।

মনে মনে মোহন ভাবল, হায় রে, সৎমার কয়েকটা ফাই-ফরমাশ খাটবার ভয়ে দেশে কত কাণ্ড করেছে, অথচ এ খাটুনির তুলনায় সে তো কিছুই নয়। রোজ এইরকম খাটতে হয়, তাহলে কারুর আর মোহনকে মারবার প্রয়োজন হবে না। সে এমনিতেই মরে যাবে।...

[redacted]র দিকে চাটাইয়ের ওপর মোহন টান হয়ে শুয়েছিল, মেঘার মা এসে বলল, নে, উঠে চাল ক'টা বেছে দে, ছেলেমানুষ কি ওরকম শুয়ে থাকে?

ফলে রাতে যখন মোহন শুতে গেল, তখন তার গায়ে একটুও শক্তি নেই। চাটাইয়ের শোবার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুম এসে গেল।

তারপর মাঝরাতে হঠাৎ কিসের শব্দ। একেবারে মোহনের কানের পাশে।

মোহন ক্লান্ত চোখ দুটো খুলে যা দেখল, তাতে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

সারা ঘর জুড়ে গোটা চারেক সাপ। দুটো বড়, দুটো ছোট। ফণা তুলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে মেঝের ওপর ছোবল দিচ্ছে। বোধহয় এটাই খেলা। সেই সময় হিস্ হিস্ আওয়াজ হচ্ছে। ছোট গুলোর গর্জন আরো বেশি।

মোহন শুয়েছিল, নড়াচড়া করলেই সাপের নজরে পড়ার সুযোগ

NOT FOR SALE

বেশি, কিন্তু এতগুলো সাপের এত কাছাকাছি সে চুপ করে শুয়ে থাকবেই বা কি করে?

মোহন মরীয়া হয়ে দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা দিতে শুরু করল।

অনেকক্ষণ ধাক্কা দেবার পর দরজা খুলল।

মেঘার মা কুপি হাতে দরজা খুলেই গালাগাল শুরু করল, এ তো আচ্ছা জ্বালাতন! রাত্তিরেও একটু চোখ বোজবার উপায় নেই। কি হলো কি, বল? আপদ এসে জুটেছে এক!

মোহনের সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে। কথা বলবার শক্তি নেই। কোন রকমে উচ্চারণ করল, সাপ, অনেকগুলো সাপ। দিদিমা বাঁচাও।

মেঘার মা যখন ঘরের দিকে তাকাল, দেখল সাপগুলো এক কোণে সরে গেছে। কিছুটা কুণ্ডলী পাকিয়ে একটু ফণা উঁচু করে রয়েছে। বোধহয় দরজার আওয়াজে তারাও একটু ভয় পেয়েছে।

মেঘার মা সব দেখে নিয়ে বলল, তোকে না বলেছি, ওসব বাস্তুসাপ, কোন ক্ষতি করবে না। তবু মাঝরাত্তিরে চেঁচাবি?

মোহন দু'হাতে বুড়িকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, আমার বড় ভয় করছে দিদিমা। আমি এ ঘরে শুতে পারব না।

শোন কথা ছেলের! এ ঘরে শুবি না তো কোথায় শুবি? বুড়ির গলা যেন শেষদিকে একটু নরম হয়ে এল।

মোহন উত্তর দিল না।

বুড়ি কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, ঠিক আছে, চল শুইগে।

চাটাইয়ে পাশাপাশি দু'জনে শুলো।

মোহনের তখনি ঘুম এল না, কিন্তু বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

মোহন চোখ ঘুরিয়ে দেখল। আশ্চর্য কাণ্ড। সাপগুলো কোথাও নেই। বোধহয় ফাটলের মধ্যে ঢুকে গেছে।

হঠাৎই মোহনের মনে কথাটা এল। এই তো সুযোগ। বুড়ি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দরজা খোলা। এখন কোনরকমে বের হতে পারলে রাতের অন্ধকারে অনেকটা পথ পালানো যাবে।

NOT FOR SALE

চারদিকে বেশ জঙ্গল। প্রহরে প্রহরে শেয়ালের ডাক মোহনের কানে এসেছে। আরও হিংস্র কোন জন্তু আছে কিনা তার জানা নেই।

জন্তু-জানোয়ারের কবলে পড়বে কিনা কে জানে। যাই কিছু হোক, এমন সুযোগ হারানো উচিত হবে না।

আস্তে আস্তে মোহন উঠে বসল। না, বুড়ি অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। নাকের গভীর গর্জন।

মোহন দাঁড়াল। কুপির আলোয় ঘুমন্ত বুড়িকে বীভৎস দেখাচ্ছে।

কিন্তু মেঘা নিশ্চয় বাড়িতেই আছে। মোহনকে বের হতে দেখলে লাফিয়ে এসে টুঁটি চেপে ধরবে। দেখাই যাক। কপালে যা আছে হবে!

মোহন আর এভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বাইরে মিশকালো অন্ধকার। একহাত দূরের কিছু দেখার উপায় নেই। মাঝে মাঝে শুধু ঝোপের ফাঁকে জোনাকির আলো। নানারকম শব্দ ভেসে আসছে। মোহনের গা ছমছম করে উঠল।

পিছন ফিরে মোহন একবার দেখল, বুড়ি ঘুমোচ্ছে। দুটো সাপ ফাটল থেকে বের হয়ে মেঝেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মোহন আর অপেক্ষা করল না। বাইরে পা বাড়াল। তার মনে আছে, তিনটে সিঁড়ির ধাপ; তারপরই মাটি।

মাটিতে পা রেখে একটু দাঁড়াল সে। কোনদিক থেকে এখানে এসেছিল আন্দাজ করার চেষ্টা করল, কিন্তু রাতের অন্ধকারে তা সম্ভব হলো না।

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটাও ঠিক হবে না। মোহন ছুটতে আরম্ভ করল।

উঁচু-নীচু জমি। অন্ধকারে কাঁটাঝোপকে আলাদা করে চেনার কোন উপায় নেই। অনেকবার মোহন ঝোপের ওপর গিয়ে পড়ল। কাঁটার আঘাতে গা ক্ষতবিক্ষত হলো। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না, দু'জায়গায় বোধহয় রক্তও বেরিয়েছে।

অনেকটা ছোটার পর চোখের সামনে একটা দৃশ্য দেখে মোহনের রক্ত হিম হয়ে গেল।

দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। অন্ধকারে জন্তুদের চোখ ঠিক এমন করেই জ্বলে।

NOT FOR SALE

নীল আর হলদে মেশানো আলো। দেশের বাড়িতে আচমকা ঘুম থেকে উঠে কত রাতে জানলা দিয়ে দেখেছে, উঠোনে অনেকজোড়া এই ধরনের চোখ ঘোরাফেরা করছে।

মোহন জানত, সে-সব শেয়ালের চোখ। পুকুরের পাশে বাঁশবনের মধ্যে শেয়ালের গর্ত। রাত হলেই তারা দলে দলে বেরিয়ে আসে। লোকেদের উঠোনে হাঁস-মুরগির লোভে ঘোরাফেরা করে।

জঙ্গলের মাঝখানে এভাবে তাদের মুখোমুখি মোহনকে কোনদিন দাঁড়াতে হয়নি। শেয়াল কামড়ায় একথা শুনেছে। তাদের গাঁয়ে কা'কে একবার কামড়েছিল।

মোহন মাটিতে বসে পড়ল। দু'হাতে মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিল। তারপর সেই চোখ লক্ষ্য করে ঢেলাগুলো ছুঁড়তে আরম্ভ করল।

অনেকগুলো লাগল না, তবে চোখের আলো এদিক-ওদিক সরে গেল। তারপর একটা ঢিল লাগতেই ঘেউ করে একটা শব্দ হলো।

মোহন একটু নিশ্চিন্ত হলো। অন্য জন্তু নয়, কুকুর। কিন্তু বুনো কুকুর যদি হয়, তাহলে মোহন ছুটলেই তো তেড়ে এসে কামড়াতে পারে।

মোহন কিছুটা পথ আস্তে আস্তে হেঁটে পার হলো। তারপর আবার ছুটতে লাগল।

অনেকটা সময় কাটল। মোহনের মনে হলো, আর সে পারবে না, এবার সে মাঠের ওপর অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়বে। সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণা হাত-পায়ে, গাঁটে-গাঁটে। কপালটা কেটে গিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ে একটা চোখ প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়।

ঠিক এই সময়ে চোখে পড়ল, বেশ একটু দূরে কয়েকটা আলো জ্বলছে। তার মানে গ্রাম। কোনরকমে ওখানে পৌঁছতে পারলে একটা আশ্রয় মিলতে পারে। তবে ও গ্রামও খুব কাছে মনে হলো না।

মোহন একটু দম নিয়ে দ্বিগুণ বেগে ছুটতে লাগল। আলো লক্ষ্য করে।

কয়েক পা মাত্র গিয়েছে, এমন সময় চারিদিক কাঁপিয়ে শাঁখের শব্দ। এরকম বুক কাঁপানো শাঁখের শব্দ মোহন এর আগে আর শোনেনি। আওয়াজে বুকের ভিতরটা গুরগুর করে উঠল।

NOT FOR SALE

একটু পরেই এদিকে ওদিকে মানুষের হাঁক-ডাক। মশালের আলো জ্বলে উঠল। মোহন সামনের একটা গাছে উঠে পড়ল।

ওঠবার সময় হাত-পা আবার নতুন করে ছড়ল। বেশ ঝাঁকড়া গাছ। পাতার আড়ালে লুকোবার খুব সুবিধা।

মোহন দেখল, প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটা মশাল চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে। অন্ধকার আর নেই। দিনের আলোর মতন সব পরিষ্কার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মশালগুলো খুব কাছে এগিয়ে এল। কালো কালো ষণ্ডামার্কা লোক। মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। খালি পা। মশালগুলো উঁচুতে তুলে ধরে গাছের ওপরে পর্যন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

গাছের ডালে বসে মোহন থরথর করে কাঁপতে লাগল। এবার ধরা পড়লে এরা বোধহয় মশালের আগুনেই পুড়িয়ে মারবে।

মোহন যে গাছের ওপরে ছিল, তার তলায় তিনজন লোক এসে দাঁড়াল। তিনজনেই হাঁপাচ্ছে। ঘামে চকচক করছে তাদের গা।

একজন বলল, তাই তো শয়তানটা গেল কোথায়?

আরেকজন বলল, ঝোপে-ঝাড়ে নিশ্চয় কোথাও বসে আছে।

যাবে কোথায়? গাঁ এখান থেকে সাত ক্রোশ। তৃতীয়জন বলল, যেমন করে হোক খুঁজে বের করতেই হবে, নইলে সর্দার আমাদের কারো মাথা রাখবে না।

চল, ওদিকটা দেখি। এগুতে যাবার মুখেই একজন থেমে গেল। মশালটা আবার উঁচু করে বলল, ও রে, ওই পাতার আড়ালে দেখ, কি একটা নড়ছে!

বাকি দু'জন তাদের মশাল তুলে ধরল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো ওই তো।

মোহনের হাত-পা অবশ হয়ে গেল। তার মনে হলো পাকা ফলের মতন টুপ করে সে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়বে।

এই, ভালোয় ভালোয় নেমে আয় বলছি, না হলে গাছে আগুন ধরিয়ে দেবো। জ্যান্ত পুড়ে মরবি।

এরা না পারে এমন কাজ নেই। আস্তে আস্তে মোহন নেমে আসতে লাগল।

পুরোপুরি নীচে পর্যন্ত তাকে পৌঁছতে হলো না। যখন সে মাটি থেকে হাত পাঁচ-ছয় উঁচুতে, তখন একজন তাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনল। নামিয়েই প্রচণ্ড এক চড়।

NOT FOR SALE

লোকটা ধরে না থাকলে মোহন ঘুরে পড়েই যেত।

লোকটা বলল, খুব বেশি ওস্তাদ হয়ে গেছিস, না? আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা?

আরেকটা লোক বলল, উঃ, কম হয়রানি হয়েছে আমাদের!

আর একজন মোহনের চুলের মুঠি ধরে জোর টান দিল।

যন্ত্রণায় মোহন কঁকিয়ে উঠল।

যে লোকটা মোহনের হাত ধরেছিল, সে তাকে কাঁধে ফেলে দৌড়তে আরম্ভ করল।

মোহন কে যখন ওরা বন্দী করে নিয়ে আসছে, তখন অনেকে মেঘার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল।

একপাশে মেঘার বুড়ি মা হাঁউমাউ করে কাঁদছে। তার সামনে মেঘা।

মেঘার মা বলছিল, উঃ, কি সর্বনেশে ছেলে বাবা! আমি কাছে যেতেই আমার গলা টিপে ধরল। এত জোরে যে, আমি চোখে অন্ধকার দেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। সেই ফাঁকে ছেলেটা হাওয়া।

মেঘা ধমক দিয়ে উঠল, থাম থাম, আর কাঁদতে হবে না। ও যাবে কোথায়? লোকেরা ঠিক ওকে ধরে নিয়ে আসবে।

মেঘার মা কিন্তু থামল না। সে বলতে লাগল, তারপর ঘোর কাটতেই আমি উঠে শাঁখটা বাজিয়ে দিলাম।

মেঘার মাকে আর বলতে হলো না। সবাই চেঁচিয়ে উঠল, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে।

মেঘা বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। বলল, পাওয়া গেছে? কই, কোথায়?

কে একজন আঙুল দিয়ে দেখাল। ততক্ষণে মোহনকে নিয়ে সেই লোক তিনটে কাছে এসে নামিয়ে দিয়েছে।

মেঘার বুড়ি মা আবার হাত নেড়ে নেড়ে তার গলা টিপে ধরার মিথ্যা কাহিনীটা বর্ণনা করতে শুরু করল।

মেঘা তখন সোজা মোহনের সামনে গিয়ে হাজির হলো।

মোহন মাটিতে পড়ে আছে। তার ওঠবার ক্ষমতা নেই।

যাক, সর্দারের কাছে মুখরক্ষা হলো। আজই সর্দারের আসবার কথা।

NOT FOR SALE

শয়তানটাকে ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে রাখ। ওর শাস্তি সর্দারই দেবে। তোরা সব ভোরের দিকেই এখানে চলে আয়। খুব জরুরি কাজের জন্য সর্দার ডেকে পাঠিয়েছে। এখন অনেক রাত হয়েছে, একটু চোখ বুজে নিই।

হাই তুলে মেঘা নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। পিছন পিছন মেঘার মা।

নে ওঠ। সেই লোকটা মোহনকে টেনে দাঁড় করাল, চল।

মোহন চলতে গিয়ে বুঝতে পারল তার আর চলবার শক্তি নেই।

দুটো পা-ই ঠকঠক করে কাঁপছে। যন্ত্রণায় পা ফেলতে পারছে না। তবু সে কোনরকমে টলতে টলতে চলতে লাগল।

আবার সেই পুরনো ঘর পুরনো চাটাই। তার মধ্যে মোহনকে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালাবন্ধ হয়ে গেল।

হামাগুড়ি দিয়ে মোহন গিয়ে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে মা, মাগো—করুণ সুর বেরুল।

এতদিন পর নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল তার। পৃথিবীতে যার নিজের মা নেই, তার বুঝি কেউই নেই। সারা পৃথিবী তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আজ মোহনের নিজের মা বেঁচে থাকলে তাকে এই কষ্ট ভোগ করতে হতো না। বাড়ি থেকে পালাবারই কোন প্রশ্ন উঠত না।

সকালে সর্দার আসবে। তখন মোহনের শাস্তি হবে। এবার নিশ্চয় দারুণ শাস্তি হবে।

মেঘার মা ইনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে কেঁদে যে-সব মিথ্যা কথাগুলো বলছিল, সবই মোহনের কানে গিয়েছে। মোহন তার গলা টিপে ধরে তাকে নাকি অজ্ঞান করে ফেলে পালিয়েছিল। এ ধরনের ছেলেকে সর্দার অল্পে ছাড়বে এ রকম মনে হয় না।

যা হবার হবে, মোহন আর ভাবতে পারে না। দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে মোহন চোখ বুজল। ক্লান্ত দেহে ঘুম আসতে মোটেই দেরি হলো না।

মোহন অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে অন্ধকার ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে।

NOT FOR SALE

।। আট ।।

ঘটাং ঘট। জোর শব্দ করে দরজা খুলে গেল।

জন পাঁচ-ছয় কথা বলতে বলতে ভিতরে ঢুকল। মেঘা আছে, সঙ্গে একজন কালো বেঁটে চেহারার লোক, বোধহয় সেই লোকটাই সর্দার। ঘুম-চোখে মোহন তাদের দেখল।

ভোরের দিকে সে স্বপ্ন দেখছিল, তাকে সাপে কামড়েছে। আর বেঁচে নেই।

সেই সর্দার গোছের লোকটা বলল, আমরা যে সময় দিয়েছিলাম, সেটা তিন দিন হলো পার হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে ছেলেটার বাপের টাকা দেবার কোন ইচ্ছা নেই। সেই টিকটিকিটা বোধহয় বুঝিয়েছে যে, টাকা দেবার দরকার নেই। আমাদের শায়েস্তা করে দেবে। ব্যস, আর আমাদের অপেক্ষা করার দরকার নেই। সেই টিকটিকিটা আমাদের কম হয়রানি করেনি। দু'বার আমাদের আস্তানা বদল করিয়েছে।

সর্দার একটু থামতেই মেঘা বলল, শয়তান ছেলেটা কাল রাতে আমার মায়ের গলা টিপে অজ্ঞান করে দিয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু আমাদের হাত থেকে যাবে কোথায়? ধরে আনা হয়েছে।

সর্দার রক্তচক্ষু মেলে মোহনের দিকে একবার দেখল। তারপর বলল, হুঁ, একেবারে বিচ্ছু। ওখানেও একবার দারোয়ানের মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরে পালাবার চেষ্টা করেছিল। যাক, আর পালাতে হবে না।

আজই তাহলে সব ঠিক করে ফেলবে?

মেঘার কথার উত্তরে সর্দার বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর ফেলে রাখছি না। তুই সব ঠিক করে রাখ। দুপুরের দিকে আমরা কাজ শেষ করব।

বাইরে গোটা কয়েক কাক ডেকে উঠল। ভোর হয়ে আসছে।

এখানকার দলের আর সবাইকে জড়ো হতে বলেছিস?

হ্যাঁ সর্দার। সবাই আসবে।

ঠিক আছে। সর্দার বেরিয়ে যেতে গিয়েই হঠাৎ থেমে গেল।

জয় মা চণ্ডেশ্বরী, মা মা মা! বাইরে অদূরে বিকট কণ্ঠস্বর। আশপাশের গাছপালা পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠল।

NOT FOR SALE

সর্দার জিজ্ঞেস করল, ও কে?

কি জানি, বুঝতে পারছি না।

অদূরে ঝোপের ভিতর একটা ভাঙা মন্দির প্রায় ঢাকা অবস্থায় পড়ে আছে। ভিতরে শুধু একটা মূর্তি দেখা যায় কালীমূর্তিই হবে, তবে রংটা কালো নয়, হলুদ।

এ মন্দিরে অনেক দিন কেউ আসে না। সাপ-খোপের আস্তানা হয়েছে।

মূর্তির ঠিক সামনে লাল রংয়ের কাপড় পরা এক সন্ন্যাসী। মাথায় সাদা ধবধবে চুল জটার আকারে পিঠে নেমেছে। বুক পর্যন্ত বকের পালকের মতন সাদা দাড়ি। দুটো হাত কোলের ওপর। চোখ বোজা। মুখে অবিরাম ডাক—মা মা মা!

সর্দারকে নিয়ে মেঘা আর তার সঙ্গীরা একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

সর্দার প্রশ্ন করল, এ আবার কে?

মেঘা উত্তর দিল, কি জানি, আগে তো কোনদিন সাধু-সন্ন্যাসী এ মন্দিরে দেখিনি। বহুদিন এ মন্দির জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে।

বেশ জবরদস্ত সন্ন্যাসী। কিন্তু দেখলে ভক্তি হয়। চল, গিয়ে বসি।

সবাই এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের চাতালে বসল।

সর্দার টিপ করে প্রণাম করে বলল, পেন্নাম হই সাধু বাবা।

সন্ন্যাসী চোখ খুলল। মুখ ঘুরিয়ে এদের দিকে দেখে বলল, কল্যাণ হোক বাবা তোমাদের। কাজে জয়লাভ হোক। সব বাধা দূরে সরে যাক।

সর্দারের দেখাদেখি বাকি সবাই সোজা হয়ে শুয়ে প্রণাম করল।

একটা ভিক্ষে আছে বাবা! সর্দার হাত জোড় করে বলল।

কি বলো? আমি হিমালয়ে তপস্যা করছিলাম। হঠাৎ বাঘছাল কেঁপে উঠল। বার বার তিনবার। তখনই বুঝতে পারলাম কারো বিপদ হয়েছে। আমাকে নেমে আসতে হবে। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ এই মন্দির আমার খুব ভাল লাগল। চণ্ডেশ্বরীর মন্দির। বহু বছরের পুরনো, একেবারে জাগ্রত দেবী। কিন্তু অনেক দিনের অযত্নে মায়ের এই অবস্থা। এই চণ্ডেশ্বরী মায়ের পা ছুঁয়ে বিশে ডাকাত, নিমে ডাকাত রোজ ডাকাতি করতে যেত। তাদের গায়ে কোনদিন পুলিশের গুলি লাগত না।

NOT FOR SALE

সর্দার বলল, আপনি আমাদের জন্যও মায়ের পুজোর আয়োজন করুন বাবা। যা দরকার হয় এনে দেবো।

ঠিক আছে, আয়োজন করো। আমি বেলা দশটা থেকে পুজোয় বসব।

সবাই উঠে দাঁড়াল। সর্দারের কথামতো এক-একজন এক-এক দিকে ছুটল।

সন্ন্যাসী আসন ছাড়ল না। মাঝে মাঝে শুধু সিংহের মতো গর্জন করতে লাগল। মা চণ্ডেশ্বরী, এতদিন ঘুমিয়ে আছিস। এবার জাগ মা!

ন'টা বাজতে না বাজতে মন্দিরের চাতাল লোকে ভরে গেল। নানা রকমের ফল এল, ফুল এল, বেলপাতা। লোকেরা পুজোর ফল কাটতে বসল।

উঠোনে কুচকুচে কালো একটা ছাগলের বাচ্চা এনে বাঁধা হলো।

ওদিকে মোহন ঘরে একলা বন্দী। সবাই ব্যস্ত থাকায় তাকে খেতে দেবার কথা বোধহয় কারও মনে নেই। কিংবা তার শাস্তি হিসাবেই হয়তো খাওয়া বন্ধ। সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

বিষের জ্বালা তো আছেই, তাছাড়া সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠেছে। কাঁটাগাছগুলো বোধহয় বিষাক্ত ছিল। অনেক জায়গা পেকে উঠেছে।

মাঝে মাঝে কানে সন্ন্যাসীর হুঙ্কার আসছে। বাইরে অনেকগুলো লোকের গলার শব্দ, পায়ের আওয়াজ। কিন্তু দেখবার কোন উপায় নেই।

মোহন পায়চারি থামিয়ে আবার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল।

প্রায় দশটা নাগাদ সন্ন্যাসী ইশারায় সর্দারকে ডাকল।

সর্দার কাছেই ছিল, একেবারে সন্ন্যাসীর পাশে গিয়ে বসল।

সন্ন্যাসী বলল, তোকে একটা কথা তখন বলতে ভুলে গিয়েছি।

বলুন বাবা!

কথাটা একটু গোপনীয়।

আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

বলির জন্য তো ওই পাঁঠা এনেছিস?

হ্যাঁ বাবা। মায়ের পুজোয় কালো পাঁঠাই তো লাগে।

সে সব ঠিক আছে, কিন্তু মায়ের একটা আদেশ হয়েছে।

মায়ের আদেশ?

হ্যাঁ, ধ্যানে বসে সেই আদেশ পেলাম।

NOT FOR SALE

কি বলুন!

অনেকদিন মায়ের তেষ্টা মেটেনি। পাঁঠায় হবে না।

তাহলে কাল মোষ নিয়ে আসব।

উহুঁ। সন্ন্যাসী মাথা নাড়ল।

তবে?

মায়ের মানুষের রক্ত প্রয়োজন।

মানুষের রক্ত?

এবার সর্দার একটু পিছিয়ে গেল। মানুষ যোগাড় করার হাঙ্গামা অনেক। তাছাড়া হাতে তো বেশি সময়ও নেই।

আরো কথা আছে। সন্ন্যাসী আবার মাথাটা সর্দারের দিকে হেলিয়ে দিল। এমন ছোকরা যোগাড় করতে হবে যার বয়স পনেরোর বেশী নয়।

তার মানে, কচি ছেলে?

হ্যাঁ।

সর্দার বলল, আমার দলের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।

সর্দার নেমে এসে দলের মধ্যে দাঁড়াল। বাছা বাছা কয়েকজনকে কাছে ডাকল। সবাই চুপচাপ।

একজন বলল, এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলে যোগাড় করা মুশকিল।

ছেলে তো অনেক রয়েছে সর্দার, কিন্তু সব তো কানা, খোঁড়া কিংবা নুলো। মায়ের পুজোয় তো এসব লাগবে না।

উহুঁ, ওসব চলবে না। তা ছাড়া, এত অল্প সময়ে ওদের পাচ্ছিস কোথায়?

মেঘা কাছেই ছিল। সে এসে বলল, সর্দার, হয়ে গেছে।

সবাই চমকে উঠল।

সর্দার খিঁচিয়ে উঠল, কি আবার হয়ে গেল?

ছেলের খোঁজ মিলেছে।

মিলেছে? কোথায় পেলি?

কেন, ঘরের মধ্যে যে ছোকরা বন্দী রয়েছে!

সর্দার মেঘার পিঠে একটা হাত রেখে বলল, সাবাস মেঘা, কথাটা আমার একেবারেই মনে ছিল না। ও আপদ খতম হয়ে যাওয়াই ভাল। আমাদের অনেক ভুগিয়েছে। দাঁড়া, বাবাকে বলে আসি।

NOT FOR SALE

সর্দার সন্ন্যাসীর কাছে ফিরে এসে বলল, বাবা, পাওয়া গেছে।

আনন্দে সন্ন্যাসী উৎফুল্ল হয়ে উঠল, সবই মায়ের ইচ্ছা। কোথায় পাওয়া গেল?

কাছেপিঠেই ছিল।

অক্ষত দেহ তো? কানা-খোঁড়া নয়?

আজ্ঞে না।

জয় মা চণ্ডেশ্বরী। মা মা মা! সন্ন্যাসী লম্বা হয়ে শুয়ে প্রণাম করল। দেখাদেখি আর সবাই।

এবার যে একটা কাজ করতে হবে! সন্ন্যাসী আবার সর্দারের দিকে ফিরল।

বলুন বাবা!

ছেলেটাকে স্নান করিয়ে নিয়ে আয় এখানে।

সর্দার মেঘাকে আদেশ দিল।

মিনিট কুড়ির মধ্যে মেঘা মোহনকে পানাপুকুরে চুবিয়ে নিয়ে এল। মোহন শীতে নয়, ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

সন্ন্যাসী আড়চোখে একবার মোহনের দিকে দেখে বলল, ওরে এটাকে মুছিয়ে দে। এসব খুলে একটা কাপড় পরিয়ে নিয়ে আয়।

মেঘা মোহনকে মুছিয়ে একটা ধুতি পরিয়ে নিয়ে এল।

বসিয়ে দে আমার পাশে।

মোহনকে সন্ন্যাসীর পাশে বসানো হলো। আর একপাশে সর্দার। মোহনের আশেপাশে সবাই ঘিরে বসল। অবশ্য এত লোকের মাঝখান দিয়ে পালানো সম্ভব নয়, তবু সাবধানের মার নেই।

মোহনের কপালে সন্ন্যাসী সিঁদুরের টিপ দিল। গলায় জবাফুলের মালা।

সব কালীপূজা রাত্রে হয়, চণ্ডেশ্বরী পূজা হয় দিনে। তাই বুঝি দেবীর গায়ের রং কালো নয়।

স্নান করিয়ে নিয়ে আসবার সময় মোহন উঠানে হাড়িকাঠ দেখতে পেয়েছিল।

সামনে দেবীমূর্তি। সন্ন্যাসী পূজা করছে। তাকে এভাবে স্নান করিয়ে আনা হলো, এসবের মানে বুঝতে তার একটুও দেরি হলো না। আর নিস্তার নেই। আজই সব শেষ। মোহন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

NOT FOR SALE

সর্দার ধমক দিল, চুপ কর। পুজোর সময় যত ঝামেলা বাধাচ্ছে।

সন্ন্যাসী বাধা দিয়ে বলল, আরে কাঁদুক কাঁদুক, এই তো শেষ কান্না। কেঁদে নিক।

দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পুজো আরম্ভ হলো। সন্ন্যাসী আসনের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ পর মূর্তির দিকে জবাফুল ছুঁড়ে দিল। তারপর আসনে বসে মোহনকে জিজ্ঞেস করল, কি রে, কি নাম তোর?

মোহন তখনো ফোঁপাচ্ছে। সন্ন্যাসী চেঁচিয়ে উঠল, কান্না থামা। নাম কি বল?

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মোহন বলল, মোহন সরকার।

বাপের নাম?

অভয় সরকার।

কত বয়স?

তের।

ঠিক আছে।

আবার মন্ত্র পড়া শুরু হলো।

সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, তাহলে বলিটা সেরে ফেলা যাক।

সর্দার এগিয়ে মোহনের কাছে এসে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসী বলল, দাঁড়া, আগে ওকে পিছমোড়া করে বাঁধ।

একজন ছুটে গিয়ে জঙ্গল থেকে শক্ত লতা নিয়ে এসে মোহনের দুটো হাত বাঁধল।

মোহনের আর কাঁদবারও শক্তি নেই যেন। তার সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘটিতে জল নিয়ে সন্ন্যাসী হাড়িকাঠের কাছে নেমে এল।

হাড়িকাঠের ওপর জলের ফোঁটা ছিটিয়ে আবার মন্ত্রপাঠ শুরু হলো।

হাড়িকাঠের কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে চকচকে প্রকাণ্ড খাঁড়া।

ওরে, কেউ এটাকে বেলগাছটার সঙ্গে বাঁধ। বহু দিন বলি হয়নি, আগে হাড়িকাঠটা শোধন করে নিই। তোরা সব এগিয়ে আয়।

আশপাশের সবাই হাড়িকাঠ ঘিরে গোল হয়ে বসল।

NOT FOR SALE

সন্ন্যাসী একবার চারদিকে চেয়ে দেখল। তারপর হাতের ঘটিটা হাড়িকাঠের পাশে নামিয়ে রেখে সূর্যের দিকে চোখ তুলে প্রণাম করল। প্রণাম শেষ হতে চাদরের ভিতর থেকে একটা বিউগল বের করল। সূর্যের দিকে মুখ তুলে বিউগলে ফুঁ দিল। ঠিক যুদ্ধের সময় যেমন বাজনা হয়, সেই রকম। বিউগলের শব্দে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তালে তালে সবাই দুলতে লাগল।

উৎসব-আনন্দে সকলে এত মেতে আছে যে ধুলো উড়িয়ে দূর থেকে বিদ্যুৎগতিতে যে কয়েকটা জীপ আসছে, সেটা কারো খেয়ালই নেই।

খেয়াল যখন হলো, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সমস্ত দলটাকে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। তাদের হাতে পিস্তল আর বন্দুক। সন্ন্যাসীর হাতেও একটা পিস্তল দেখা গেল। পালাবার কোন পথই নেই।

খাঁড়া হাতে লোকটা পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বন্দুকের গুলি এসে তার কবজিতে লাগতেই সে চীৎকার করে মাটিতে বসে পড়েছিল।

সন্ন্যাসী পরিধানের লাল কাপড় সরিয়ে ফেলল। খুলে ফেলল চুল দাড়ি আর রুদ্রাক্ষের মালার গোছা। এবার পারিজাত বক্সিকে পরিষ্কার চেনা গেল।

একটা জীপ থেকে মোহনের বাবা নেমে এল। ততক্ষণে একজন পুলিশ মোহনের লতার বাঁধন খুলে দিয়েছে।

মোহন, আমার মোহন রে! ইস্, এ কি চেহারা হয়েছে রে তোর? মোহনের বাবা ছেলেকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরল।

মোহনও কেঁদে উঠল, বাবা, বাবা! আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর কোনদিন আমি এমন করে পালাব না।

তারপর ঐ ছেলেধরা দলটার কি শাস্তি হলো, অন্যান্য কানা খোঁড়া আর নুলো ছেলেদের উদ্ধার করে কিভাবে আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটা তো তোমরা খবরের কাগজেই পড়েছ।

———

NOT FOR SALE

বিড়াল বিড়ম্বিত

একটু আগে থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। পাশবালিশ জড়িয়ে এপাশ আর ওপাশ করছি।

বেশ গরম পড়ে গিয়েছে। আমি আবার গরম একটুও সহ্য করতে পারি না। মাথার ওপর বনবন করে পাখা ঘুরছে, তাও কপালে, গলায় বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা।

পাশে ত্রিলোচন অকাতরে ঘুমাচ্ছে। নাক নয়, যেন সানাই। বিচিত্র সব শব্দ বের হচ্ছে।

হঠাৎ ত্রিলোচন ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল। বলল, ওই আবার।

আমি লজ্জা পেলাম। বললাম, না ভাই ত্রিলোচন, সে সব কিছু নয়। আমি পাশ ফিরছিলাম, তাই খাটটা দুলে উঠল।

ত্রিলোচন সপ্তাহ তিনেক গৌহাটি থেকে ফিরেছে। দারুণ ভূমিকম্পের পর। একরাত্রে ষোলবার গৌহাটির মাটি কেঁপে উঠেছিল। লোকজন বাড়ির মধ্য থেকে সবাই মাঠে রাস্তায় এসে জড় হয়েছিল।

তারপর থেকে ত্রিলোচনের কেবল ভয়, এই বুঝি বাড়িঘর দুলছে। কথা বলতে বলতে চমকে ওঠে। ঘুমাতে ঘুমাতে বিছানায় উঠে বসে।

বলে, ওই আবার।

এইবার কিন্তু ত্রিলোচন অন্য কথা বলল।

না, না ভূমিকম্পের কথা বলছি না।

তবে?

বেড়াল, বেড়াল, রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ শুনছ না?

আমি অবশ্য শুনিনি। তবে বাড়িতে বেড়াল আছে, তা জানি। একটা দুটো নয়, গোটা পাঁচেক। রেশন কার্ড নেই, তাও তাগড়া চেহারা। তাড়া করলে পালায় না, ল্যাজ শক্ত করে গোঁফ ফুলিয়ে ফিরে দাঁড়ায়। মুখে বলে, ম্যাঁও। আমাদের বাড়ি থাকে বটে, কিন্তু একটা বেড়ালও আমাদের নয়। সব আমদানি হয়েছে পাশের খাটাল থেকে। দুধ খেয়ে খেয়ে বোধহয় মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে,

NOT FOR SALE

তাই মুখ বদলাতে এ বাড়িতে ঢুকেছে। মাছ-মাংস তো খায়ই, কিন্তু বেড়ালে কাঁচা আনাজপত্র খায় জানা ছিল না।

ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে আলু কামড়ায়, কপি চিবোয়, শাকসবজি বাকি রাখে না।

শুধু কি তাই। ভোরবেলা খবরের কাগজ দিয়ে যায়। বারান্দায় পড়ে থাকে। নীচে নেমে পড়তে গিয়ে দেখি একটা বেড়াল সম্পাদকীয় চিবিয়ে শেষ করেছে, আর একটা সিনেমার পাতার ওপর আয়েস করে শুয়ে আছে।

একদিন ত্রিলোচন বলল, দাদা বেড়াল বিদেয় কর, নয়তো আমাকে অনুমতি দাও আমি আসামে ফিরে যাই । এর চেয়ে আমার ভূমিকম্পে মরাও ভাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, কি হল কি?

কি হল না তা বল?

ত্রিলোচন তার নতুন কেনা টেরিলিন শার্টটা তুলে দেখাল।

একটা হাতা নেই। একদিকের কলারের অর্ধেকটা চিবানো। বিস্মিত হলাম, সে কি, বেড়ালে এই করেছে?

তোমার কি ধারণা আমি ভাতের সঙ্গে খেয়েছি!

আর কিছু বললাম না। মনে মনে ঠিক করলাম, আর নয়। এবার যেরকম করে হোক বেড়ালগুলো তাড়াতেই হবে। এর আগে যে চেষ্টা করিনি, এমন নয়। বহু কষ্টে মাছের লোভ দেখিয়ে পালের গোদা বেড়ালটাকে ধামা চাপা দিয়েছিলাম, তারপর ধামা থেকে থলিতে বদলি। মোড়ের পার্কে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম।

তারপর বাড়ি ফিরে দেখলাম বেড়ালটা আমার আগেই ফিরে এসেছে। ঠিক সিঁড়ির মুখে বসে জিভ দিয়ে গোঁফ চাটছে। আমাকে দেখে একটা চোখ বন্ধ করে বিশ্রীভাবে বলল, ম্যাঁও।

স্বরটা শুনে আমার যেন মনে হল, কেমন জব্দ।

মুশকিলে পড়ে গেলাম।

ইঁদুর তাড়াবার জন্য ভিটেয় বেড়াল পোষা যায়। কিন্তু বেড়াল তাড়াবে কোন জন্তু?

ত্রিলোচন বলল, এক কাজ করতে পার। ভাল একটা কুকুর পোষ। বেশ বদরাগী কুকুর।

NOT FOR SALE

কথাটা মনে লাগল। এধারে-ওধারে কুকুরের খোঁজ করতে লাগলাম।

ত্রিলোচন আর একটা কথাও বলে দিয়েছিল। দেশী কুকুর এনো না, ওদের বিশ্বাস নেই। বেড়ালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হয়তো সহ-অবস্থান করবে। তোমার বিপদ কমবে না, অথচ খরচ বাড়বে। একেবারে খাস বিলিতি কুকুর খোঁজো।

পার্কসার্কাসের ওদিকে কুকুরের দোকানের একজন খবর আনল। ত্রিলোচনকে সঙ্গে নিয়ে একদিন গিয়ে হাজির হলাম।

দরদস্তুর করতে করতে মাথায় হাত চাপড়ালাম। যত ছোট কুকুর তার দাম তত বেশি। একেবারে বড় সাইজের দাম যদি দুশো টাকা, ছোট্ট তুলোর একটা পুঁটুলি, হাতের চেটোর সাইজ, দর হাঁকল, ছশো টাকা।

ত্রিলোচন জামার আস্তিন ধরে টান দিল। চলে এস দাদা, ব্যাপার মোটেই সুবিধার নয়। কিছু না কিনলেও হয়তো পয়সা দিতে হবে।

দুজনে পালিয়ে বাঁচলাম।

যাক, দিন তিনেকের মধ্যে একটা ব্যবস্থা হল। খবরের কাগজে দেখলাম, এক ধনী ভদ্রলোক বিদেশে চলে যাচ্ছেন, তাঁর একটা বুলডগ কুকুর কোন কুকুরপ্রেমীকে দান করে দিয়ে যেতে চান।

এমন সুযোগ আর আসবে না।

খিদিরপুরের ঠিকানা ছিল। খুঁজে খুঁজে ফটকে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আসবার কারণ শুনে দারোয়ান সাবধান করে দিল। ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার কথা সব বাজে। দেশ মাদ্রাজে, হয়তো সেখানেই যাবেন। ওটা কুকুর নয় বাবু, শয়তান। একমাস হল ভদ্রলোকের এক বন্ধু চা বাগানের ম্যানেজার কুকুরটা দিয়েছে, এর মধ্যে ভদ্রলোকের ছেলেকে কামড়েছে, গিন্নীমাকে, আর্দালীকে, ড্রাইভারকে। কাল মালীকে এমন তাড়া করেছিল বেচারী বারান্দা থেকে প্রাণের ভয়ে লাফিয়ে পড়ে, গোটা চারেক দাঁত ভেঙেছে। কুকুরের নয়, নিজের। আমি ছুটির দরখাস্ত করেছি, কুকুর না গেলে আমি ফিরব না।

আমি একটু দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়লাম, তবে?

ত্রিলোচন কিন্তু পূর্ণমাত্রায় উল্লসিত।

বলল, এই রকম কুকুরই তো আমাদের দরকার। আমাদের বউ নেই, ছেলেপুলেও নেই। শুধু আমরা দুজন। শোবার ঘরে দুজনে খিল দি

NOT FOR SALE

আর কুকুরটা খোলা থাকবে নীচেয়। ব্যস, আর দেখতে হবে না। এক একটা বেড়ালের টুঁটি টিপে ধরবে আর আছড়ে মারবে।

ত্রিলোচন মুখ-চোখের এমন ভাব করল, যেন এই আছড়ানোর দৃশ্য সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে এবং উপভোগ করছে। কুকুরটা দেখলাম। মোটা চেন দিয়ে থামের সঙ্গে বাঁধা ছিল। রক্তাক্ত দু'টি চোখ, থ্যাবড়া মুখ, নাকের বালাই নেই। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা ঝুলে পড়েছে।

আমাদের দেখে এমন একটা বিকট চিৎকার করল যে ত্রিলোচন তীর বেগে ভদ্রলোকের পিছনে আশ্রয় নিল।

আমি কদিন টনসিলে কষ্ট পাচ্ছিলাম। আওয়াজে শিউড়ে উঠতেই মনে হল টনসিল দুটো স্থানচ্যুত হয়ে গলা দিয়ে পেটের মধ্যে পড়ে গেল।

ভদ্রলোক মহানুভব। কুকুর দিলেন, চেন দিলেন, নিয়ে যাবার জন্য নিজের মোটর দিলেন। কুকুরটাকে সিটে বসালাম না, তাহলে আমাদের আর পাশে বসে যেতে হত না। সাহেবই বলল, কুকুরটাকে পিছনের লাগেজ কেরিয়ারে ঢুকিয়ে নিতে।

তাই হল। কুকুরটাকে তো বাড়ি নিয়ে আসা হল। এখন সমস্যা হল, তাকে নামানো। যে কাছে যায়, তার দিকে রক্তাভ চোখ মেলে যেভাবে চাপা গর্জন করে তার আর এগোবার সাহস হয় না। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়।

ঠাকুর, দুই জোয়ান চাকর, জাঁদরেল ঝি সবাই পিছিয়ে গেল। মতলব বাতলাল ভদ্রলোকের ড্রাইভার।

বলল, আপনাদের বাড়িতে ঘুমের বড়ি আছে? আমাদের খিদিরপুরে গিন্নীমার কাছে ছিল। গিন্নীমা কর্তাবাবুর কাছ থেকে একবার পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিলেন। কর্তাবাবু বলে হয়রান। ফেরত দেবার আর নাম নেই। রাত্রে শুতে এসে বাবু তাগাদা করতেন বলে গিন্নীমা বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তেন। বাবুর কোন কথা কানে যেত না। দুধের সঙ্গে সেই বড়ি খাইয়ে দিলেই টাইগার ঘুমিয়ে পড়বে। তখন পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাওয়া যাবে।

মনে পড়ে গেল। সহজে ঘুম হয় না বলে এক শিশি বড়ি কিনেছিলাম। কিন্তু সাহস করে খেতে আর পারিনি। কি জানি যদি মাত্রা বেশি হয়ে যায়। তাহলেই আর ইহলোকে চোখ খোলার অবকাশ পাব না।

শিশি নিয়ে এসে বললাম, দুধের মধ্যে একটা বড়ি দিই?

NOT FOR SALE

ড্রাইভার হাসল, খাস বিলিতি কুকুর বাবু, একটা বড়িতে কখনও ওদের চোখ বোজানো যায়? গোটা তিনেক দিন। তাই দিলাম। চুকচুক করে টাইগার দুধটা খেল, তারপর থাবার ওপর মুখ রেখে নিঝুম হয়ে পড়ল।

নিন বাবু, এইবার তুলে নিয়ে যান।

কুকুরটার অবস্থা দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু ওই বাঘা কুকুরকে কোলে তুলে নিতে সাহস হল না। কি জানি কপট নিদ্রার কৌশল তো শুধু শ্রীকৃষ্ণের একচেটিয়া নয়।

তাই ড্রাইভারকে বললাম, তোমাকে চেনে, তুমিই তুলে বাড়ির মধ্যে দিয়ে যাও না।

ড্রাইভার হাসল, আর চেনাচেনি কি বাবু! ওর কি আর সে শক্তি আছে। জ্ঞানই নেই তো—আত্মীয় পর চিনবে কি করে? আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। এখনই আবার গিন্নীমাকে নিয়ে বের হতে হবে।

ড্রাইভার উঠে নিজের আসনে বসে পড়ল চালনচক্রে হাত রেখে। অগত্যা নিরুপায় হয়ে আমি আর ত্রিলোচন কুকুরটাকে বয়ে দুতলার বারান্দায় রাখলাম। ঈশ্বর জানেন ঘুমের বড়িগুলো ভেজাল কি না। বারান্দায় শোয়াতেই মিট মিট করে চেয়ে দেখল।

তাড়াতাড়ি চেনটা বেঁধে লাফিয়ে সরে এলাম দুজনে।

ত্রিলোচন বলল, ব্যাস দাদা, বেড়ালের অত্যাচারের হাত থেকে নিশ্চিন্ত।

দিন তিনেক বেড়ালগুলো ধারে কাছে ঘেঁষল না। চৌকাঠের ওপারে বসে জটলা করতে লাগল। কিন্তু তিন দিনে আমাদের অবস্থা কাহিল।

রেশনের চাল, আটা খতম। মাংস, মাছ চেটেপুটে নিঃশেষ করল। পাত খালি হলেই বিকট গর্জন।

ত্রিলোচনকে বললাম, ভাই, বেড়ালকে তাড়াতে গিয়ে আমাদের যে পথে বসতে হবে। সারাটা সপ্তাহ খাব কি?

ত্রিলোচন অভয় দিল, একটা সপ্তাহ না হয় উপোসই দিলাম দাদা, তবু তো বেড়ালগুলো শায়েস্তা হবে। চতুর্থ দিন আমি আর ত্রিলোচন বারান্দায় বসেছিলাম। পেটে ভাত নেই, বিকালের ফুরফুরে হাওয়া, তাই সেবন করেই পেট ভরাচ্ছি।

হঠাৎ একটা আর্ত কণ্ঠ।

NOT FOR SALE

দুজনেই দাঁড়িয়ে উঠলাম, তারপর যা দেখলাম তাতে আমার মাথার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে উঠল। ত্রিলোচনের মাথায় চুলের বালাই নেই। মসৃণ টাক। সে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

টাইগার তীরবেগে রাস্তা দিয়ে ছুটছে। গলায় ছেঁড়া চেন, আর তাকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে গোটা আটেক বেড়াল। বাড়িতে পাঁচটা ছিল, তাই জানতাম, কিন্তু বাড়তি তিনটে বোধহয় কোথা থেকে ভাড়া করে এনেছে। কুকুর তাড়াবার জন্য।

এমন দৃশ্য মানুষের জীবনে একবারই দেখবার সুযোগ হয়। চেয়ারে বসে পড়ে দুজনে দেখলাম, একটু পড়েই বীর বিক্রমে আটটি বেড়াল ফিরে আসছে। টাইগার ধারে কাছে কোথাও নেই। যথারীতি আবার বেড়ালের উপদ্রব শুরু হল। তরিতরকারি, কাগজপত্র, কাঁচের জিনিসপত্র সব গেল।

এই সময় পাড়ার এক অধ্যাপকের কাছে দুঃখের কথা জানাতে, তিনি সদুপদেশ দিলেন। ভদ্রলোক মনস্তাত্ত্বিক। প্রাণীদের আচার-আচরণ সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞ।

তিনি বললেন, কিছু নয়, ওদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করতে হবে।

ত্রিলোচন সভয়ে বলল, কারা করবে?

কেন আপনারা, নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে যান কেন? একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়, আমরা তো সেই বংশেরই সন্তান।

আমি ঢোঁক গিললাম, আটটা বেড়াল, লঙ্কা জয়ের চেয়ে খুব সোজা ব্যাপার মনে করছেন?

শুনুন কোন রকমে পালের গোদাটাকে বস্তাবন্দী করুন।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, সে চেষ্টা একবার হয়ে গেছে। মোড়ের পার্কে ছেড়ে দিয়েছিলাম—

অধ্যাপক অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লেন, না না, ওভাবে হবে না! ওদের মগজের মধ্যে ওলোট-পালোট করে দিতে হবে। স্মৃতিশক্তি যাতে নষ্ট হয় তাই করতে হবে আগে।

কি রকম।

বস্তাবন্দী করে প্রথমে নাগরদোলায় চড়ান, খুব ঘুরপাক খাক, তারপর ট্যাক্সিতে উঠিয়ে এলোমেলোভাবে ঘুড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিন।

NOT FOR SALE

পালের গোদার অভাব বাকি বেড়াল কটা টের পেলেই দেখবেন ওরা ভয় পেয়ে যাবে। ওদের মনোবল যাবে ভেঙে। আহারে রুচি কমে যাবে। সংসার ভাল লাগবে না। একটা দুটো করে কাছাকাছি জঙ্গলে চলে যাবে।

ত্রিলোচন বলল, বেশ, কাজটা আর এমন কি শক্ত। তাই করা যাক।

আমি তবু সন্দেহ করলাম, কিন্তু গোদাটাকে ধরা কি সোজা কথা?

দেখাই যাক না।

দিন সাতেকের মধ্যে ত্রিলোচন অসাধ্য সাধন করল। বাগবাজার থেকে বাদামপেস্তা দেওয়া ক্ষীর এনে রান্নাঘরে রাখল। একটা ঝুড়ি পাশে কাত করে তাতে দড়ি বাঁধা। বেড়াল ক্ষীর খেতে এলেই দড়ি ধরে টান, আর ঝুড়ির তলায় বেড়াল চাপা পড়বে।

ঠিক তাই হল। তবে একসঙ্গে দুটো বেড়াল চাপা পড়ল। গোদাটা আর একটা বাচ্চা। বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে গোদাটাকে থলিতে বন্ধ করা হল। অবশ্য ত্রিলোচন দু হাতে বক্সিং গ্লাভস্ পরে নিয়েছিল। পাছে আঁচড় লাগে। আমাদের ভাগ্য ভাল। সেই সময় রাসের মেলাও আরম্ভ হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক তাকে নাগরদোলায় ঘোরানো হল। বেড়ালের মগজের কি হল জানি না, তবে ত্রিলোচন বার তিনেক হড়হড় করে বমি করল।

তারপর ট্যাক্সি ডেকে দু ভাই দু পাশে, মাঝখানে থলে, আমাদের যাত্রা শুরু হল।

ঠিক করে নিয়েছিলাম যে বেড়ালটাকে ময়দানে ছেড়ে দেব, যাতে আর লোকালয়ে প্রবেশ করতে না পারে। তাই প্রথমে গেলাম টালা, সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বর, ট্যাক্সি ঘুরিয়ে বেহালা হয়ে চলে এলাম শিবানীপুর, আমতা, ফলতার গঙ্গা ধার, তারপর আবার টালিগঞ্জ, সেখান থেকে গড়ের মাঠ।

মাঝপথে ত্রিলোচনের কি মনে হল, সে বলল, দাদা এক কাজ করলে হয়।

কি?

হাজার হোক কৃষ্ণের জীব, এভাবে মাঠে ময়দানে ছেড়ে দিলে কিছু হয়ে গেলে আমাদের পাপ স্পর্শ করবে।

কিন্তু লোকের বাড়ির দরজায় ছাড়াটা কি সমীচীন হবে?

না, না তা বলছি না। ময়দানেই ছাড়ব, তবে কোন হোটেলের উল্টো দিকে। যাতে পরে হেঁটে হেঁটে হোটেলে গিয়ে উঠতে পারে তা হলে আর অনাহারে মরবে না।

NOT FOR SALE

বেশ তোমার ইচ্ছা।

তাই ঠিক হল। গ্র্যান্ড হোটেলের উলটো দিকে ময়দানের পাশে ট্যাক্সি থামল।

আসল ব্যাপারটা ড্রাইভারের জানা ছিল না। উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

সব শুনে চেঁচিয়ে উঠল, এর জন্য এত ঝামেলা। সোজা গঙ্গামায়ীর কোলে বিসর্জন দিয়ে দিন। আপনারাও বাঁচবেন, বেড়ালের আত্মারও সদগতি হয়ে যাবে।

ত্রিলোচন কানে আঙুল দিল, ছিঃ ছিঃ, সর্দারজী, ওতে পাপ হবে। ময়দানে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। ফাঁকা হাওয়া খাবে, বিনা পয়সায় ফুটবল খেলা দেখবে, ক্রিকেটের শখ থাকে তাও দেখতে পারে।

ড্রাইভার কোন কথা বলল না। নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

আমি বস্তাটা ধরে নামালাম। ত্রিলোচন পিছনে।

এক জায়গায় গাছের নীচে এক সন্ন্যাসী বসেছিলেন, নিমীলিত নেত্র। বিচিত্র রঙের আলখাল্লা। পাশে একটা গোপীযন্ত্র। ভাবলাম এই সন্ন্যাসীর কাছাকাছি বেড়ালটাকে ছেড়ে দিই। পরের জিনিস খেয়ে, পরের জামাকাপড় নষ্ট করে জীবনে অনেক পাপ করেছে, তবু সাধুর সান্নিধ্যে তাঁর অমিয় বচনের কিছুটা কানে গেলে ও উদ্ধার হয়ে যাবে।

সবে থলির মুখ খুলতে গিয়েছি, পিছনে বজ্রকণ্ঠ। হিন্দিতে।

কি ওতে?

চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম সন্ন্যাসী কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে দেখছেন।

ত্রিলোচন বলল, প্রভু, মার্জার।

কেয়া? এবার বজ্রকণ্ঠ আরও জোর।

আমি বললাম, আজ্ঞে বিল্লী।

আমার কথার সমর্থন করেই থলির মধ্য থেকে শব্দ হল, ম্যাঁও।

সন্ন্যাসী ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

বিপদ। আমি আর ত্রিলোচন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। বেড়ালের অত্যাচারের কাহিনী। আমাদের দুরবস্থা।

গোপীযন্ত্র দেখেছিলাম, ত্রিশূলটা লক্ষ্য করিনি। সেই নিয়ে সন্ন্যাসী তেড়ে উঠলেন।

NOT FOR SALE

ভাগো হিঁয়াসে। এখানে বিল্লী ছাড়তে এসেছ। আফিংয়ের জন্য একটু দুধ নিই, ঈশ্বরের উপাসনা করব না দুধ সামলাব? যাও যাও, অন্য কোথাও যাও।

সন্ন্যাসীর চেহারা দেখে থলি বগলে করে দুজনে ছুটে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। ট্যাক্সি আরো খানিকটা এগিয়ে গেল।

ত্রিলোচন বলল, বেড়ালটারই বরাত দাদা। কোথায় গ্র্যান্ড হোটেলের আওতায় থাকত, ভালমন্দ খেত, তা আর হল না। আমরা আর কি করব।

একটা বিরাট নালা, তার পাশে ঢালু জমি। কি একটা ক্লাবের তাঁবু। থলির ভেতর বেড়ালটা তর্জন গর্জন করছে, তাই আর সাহস করে তাকে আমাদের পাশে রাখিনি, লাগেজ-কেরিয়ারে পুরেছিলাম।

ট্যাক্সি থামিয়ে থলেটা বের করলাম। তারপর দুজনে এগিয়ে গেলাম নালার পাশে।

ও, আপনারাই রোজ এ কাজ করেন?

চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, ঢালু জমিতে একটা দারোয়ান শুয়েছিল। সে আস্তে আস্তে উঠে বসল।

আমরা? রোজ?

হ্যাঁ, আজ ধরে ফেলেছি বলে বোকা সাজছেন। রোজ রোজ এখানে আবর্জনা ফেলে যান। গন্ধে ক্লাবের বাবুরা টিকতে পারে না।

আবর্জনা কেন হবে, ত্রিলোচন চেঁচিয়ে বলল, বেড়াল, বেড়াল ছাড়ছি আমরা।

বেড়াল ছাড়ছেন? লোকটা দুটো চোখ প্রায় কপালে তুলল, তার মানে ক্লাবে বেড়াল ছাড়ছেন কি? বছরে চাঁদা কত জানেন? একশ কুড়ি টাকা। ঢোকবার ফি পঞ্চাশ।

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বেড়ালটা ক্লাবের সদস্য হতে চায় না দারোয়ানজী, শুধু এইখানে থাকবে, ঘোরাঘুরি করবে।

বা, বেশ চমৎকার কথা বলছেন তো? ক্লাবের তাঁবুতে থাকবে, লনে বেড়াবে, দরকার হলে মেম্বারদের চেয়ারে বসবে, সব বিনা চাঁদায়? ফিস্টের সময়ও এসে ভাগ বসাবে, একেবারে বিনামূল্যে?

ত্রিলোচন ক্ষেপে গেল। বস্তা কাঁধে ফেলে বলল, এত কথার দরকার কি দাদা। ময়দানে কি জায়গার অভাব! চল অন্য কোথাও ছেড়ে দিই।

NOT FOR SALE

বেড়াল নিয়ে আবার ফিরে এলাম। আমরা সিটে, বেড়াল লাগেজ-কেরিয়ারে। ট্যাক্সি এগিয়ে চলল।

এবার এমন জায়গায় থামলাম যেখানে কাছাকাছি কোন তাঁবু নেই। কেবল ঘাসে ডাকা মাঠ।

ত্রিলোচন বলল, দাদা, বেড়াল ছাড়ার আদর্শ জায়গা। কেউ কোন আপত্তি করবে না।

এবার নির্বিবাদে থলির মুখ খুলে বেড়ালটা ছেড়ে দিলাম। ভেবেছিলাম মুক্ত হয়ে বেড়ালটা ছুটে পালিয়ে যাবে, কিন্তু তা করল না। গুঁড়ি মেরে চুপ করে বসে রইল।

বা, এ তো বেশ ভাল জাতের মশাই। চমৎকার গড়ন। এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক পদচারণা করছিলেন। ব্যাপারটা দেখে তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বেড়ালটার গড়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু এই দিব্য গড়নের মূলে আমাদের সর্বনাশের মাত্রা কতখানি সেটা আর ভদ্রলোককে বোঝাবার চেষ্টা করলাম না। তিনি নীচু হয়ে বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিলেন, আর অবাক কাণ্ড, বেড়ালটা মড়ার মত চোখ বুজে পড়ে রইল। হাত দিয়ে গলায় সুড়সুড়ি দিলেন। বেড়ালটা ঘড় ঘড় শব্দ তুলে সেবা উপভোগ করতে লাগল। এমন বড়িয়া চিজ বিশেষ দেখা যায় না। পারসিয়ার বিল্লীই হবে বোধহয়। একে কি ময়দানে হাওয়া খাওয়াতে এনেছেন?

সত্যি কথাটাই বললাম।

আপদ বিদেয় করতে এসেছি। ময়দানে ছেড়ে দিয়ে যাব।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না, তারপর অতি কষ্টে একসময়ে উচ্চারণ করলেন, মানুষ বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আপনারা সেই মানুষ?

কথাটা যথেষ্ট অপমানজনক। আমাদের দুজনকে দেখে শিম্পাজি ভাবার কোন সম্ভাবনা নেই। বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের উদাহরণ হয়তো আমরা নয়, কিন্তু দেখলে মানুষ বলে বোঝা যায়।

তাই রেগে বললাম, কি চান আপনি? আমরা মানুষ নই তো কি?

ভদ্রোলোক দুটি চোখ নিমীলিত করে মধুর ভঙ্গিতে হাসলেন। দুটো হাত, দুটো পা আর এদিকে ওদিকে নাক-মুখ থাকলেই কি মানুষ হয়? মানুষের হৃদয় কোথায় আপনাদের? দিল?

NOT FOR SALE

ত্রিলোচন বুকে হাত দিয়ে বলল, কেন? এই তো ধুকধুক করছে। আপনার হাড়-জ্বালানো কথা শুনে তার গতি বেড়ে গেছে।

মারোয়াড়ী হাত নাড়লেন, না না, ও শব্দ তো জানোয়ারের বুকে হাত রাখলেও পাওয়া যায়। মানুষের দয়া, মায়া, মমতা এসব আছে আপনাদের? থাকলে এই অবলা জীবকে এভাবে নির্বাসন দিতে পারতেন না। মা জানকীকে নির্বাসন দিয়ে রামজীর কি হাল হয়েছিল, রামায়ণে পড়েছেন নিশ্চয়।

আমরা এমন পৌরাণিক উপমায় বিস্মিত হলাম।

মা জানকী বোধহয় উপমাটার তারিফ করল। একটা চোখ খুলে মৃদুকণ্ঠে বলল, মিঁয়াউ।

আপনাদের সঙ্গে গাড়ি আছে?

গাড়ি মানে ট্যাক্সি ।

ঠিক আছে, চলুন। ভদ্রলোক বেড়ালটাকে আদর করতে করতে আমাদের সঙ্গে চললেন। মুখে অনর্গল বাণী।

পৃথিবীর সব সুযোগ-সুবিধাটুকু আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন, জায়গা নিয়ে মোকাম বানাচ্ছেন। গাছপালা জন্তুজানোয়ার সব আপনাদের খাদ্য করে তুলেছেন। এমন কি বিল্লীর খাদ্য মছলি, তাও আপনারা ছাড়েননি। ওদের খাদ্য কেড়ে নিয়েছেন, আবার ওদের মাথার আচ্ছাদনটুকুও কেড়ে নিতে চাইছেন? ছিঃ ছিঃ।

শেষদিকে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে গেল। দু' এক ফোঁটা অশ্রুও হয়তো গোঁফের ওপর ঝরে পড়ল।

এর দিকে চোখ ফেরালেও কি আপনাদের কষ্ট হয় না? দেখুন চেয়ে দেখুন।

আমরা চেয়ে দেখলুম। বেড়ালের দিকে নয়, ভদ্রলোকের দিকে। ততক্ষণে তিনি মোটরের পিছনের ডালাটা খুলে বেড়ালটাকে রেখে দিয়ে ডালাটা বন্ধ করে দিয়েছেন।

যান, নিয়ে যান বাড়িতে। আপনারাই তো একে দেওতা বলেন। ষষ্ঠী ঠাকরুণ। দেওতাকে বাড়ি ছাড়া করতে আছে?

আমরা দুভাই ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। ট্যাক্সি ছুটল। উঁকি দিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোক হাততালি দিয়ে ভজন গাইছেন। হয়তো আমাদের মঙ্গলের জন্যই।

ত্রিলোচন বলল, দাদা, এবার আর মানুষের ধারে কাছে নয়। একেবারে জনমানবহীন মাঠে ছেড়ে দেওয়া যাক। চল, ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে যাই।

NOT FOR SALE

সেখানে কেউ থাকবে না? সন্দেহ প্রকাশ করলাম।

আজ বুধবার, রেস তো সেই শনিবার। আজ আর কে থাকবে? সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখন কি আর ঘোড়াদের ট্রেনিং-এর জন্য নিয়ে আসবে?

ট্যাক্সি ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে থামল। জনহীন মাঠ। কেউ কোথাও নেই।

ট্যাক্সি ড্রাইভারও সাফ কথা বলে দিয়েছে। এই শেষ। আর সে ঘুরতে পারবে না। বিল্লীকে এখানেই ছাড়তে হবে, নয়তো বাবুরা সঙ্গে করে নিয়ে যাক।

থলিটা হাতে নিয়ে মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। ছাড়তে যাব এমন সময় ত্রিলোচন বাধা দিল—

এক মিনিট দাদা।

আবার কি হল?

ছটা ছাব্বিশ পর্যন্ত সময়টা খারাপ। যাত্রা নাস্তি।

বেড়ালের একরকম যাত্রাই তো। নতুন ধরনের জীবনযাত্রাও বলা যেতে পারে।

ঠিক আছে। ছটা সাতাশ হতেই থলির মুখ খুলে দিলাম। ভেবেছিলাম, অচেনা জায়গায় বেড়ালটা থলি থেকে বের হতে চাইবে না, কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, থলির মুখটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তীর বেগে বেরিয়ে পড়ল। এত দ্রুত যে একটা হলদে চলন্ত আভা ছাড়া আর কিছু আমাদের চোখে পড়ল না।

ত্রিলোচন বলল, মাঠের গুণ দেখ দাদা। বেড়াল ঘোড়া হয়ে গেল। এভাবে রেসের দিন ছুটতে পারলে ট্রেনাররা ওকে লুফে নেবে। ওর বরাত খুলে যাবে।

আমি বললাম, আমরা একটা কাজ করি ত্রিলোচন, সোজা ট্যাক্সিতে না গিয়ে এখানে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খাই। তাহলে বেড়ালটা আমাদের আর অনুসরণ করতে পারবে না।

তুমি পাগল হয়েছ দাদা। ও এখন মুক্ত জীবনের সন্ধান পেয়েছে, আর কি সংসারে ফিরবে?

তবু আমরা দুজনে ঘুরতে শুরু করলাম। ঘোড়াগুলো যে পথে পাক দেয়, সেই পথে। দুজনে যখন বেশ ঘর্মাক্ত, তখন ট্যাক্সিতে এসে উঠলাম।

NOT FOR SALE

পিছনের ডালাটা খোলা ছিল, সেটা বন্ধ করে ত্রিলোচন আমার পাশে এসে বসল।

এতক্ষণ পরে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

বেলা সাড়ে এগারোটায় ট্যাক্সি চেপেছি, এখন সাতটা বাজে। তা হোক, পালের গোদাটাকে সরিয়ে দিতে পেরেছি। এ আনন্দ আমাদের রাখবার ঠাঁই নেই।

ট্যাক্সি ছাড়তে ত্রিলোচন গান শুরু করল।

নাই, নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার।

আমি বললাম, কিসের দ্বার ত্রিলোচন?

ত্রিলোচন গান থামিয়ে বলল, বেড়াল তাড়াবার দ্বার দাদা। এইবার দেখ না বাকি কটার কি হাল হয়! যুদ্ধে জেনারেল পালালে সৈন্যদের যেমন ছত্রভঙ্গ অবস্থা হয়, ঠিক তেমনই।

বাড়ি পৌঁছলাম পৌনে ন'টায়।

বাড়ির সামনে থামতেই এক কাণ্ড। বাকি বেড়াল কটা ট্যাক্সি ঘিরে ফেলল। ম্যাঁও, ম্যাঁও শব্দে পাড়া মুখরিত।

ত্রিলোচন বলল, দেখলে দাদা, ওষুধ কাজ করতে আরম্ভ করেছে। ওদের মুখচোখের কি রকম অসহায় ভাব লক্ষ্য করেছ?

নীচু হয়ে দেখলাম, কিছু বুঝতে পারলাম না। বেড়ালদের মুখচোখের ভাব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব নেই। শুধু দেখলাম, একগাদা চোখের তারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

ড্রাইভার কিন্তু অন্য কথা বলল, না বাবু, আসল ব্যাপার কি জানেন, যে থলিতে বিল্লীটা পুরে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা লাগেজ-কেরিয়ারে রয়েছে, তাতে এরা মছলীর গন্ধ পাচ্ছে। দেখছেন না সবাই মোটরের পিছন দিকে ঘোরাফেরা করছে।

তাও সত্যি। ওটাই আমাদের বাজারেব থলি। এতেই মাছ-মাংস আনা হয়।

যাক, ডালাটা খুললাম থলেটা বের করার জন্য, কিন্তু থলে বের করা আর হল না। লাফিয়ে পিছিয়ে এলাম। শুধু আমি নয়, ত্রিলোচনও।

NOT FOR SALE

থলেটা পাতা রয়েছে। তার ওপর গোদা বেড়ালটা ঘুমাচ্ছে। তার পাশে হৃষ্টপুষ্ট কুচকুচে কালো আর একটি। গোদা বোধহয় ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে এটিকে সংগ্রহ করে এনেছে।

ডালাটা খুলতেই বিকট শব্দে ম্যাঁও করে গোদা লাফিয়ে পড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। তার পিছন পিছন বাকি সাতটা।

ত্রিলোচনের দিকে ফিরে দেখি সে রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েছে। দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করে শব্দ হচ্ছে আর বলছে, দাদা, ভূমিকম্প, মাটি দুলছে, জল দুলছে, পৃথিবী দুলছে।

———

NOT FOR SALE

গুপ্তধনের সন্ধানে

টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই মেয়ের দল হইহই করে বেরিয়ে পড়ল। শ্রাবণী, অদিতি, মধুছন্দা, সমাপ্তি, মিতালী আর জয়শ্রী—এরা মাঠে গিয়ে গোল হয়ে বসল। সবাই ঝরিয়া কীর্তিচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। সাত ক্লাসে পড়ে। এই ছজন এক প্রাণ, এক মন। স্কুলে সব সময়ে একসঙ্গে।

শ্রাবণী বলল, এই মিতালী, টিফিনের সময় কি বলবি বলেছিলি বল?

মিতালী টিফিন বাক্স খুলে পাঁউরুটির টুকরো বের করে সকলের হাতে দিল। অদিতি সন্দেশ এনেছিল, তাই সবাইকে বিলি করল।

শ্রাবণী বলল, তোদের একটা নতুন জিনিস খাওয়াব। কলকাতায় আমার দিদার বাড়ি থেকে আমের আচার এনেছি। পাঁউরুটি দিয়ে ভালই লাগবে। এই নে।

শ্রাবণী ছোট একটা কাচের শিশি বের করে সকলের সামনে রাখল। আচারের নামে মেয়েরা পাগল। সবাই শিশি খুলে আচার পাঁউরুটিতে মাখিয়ে নিল।

জয়শ্রী আবার মনে করিয়ে দিল।

কিরে মিতালী, কি বলবি বল। এখনই তো ঘণ্টা পড়ে যাবে।

হাতের ওপর গড়িয়ে আসা আচার চাটতে চাটতে মিতালী বলল, বলছি, সে ভারী মজার কথা।

মেয়েরা আরও ঘন হয়ে বসল।

মিতালী বলতে আরম্ভ করল।

কাল রাতে বাবা মাকে যা বলছিল আমি সব শুনতে পেয়েছি। সেই কথাই তোদের বলব। রাজবাড়ির পিছনে টিলার পাশে যে ভাঙা বাড়িটা আছে সেটা আমাদের জানিস তো। মেরামত হয়নি বলে বাড়িটার ওই অবস্থা। কেউ ওখানে থাকে না। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা এই বাড়িটা পেয়েছিল।

মধুছন্দা জিজ্ঞাসা করল, পেয়েছিল মানে?

NOT FOR SALE

মিতালী বলল, পেয়েছিল মানে, জানিস তো অনেক আগে ঝরিয়া বাংলাদেশের মধ্যে ছিল। মোগল আমলে একজন মনসবদার ছিল নাজামউদ্দিন। এসব জায়গা সেই দেখাশোনা করত। লোকটা ভীষণ অসৎ ছিল আর মতলববাজ। প্রজাদের কষ্ট দিয়ে অনেক টাকাকড়ি করেছিল। ওই বাড়িতে সেই সব টাকাকড়ি জমিয়ে রাখত। যে সব প্রজারা তার কথা শুনত না, কিংবা গোলমাল করত, তাদের ওই বাড়ির চোরা-কুঠুরিতে পুরে রাখত। না খেতে পেয়ে খিদেয়, তেষ্টায় তারা সব মরে যেত।

দিনকাল বদলাল। মোগলদের কাছ থেকে দেশ ইংরেজদের হাতে চলে এল। ওই বাড়িও ইংরাজরা নিয়ে নিল।

আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা ইংরাজদের কুঠিয়াল ছিলেন। তাদের ব্যবসার অনেক খোঁজখবর দিতেন। ফলে তিনি খুব বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কানিংহাম সায়েব ওই বাড়িটা আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দাকে উপহার দেয়। আমার বাবার ধারণা খোঁজ করলে ও বাড়িতে এখনও কিছু ধনরত্নের সন্ধান মিলতে পারে।

মধুছন্দা প্রশ্ন করল, তোর বাবা খোঁজ করছেন না কেন?

মিতালী বলল, মাও তো বাবাকে সেই কথাই বলছিল। একদিন লোকজন ডেকে বাড়িটা পরিষ্কার করাও না। যদি কিছু পাওয়া যায়। আজকাল সোনার যা দাম হচ্ছে।

বাবা বলল, লোকজন ডাকলে সব জানাজানি হয়ে যাবে, তার চেয়ে ভাবছি আমি দিন সাতেকের ছুটি নেব, নিয়ে বাড়িটার মধ্যে ঢুকব।

মিতালী একবার সব মেয়েদের মুখের দিকে দেখে নিয়ে বলল, আমি কি ভাবছি জানিস?

কি? কি?

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

বাবা ছুটি নিয়ে বাড়িতে ঢোকার আগে, চল দল বেঁধে আমরাই যাই। কাল থেকে তো স্কুল ছুটি হয়ে যাচ্ছে। প্রচুর অবসর। ধনরত্নের আমাদের খুব দরকার।

শ্রাবণী বলল, ঠিক বলেছিস। দরকারের সময় একটা পয়সা আমরা হাতে পাই না। দেখ না, জন্মদিনে কতগুলো টাকা পেলাম, সব কৌটোর মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম, মা হঠাৎ বলল, শ্রাবণী তোর কৌটো থেকে পয়সা নিচ্ছি,

NOT FOR SALE

রেডিয়োটা সারাতে হবে। ব্যস, সব পয়সা শেষ। আর একবার বাবাও মাথায় হাত বুলিয়ে ছাতা কেনবার নাম করে আমার পয়সা নিয়েছিল।

দেখা গেল সব মেয়েরই অর্থাভাব। মোগল আমলের কিছু ধনরত্ন পেলে খুবই ভাল হয়।

অদিতির একটু সাহসের অভাব। সে এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার বলল, কিন্তু যে সব প্রজাদের না খেতে দিয়ে মেরে ফেলেছিল তাদের অতৃপ্ত আত্মারা ওখানে নেই তো? তারা যদি গোলমাল করে? আমি আবার ভূতপ্রেত একেবারে সহ্য করতে পারি না।

মিতালী ঠোঁট বেঁকাল, শোন অদিতির কথা। ভূতপ্রেত আবার আছে নাকি। মানুষ মারা গেলেই তো শেষ।

সমাপ্তি আর থাকতে পারল না। বলল, যাক, ওসব বাজে কথা, আমরা কবে ওই বাড়িতে যাচ্ছি, তাই বল। এবার কলকাতায় গিয়ে যা চমৎকার গোটা কয়েক ফ্রক দেখে এসেছি। বড্ড দাম, ওই ধনরত্নগুলো পেলে আর ভাবনা নেই।

ঠিক হ'ল কাল থেকে ছুটি। কালকের দিন বাদ দিয়ে পরশু দিনই ওই বাড়ির মধ্যে ঢোকা হবে। ইতিমধ্যে মিতালী বাড়ির সদর দরজার চাবিটা যোগাড় করে রাখবে।

জয়শ্রী বলল, শোন, কিছু টর্চ আর গোটা কয়েক থলে সবাই সঙ্গে নিবি। অন্ধকারে টর্চ খুব কাজে লাগবে আর ধনরত্ন বয়ে আনার জন্য থলেও দরকার।

এও ঠিক হ'ল, দুপুর বেলা সবাই বাড়ির মধ্যে ঢুকবে আর সন্ধ্যার সময় অদিতিদের মোটর টিলার নীচে অপেক্ষা করবে, না হ'লে অত ধনরত্ন বয়ে আনা সম্ভব নয়।

শ্রাবণীদেরও মোটর আছে, কিন্তু মোটর চালায় শ্রাবণীর বাবা। তার বাবা গেলে আর ধনরত্নের একটি টুকরোও মেয়েরা পাবে না।

ঠিক দিনে দুপুর বেলা শ্রাবণীদের উঠানে সবাই এসে জড় হ'ল। শ্রাবণীর বাবা কোর্টে, মা ঘুমে অচেতন। কাজেই কোন অসুবিধা নেই।

জয়শ্রী বলল, আমি পাঁজি দেখেছি। দুপুর একটা বাইশ মিনিটে যাত্রা শুভ। এখন ঠিক একটা, আর বাইশ মিনিট পরে আমরা রওনা হব।

ছজন মেয়ে চারটে টর্চ এনেছে, কিন্তু সকলের হাতেই পাট করা কাপড়ের থলে।

NOT FOR SALE

ঠিক একটা বাইশে মেয়েরা যাত্রা শুরু করল।

রাজবাড়ি পিছনে রেখে টিলা পার হয়ে চলল। এখানে রাস্তা নেই, পায়ে চলা সরু পথ। তেঁতুল, বট আর অশ্বত্থ গাছে দিনের বেলাতেও জায়গাটা অন্ধকার। ঝিঁঝি ডাকছে। গাছের গুঁড়ি বেয়ে কাঠবিড়ালী ওঠা-নামা করছে।

মেয়েরা সন্তর্পণে পা ফেলে এগোতে লাগল।

বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল জরাজীর্ণ একটা বাড়ি। ইটের ফাঁকে ফাঁকে বট-অশ্বত্থের চারা। সামনের বারান্দাটা ভেঙে মাটিতে পড়ে গেছে। ছাদের কিছুটা নেই। বাড়িটার আদিতে কি রং ছিল বলা মুশকিল, এখন বৃষ্টির প্রকোপে কালো একটা আস্তরণ পড়েছে।

মিতালী হাত তুলে দেখাল, ওই আমার ঠাকুর্দার বাড়ি। দেখেই মনে হচ্ছে ভিতরে ধনরত্ন ঠাসা।

শ্রাবণী মনে করিয়ে দিল, চাবিটা এনেছিস তো?

মিতালী নিজের গলার হারটা তুলে ধরল। সবাই দেখল হারের সঙ্গে মস্ত বড় একটা পিতলের চাবি।

মেয়ের দল দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মিতালী আগে, পিছনে আর সব।

বাড়ির তুলনায় দরজার আয়তন খুব ছোট। দরজার ওপর উর্দু ভাষায় কি সব লেখা রয়েছে।

মিতালী বলল, জয় গুরু, তারপর নীচু হয়ে দরজাটা খোলার জন্য চাবি বের করল।

দুটো বিরাট গাছ ডালপালা ছড়িয়ে এদিকে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে জায়গাটা রীতিমত অন্ধকার।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করে মিতালী বলল, কইরে তালা তো খুঁজে পাচ্ছি না। কুঁজো হয়ে আমার পিঠ ব্যথা হয়ে গেল। তোরা কেউ চেষ্টা কর।

এবার শ্রাবণী এগিয়ে গেল। হাতের টর্চ জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক দেখে বলল, কই রে তালাই তো নেই। ভাঙা কবজা পড়ে রয়েছে।

জয়শ্রী বলল, সর্বনাশ, তাহলে নিশ্চয় কেউ আগে এসে ধনরত্ন সব নিয়ে গেছে। আমাদের পরিশ্রমই সার হ'ল।

NOT FOR SALE

মেয়েরা কেউ কিছু বলল না। শুধু মধুছন্দা গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজাটা কেঁপে উঠল, কিন্তু খুলল না।

তখন সব মেয়েরা একসঙ্গে দরজার ওপর এসে পড়ল, তারপর প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা।

ক্যাঁচ, কোঁচ, ক্যাঁচ। বিকট শব্দ করে দরজার পাল্লা দুটো হঠাৎ খুলে গেল। জয়শ্রী আর মধুছন্দা সামনে ছিল, তারা টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো কালো কালো ছায়া মেয়েদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল।

অদিতি কাঁপতে কাঁপতে বলল, রাম, রাম। নিশ্চয় সেই অতৃপ্ত আত্মা। যে সব প্রজাদের অনাহারে মেরে ফেলেছিল, তারা।

শ্রাবণী বলল, দূর, আত্মাটাত্মা নয়, বাদুড়। ওই দেখ না বাইরে গাছের ডালে সব ঝুলছে।

মেয়েরা কোমর বেঁধে ঢুকে পড়ল।

বাড়ির মধ্যে বিশ্রী একটা গন্ধ। নিশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না।

সমাপ্তি সাবধান করে দিল, এখন কেউ ভিতরে যেও না। অনেক বছর বাড়িটা বন্ধ ছিল, ভিতরে গ্যাস হয়েছে। একটু অপেক্ষা কর। বাইরের হাওয়া ভিতরে ঢুকুক।

মেয়েরা সবাই সার বেঁধে দরজার কাছে দাঁড়াল।

কেউ কেউ আবার নাকে কাপড় জড়াল।

একটু পরে একে একে সবাই ভিতরে ঢুকল।

পাশের ঘরটা খুব ছোট। তার ওপর অন্ধকার। অন্ধকারে চোখ একটু অভ্যস্ত হয়ে যেতে সকলে দেখল সার সার অনেকগুলো মাটির জালা।

মিতালী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, এর মধ্যে নিশ্চয় ধনরত্ন আছে। থলেগুলো নিয়ে আয়।

জয়শ্রী যেমনি সামনের মাটির জারে হাত ঢোকাতে গেছে, অমনি গম্ভীর গলায় আওয়াজ হ'ল, হুম্ হুম্ হুম্।

জয়শ্রী লাফিয়ে পিছিয়ে এল।

NOT FOR SALE

অদিতি জয়শ্রীর পিছনে ছিল। তার খুব ইচ্ছা, তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে বড় সাইজের মণি-মাণিক্যগুলো তুলে নেবে। সে তার বাবার কাছে শুনেছে, মোগল আমলে খুব দামী দামী হীরা-জহরত পাওয়া যেত। গোটা কয়েক সে রকম পেলেই আর দেখতে হবে না। সারাজীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটাতে পারবে।

হুম্ হুম্ শব্দ শুনে ওপর দিকে চেয়েই অদিতি হাঁউ মাঁউ করে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবারে গেলাম রে। আমাকে বাঁচাও।

মধুছন্দা জিজ্ঞাসা করল, তোর কি হ'ল রে? ওরকম করছিস কেন?

কোন কথা না বলে অদিতি আঙুল দিয়ে দেখাল।

সব মেয়েরা মুখ তুলে দেখল।

ঘন অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ। আগুনের ভাঁটার মতন।

মেয়েরা পিছিয়ে এল।

মিতালী বলল, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। আগের দিনে ধনরত্ন আগলাবার জন্যে লোকেরা একজনকে মেরে যক্ষ বানিয়ে রাখত। সেই সব ধনরত্ন পাহারা দিত। ওটা হচ্ছে সেই যক্ষ।

অদিতি কেঁদে উঠল, আমার ধনরত্নে দরকার নেই ভাই। তোরা আমাকে বাড়ি পৌঁছে দে। আমি একলা যেতে পারব না।

হুম্, হুম্, হুম্।

গম্ভীর শব্দ খালি ঘরে যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। চোখদুটো আরও জ্বলতে লাগল।

অদিতির সেই দিকে চোখ পড়তেই সে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। দাঁতে দাঁতে আটকে গেল। মুখ দিয়ে উঁ উঁ শব্দ করতে লাগল।

অদিতি পড়ে যেতেই পটপট আওয়াজ। মেয়েদের মাথার ওপর দিয়ে সেই জ্বলন্ত চোখ ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল।

মিতালী বলল, পেঁচা,, পেঁচা, লক্ষ্মীপেঁচা। অদিতি মিছামিছি ভয় পেল।

সমাপ্তি থলে দিয়ে অদিতির মুখে হাওয়া করছিল। সে বলল, লক্ষ্মীপেঁচা যখন আছে তখন নিশ্চয় ধনরত্নও আছে। মা লক্ষ্মীই তো সম্পদের দেবী।

একটু পরেই অদিতি চোখ খুলল। ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, আমি কোথায়?

NOT FOR SALE

জয়শ্রী বলল, তুই রাশি রাশি ধনরত্নের পাশে শুয়ে আছিস। কোন ভয় নেই। তুই যাকে যক্ষ ভাবছিলি সেটা যক্ষ নয়, লক্ষ্মীপেঁচা। আমাদের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়ে গেল।

সব শুনে অদিতি উঠে বসল, তারপর বলল, তাহলে আর আমরা দেরি করছি কেন? থলেগুলো বোঝাই করে নিলেই তো পারি।

সমাপ্তি মাটির জালার কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে প্রথমেই জালার মধ্যে হাত ঢোকাল।

একটু পরেই চেঁচিয়ে উঠল, উঃ মা, কিরে এর মধ্যে।

সমাপ্তি হাতটা টেনে বের করতেই অন্য মেয়েরা হাতের ওপর টর্চের আলো ফেলল।

কনুই পর্যন্ত কালো হয়ে গেছে।

সমাপ্তি নিজের হাতটা নাকের কাছে নিয়ে গিয়েই নাক কোঁচকাল, কি বিশ্রী গন্ধ রে বাবা, অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার দাখিল।

শ্রাবণী এগিয়ে এসে শুঁকে বলল, এ তো পচা গোবর রে। জমিতে সার দেবার জন্য দরকার হয়।

মধুছন্দা বলল, সব জালাগুলোতেই কি গোবর আছে। হাত দিয়ে দেখ না।

কিন্তু দেখবে কে? দুর্গন্ধের জন্য কেউ হাত ঢোকাতে রাজী হ'ল না।

শেষকালে জয়শ্রী সব জালাগুলোর মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল। সবগুলোতেই এক ব্যাপার। পচা গন্ধ। মনে হল এগুলোতে সার পচিয়ে রেখেছে।

শ্রাবণী বলল, এখানে কিছু নেই। চল পাশের ঘরে দেখা যাক।

সবাই পাশের ঘরে ছুটল।

ঢোকবার মুখেই বাধা। দরজায় পুরু মাকড়সার জাল। মেয়েদের চুলে, চোখে, মুখে জড়িয়ে গেল।

রুমাল দিয়ে মুখ-চোখ মুছে সবাই ভিতরে ঢুকল।

মধুছন্দা বলল, এই হাতের টর্চগুলো জ্বাল। এ ঘরে কি আছে দেখি।

চারজন মেয়ে চারটে টর্চ টিপল। বরাত, তিনটেই জ্বলল না। বোধ হয় ব্যাটারি খতম। শুধু অদিতির টর্চটা জ্বলল।

NOT FOR SALE

সেই আলোয় দেখা গেল কোণের দিকে অনেকগুলো বেতের ধামা। মেঝের ওপর টুকরো টুকরো কাঠ ছড়ানো।

মিতালী বলল, এই অদিতি, তোর টর্চের আলো অত কাঁপছে কেন?

অদিতি কি উত্তর দেবে! তার সারা দেহই ঠকঠক করে কাঁপছে, সেইজন্য টর্চের আলোও কাঁপছে।

সমাপ্তি বলল, তুই এক কাজ কর অদিতি, টর্চটা এই কাঠের টুকরোর ওপর রাখ। তাহলে আলোটা কাঁপবে না। সবাই দেখতে পাবে।

পাশেই চৌকো একটা কাঠের বাক্স ছিল, অদিতি তার ওপর টর্চটা রাখল।

দু-এক মিনিট, তারপরই দারুণ কাণ্ড আরম্ভ হ'ল।

টর্চসুদ্ধ কাঠের বাক্সটা ছুটোছুটি আরম্ভ করল। একবার এদিক, আর একবার ওদিক, তারপর চরকির মতন বোঁ বোঁ করে।

কখনও কোন মেয়ের গায়ের ওপর এসে পড়তে লাগল।

এতক্ষণ কয়েকজন মেয়ে তবু সাহস করে এগোচ্ছিল, কিন্তু টর্চের কাণ্ড দেখে সবাই চেঁচামেচি শুরু করল।

অদিতি তো কাঁদতেই লাগল।

ওরে বাবা, ঘূর্ণীভূতের পাল্লায় পড়েছি। কে কোথায় আছ, বাঁচাও। আমার ধনরত্নে দরকার নেই। আমার যা আছে, সেই ভাল।

ছুটোছুটি করতে করতে জয়শ্রী আর মধুছন্দা নিজেদের মধ্যে ধাক্কা লেগে দুজনে দুদিকে ছিটকে পড়ল।

টর্চের থামবার নাম নেই। প্রচণ্ড বেগে ছুটোছুটি করে চলেছে।

শ্রাবণী বলল, চল, আমরা বেরিয়ে পড়ি। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

শ্রাবণীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের দল ছিটকে এদিকের ঘরে চলে এল।

তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে জয়শ্রী আর অদিতি পায়ে পায়ে জড়িয়ে একটা মাটির জালার ওপর সজোরে পড়ল।

ফটাস করে শব্দ। মাটির জালা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আর ভিতরের পচা সারে জয়শ্রী আর অদিতি স্নান করে উঠল।

আপাদমস্তক কুচকুচে কালো, শুধু চোখের দুটো সাদা অংশ দেখা গেল।

NOT FOR SALE

বিপদের ওপর বিপদ।

অদিতির সেই টর্চ মেয়েদের পিছনে এসে আগের মতন ছুটোছুটি শুরু করল।

ওরে বাবা, ও দুটো পেত্নী নাকি রে?

অদিতি আর জয়শ্রী দুজনেরই নাকে কালো কালো সার ঢুকে গিয়েছিল। ভাল করে কেউ কথা বলতে পারছিল না।

মেয়েরা ভয় পাচ্ছে দেখে অদিতি বলল, এঁই আঁমাদের দেঁখে তোঁরা ভঁয় পাঁচ্ছিস কেঁন? আঁমাদের চিঁনতে পাঁরছিস নাঁ?

তার নাকি সুর শুনে মেয়েরা আরো ভয় পেয়ে গেল।

ঢোকবার সময় ঠেলে দরজা খুলে সবাই ঢুকেছিল, সেই দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। মেয়েরা অনেক চেষ্টা করেও ভিতর থেকে দরজা আর খুলতে পারল না।

সর্বনাশ, সারারাত এই ভুতুড়ে বাড়িতে বন্ধ থাকলে কেউ প্রাণে বাঁচব না। মেয়েরা কান্না শুরু করে দিল।

মেয়েদের কান্না ছাপিয়ে হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা গেল। মনে হ'ল, ঘরের মধ্যে দুটো দৈত্য বুঝি ঝটাপটি শুরু করেছে।

টর্চটা এখন এক জায়গায় স্থির হয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে বিকট শোঁ শোঁ আওয়াজে চক্কি ভূতও বুঝি ভয় পেয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে অদিতি আর জয়শ্রী নিজেদের রুমাল, ফ্রক আর কাপড়ের থলি ঘষে ঘষে গা থেকে পচা সার অনেকটা উঠিয়ে ফেলেছে। তাদের এবার চেনা যাচ্ছে।

সব মেয়েরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দরজা ধরে টানল, কিন্তু দরজা এক ইঞ্চি ফাঁক হ'ল না।

মধুছন্দা আর সমাপ্তি দরজার কাছে মুখ রেখে চেঁচাল। কে আছ বাঁচাও। আমরা ছজন মেয়ে এই পোড়ো বাড়িতে আটকে পড়েছি।

কোন সাড়া নেই।

অদিতি বলল, আরও জোরে চেঁচা, রাজবাড়িতে অনেক লোক আছে। তারা যদি শুনতে পায়, ঠিক বাঁচাতে আসবে।

এবার সবাই চেঁচাতে আরম্ভ করল।

NOT FOR SALE

বাইরে থেকে সাহায্যের জন্য কেউ তো এলই না, বরং মেয়েদের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে টর্চ আবার ছুটোছুটি শুরু করল। এবার আরও বিদ্যুৎ-বেগে।

প্রথমে মিতালীর চোখে পড়ল।

আলোটা স্থির নয়, অনবরত ঘুরছে, কিন্তু তাতেই দেখা গেল।

ওই দেখ।

মিতালী আঙুল দিয়ে দেখাল।

পিছনের দেয়ালে হাত তিনেক লম্বা একটা সাপ। গাঢ় কালো রং, বেশ মোটা।

এক ভাবে চুপ করে রয়েছে।

মারাত্মক অবস্থা। চারদিক বন্ধ। পালাবার কোন পথ নেই। এই সময় ওই সাপটা যদি লাফিয়ে নীচে পড়ে, তাহলে কাউকে আর বাঁচতে হবে না। সাপের যা আকৃতি, পাহাড়ে সাপ, নিশ্বাসে বিষ।

মেয়ের দল সবাই পিছনের দেয়াল থেকে যতটা সম্ভব সরে এল।

অদিতি কাঁদতে কাঁদতে বলল, কি মুশকিলেই যে পড়েছি। কাকে ডাকি বল তো? রামকে, না মা মনসাকে। কে বাঁচাবে। এদিকে ঘূর্ণীভূত আর ওপরে ফোঁস।

মেয়েরা কোন উত্তর দিল না, কিন্তু সবাই মনে মনে মনসা আর রামনাম জপ করতে লাগল।

হঠাৎ আবার শোঁ শোঁ শব্দ। বিকট শব্দ করে দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল।

বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি নেই। হালকা রোদ উঠেছে।

দরজার পাল্লা দুটো খুলতেই আর এক কাণ্ড। একটা পাল্লা সবেগে টর্চের উপর গিয়ে পড়তেই, টর্চটা ঠিকরে পড়ল, আর কাঠের বাক্সটা উলটে যেতেই তার মধ্যে থেকে বিরাট সাইজের একটা ইঁদুর ছুটে পালাল।

জয়শ্রী বলল, ওমা। চরকি ভূত নয়, বাক্সের মধ্যে ইঁদুর ঢুকে ছুটোছুটি করছিল। এবার অদিতি সাহস করে পিছনের দেয়ালের দিকে দেখল।

সাপ নয়, আঁকাবাঁকা একটা ফাটল। বাইরের রোদে এবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মেয়েদের চেহারা যা হয়েছে দেখবার মতন। কেউ খোঁড়াচ্ছে, কারও ফ্রক

NOT FOR SALE

ছিঁড়ে গেছে, একজনের মুখ ভরতি মাকড়সার জাল, দুজনে তো পচা সারে স্নান করে উঠেছে।

জয়শ্রী বলল, এই নাক-কান মলছি, আর আমার ধনরত্নে দরকার নেই। ভগবান যা দিয়েছেন তাই ভাল। এখন ভালয় ভালয় বাড়ি পৌঁছতে পারলে বাঁচি।

সকলে ক্লান্ত পায়ে পোড়ো বাড়ি থেকে বেরিয়ে টিলার পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

ওদিকে অদিতিদের মোটর থাকবার কথা। না হলে এ পোশাকে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে সবাই পাগলী বলবে।

একটু পরেই রোদটুকু কমে গেল! আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। ঘন অন্ধকার নামল।

বটগাছতলা দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে বাজখাঁই আওয়াজ উঠল।

গোলমেলে লেলুয়া।

জয়শ্রী আর মধুছন্দা ধার দিয়ে যাচ্ছিল, চিৎকার শুনে তারা ছুটতে শুরু করল।

ওরে বাবারে, ভূত এখনও আমাদের ছাড়েনি। পিছন পিছন এতটা রাস্তা এসেছে।

বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখা গেল, ভূত নয়, বান্টু। শ্রাবণীর ভাই।

থলিতে দেহ ঢেকে শুধু মুখটা বের করে বটগাছ তলায় বসে আছে।

সে বলল, মা আমাকে আর একটা থলি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিছু বেশি ধনরত্ন নিয়ে যাবার জন্য।

মেয়েরা আর কথাটি বলল না। মুখও তুলল না।

সরু পথ দিয়ে দৌড়তে শুরু করল। থলেগুলো মাথায় দিয়ে।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

———

NOT FOR SALE

তাপ্পিদার সাপ শিকার

তাপ্পিদা চেয়ারের ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে বলল, "দূর, বাঘ-ভালুক শিকার আবার শিকার নাকি? ও তো বাচ্চারাও পারে। ভালুকের বিরাট চেহারা। গুলি করলে ফসকাবার উপায় আছে? ঠিক গায়ে গিয়ে লাগবে। আর বাঘ শিকার? গাছের তলায় ছাগল বেঁধে বাবুরা গাছের মগডালে গিয়ে উঠলেন। বেচারি বাঘ যখন ছাগল চিবোতে ব্যস্ত, তখন পাতার আড়াল থেকে দড়াম করে গুলি। কী বীরত্ব!"

"সেরা শিকার হচ্ছে সাপ শিকার। সাপের অগম্য জায়গা নেই। জলে, স্থলে, হাফ-অন্তরীক্ষে এদের অবাধ বিচরণ। হাফ-অন্তরীক্ষ মানে গাছের উঁচু ডাল পর্যন্ত। বহু সরু জাতের সাপ আছে চোখ একটু খারাপ থাকলে তাদের দেখাই যায় না। গাছের ডালের সঙ্গে এমন বেমালুম মিশে থাকে যে তাদের আবার গুলিতে ঘায়েল করা যায় না। তুমি গুলি ছুঁড়লে, আর দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড়ের মতন ফণা দিয়ে হেড করে সেই গুলি তোমার দিকেই ফেরত পাঠাল।"

"পাইথন মারার নিয়ম হচ্ছে" তাপ্পিদা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "না থাক এসব মন্ত্রগুপ্তি সকলকে জানানো ঠিক হবে না।"

পাড়ার ছেলেরা নাছোড়বান্দা। তাপ্পিদাকে ঘিরে ধরল, "তাপ্পিদা, তোমার সাপ শিকারের দু-একটা কাহিনী বলো।"

"বলব? তাহলে গোকুলকে বল, এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট দিতে।"

চা আর টোস্ট এল। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে তাপ্পিদা বলতে শুরু করল।

"বছর পাঁচেক আগের কথা। রাজস্থানে গিয়েছি সাপের সন্ধানে। মরুভূমিতে একরকম সাপ আছে, তার রং একেবারে বালির মতো। কিছু তফাৎ টের পাওয়া যায় না। কোন রকমে নাগালের মধ্যে পেলে আর দেখতে হবে না, এক ছোবলেই মাথায় বিষ উঠে যাবে। ওঝা, ডাক্তার কেউ কিছু করতে পারবে না।

NOT FOR SALE

"তাই খুব সাবধানে বালির দিকে চোখ রেখে চলেছি। হাতে বন্দুক। মাথার ওপর কড়া রোদ, পায়ের নীচে গরম বালি। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। তেষ্টায় তালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। আর চলতে পারছি না। একটু জল না পেলে প্রাণে বাঁচব না। হঠাৎ দেখতে পেলাম খেজুর গাছে ঢাকা একটা ডোবা, চারপাশে কিছু সবুজ ঘাসও রয়েছে। তার মানে, 'ওয়েসিস', বাংলায় যাকে বলে মরুদ্যান।

"ডোবা দেখে আর জ্ঞান ছিল না, ছুটে সেখানে গেলাম। বন্দুকটা ঘাসের ওপর রেখে দেখলাম, বিরাট একটা তালগাছের কিছুটা ডাঙা থেকে জলের মধ্যে ডোবানো।

"বোধহয় গ্রামবাসীরা জল নেবার সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা করেছে। ডোবার জল একটু সবুজ, কিন্তু আমার তখন এত তেষ্টা পেয়েছিল যে কাদাগোলা জল খেতেও আমি রাজি ছিলাম। কোমরের ছোরাটা তালগাছের মধ্যে গেঁথে সাবধানে নেমে গেলাম। রুমাল ভিজিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জল খেলাম। আঃ প্রাণটা যেন বাঁচল।

"আবার পা টিপে টিপে এসে ছোরাটা উঠিয়ে নিয়েই চমকে উঠলাম। ছোরার মুখটা রক্তে লাল আর একটু একটু করে তালগাছটা ডোবার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, ওটা তালগাছ নয় পাহাড়ী অজগর। ছুটে ওপরে এসে প্রাণপণ শক্তিতে ছোরার ঘা বসালাম বোধহয় বার সাতেক। ডোবার জলে যেন সমুদ্রের ঢেউ উঠল। জলের ছিটে খেজুর গাছের মাথায়। চারপাশের মাটি কেঁপে উঠল। অজগর জলে ডুবে গেল।"

শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল।

"বলো কি তাপ্পিদা, এই সাইজের অজগর আছে?"

তাপ্পিদা মুচকি হেসে বলল, "এ পৃথিবীর কতটুকুই আমরা জানি।"

সবাই আবার চেঁচাল, "আরো একটা, এরকম বিপদের কাহিনী বল তাপ্পিদা।"

তাপ্পিদা অমায়িক হাসল, "আমার জীবনটাই তো বিপদের সঙ্গে কোলাকুলি ভাই। শোনো, তবে একটা ঘটনা। তার আগে গলাটা ভিজিয়ে নিতে হবে। দরকার এক কাপ চায়ের।"

চা এল।

NOT FOR SALE

কাপে চুমুক দিতে দিতে তাপ্পিদা শুরু করল, "সেটা বোধহয় ঘাটশীলা কিংবা ঝাড়গ্রাম হবে। ঝাড়গ্রামই বোধহয়। বন্দুক ঘাড়ে সাপের খোঁজে চলেছি। তিনদিন ধরে জঙ্গলে ঘুরছি, সাপের খোলসেরও দেখা নেই।

"আমি যে এখানে আসব সেটা কাকপক্ষীরও জানা ছিল না, সাপেরা টের পেল কি করে। সব সরে পড়েছে। ঘন কাঁটা বন। পাতার ফাঁকে ফাঁকে শজারুর মতন কাঁটা। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে কাঁটা ঝোপের ওপর গিয়ে পড়লাম। মুখটা বেঁচে গেল, কিন্তু একটা পা কাঁটার ঘায়ে রক্তাক্ত। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল।

"একবার ভাবলাম, রুমালটা দিয়ে পা-টা বাঁধি, কিন্তু তাহলে রুমালটা যাবে। বনের মধ্যে খুঁজতে লাগলাম যদি চওড়া কোন পাতা কিংবা গাছের ছাল পাই। বরাত ভাল, হলদে রঙের একটা কাপড়ের পাড় পেয়ে গেলাম। বোধহয় বনভোজনের জন্য কেউ হাঁড়িকুড়ি বেঁধে এনেছিল। যাবার সময় ফেলে গেছে।

"রক্ত পড়া বন্ধ হল। একটা গাছতলায় বসে কৌটা খুলে লুচি আর তরকারি খাচ্ছি। হঠাৎ পা-টা শিরশির করে উঠল।

"ভাবলাম আবার বুঝি রক্ত পড়ছে। চোখ ফিরিয়ে দেখেই চক্ষুস্থির। পাড়ের একটা কোণ থেকে চেরা জিভ দেখা যাচ্ছে। বাঁধনটা মোক্ষম হয়েছে বলে ছোবলটা দেবার সুবিধা পাচ্ছে না। একটু একটু করে পায়ের বাঁধন আলগা হয়ে আসছে বুঝতে পারলাম। এবার বিপদে পড়ব।

"চিতি সাপ। নিশ্বাসে মৃত্যু। কিছু একটা আমায় করতেই হবে। আস্তে আস্তে কোমর থেকে ছোরাটা বের করে সাপের মাথাটা দুখণ্ড করে ফেললাম। মাথা কাটা যাবার পরও দেহটা নড়তে লাগল। পায়ে জড়ান বাঁধনটা খুলে ফেলে তবে নিষ্কৃতি পেলাম।"

তাপ্পিদা চেয়ারে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল। সেদিনের বীভৎস অবস্থাটা যেন নতুন করে অনুভব করছে।

ছোটন বলল, "আচ্ছা, তাপ্পিদা, এটাই বোধহয় তোমার সবচেয়ে মারাত্মক অভিজ্ঞতা সাপ সম্বন্ধে, তাই না?"

তাপ্পিদা মাথা নাড়ল, "মারাত্মক অভিজ্ঞতার কথা যদি তুললে, তাহলে বলব সেরাইকেল্লার ডাকবাংলোয় যা হয়েছিল তার তুলনায় এসব তো ছেলেখেলা।"

NOT FOR SALE

"কি রকম? কি রকম?" সবাই ঘিরে ধরল।

"এ আর এক দিন বলব।" তাপ্পিদা ওঠবার চেষ্টা করল।

"আরে না, না, আর একদিন কেন। আজই হোক। বরং আর এক কাপ চা আর টোস্ট দিতে বলি।"

চায়ের কাপ সামনে নিয়ে তাপ্পিদা কিছুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল, "ঘটনাটা মনে হলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। রাউরকেল্লা হয়ে সেরাইকেল্লা গেছি ওই সাপের সন্ধানে। চারিদিকে ঘন বন। সূর্যের আলো পর্যন্ত আসে না। সন্ধ্যা ছটা বাজলেই নানারকম পশুপাখির ডাক শোনা যায়।

দারোয়ানটা বলেছিল, "সাব, রাতে আলো নেভাবেন না, আর মশারি ফেলে শোবেন।"

"আলোটা জ্বালিয়েই শুই, কিন্তু মশারি ফেলে শুতে পারি না। দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই মশারিটা তোলাই থাকে।

"মাঝরাতে হঠাৎ দেহে একটা শীতল স্পর্শ লাগতেই চমকে জেগে উঠেছিলাম। চোখ খুলেই দেখি পাশে একেবারে স্বয়ং যম। চন্দ্রবোড়া। বিরাট ফণা তুলে আমার বিছানার ওপর। জানলা দরজা বন্ধ। নিশ্চয় নর্দমার গর্ত দিয়ে ঢুকেছে।

"আমার বন্দুকটা দেয়ালে ঝোলানো। ছোরা টেবিলের ড্রয়ারে। নখ ছাড়া সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। উপায়? উঠে ছোরা কিংবা বন্দুক আনতে গেলেই খতম হয়ে যাব। চুপচাপ মড়ার মতন পড়ে থাকতে হবে। সেভাবেই বা কতক্ষণ বাঁচব জানি না। চন্দ্রবোড়ার মার্বেলের মতন চোখ দুটি মনে হল আমার মাথার ওপর। ফণাটা এদিক থেকে ওদিকে দুলছে। ছোবল মারার আগের অবস্থা।

"মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে নস্যির কৌটোটা বের করে নিলাম। দারুণ কড়া নস্যি।

"আচমকা কৌটোটা খুলে সব নস্যি উপুড় করে দিলাম চন্দ্রবোড়ার মুখের ওপর। অনেকে বলে, সাপের নাক নেই। একেবারে বাজে কথা। নস্যি উপুড় করার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রবোড়ার হাঁচি শুরু হল।

NOT FOR SALE

গুণে গুণে একত্রিশটা হাঁচি। প্রত্যেকটি হাঁচির সঙ্গে চন্দ্রবোড়ার মুখ থেকে তরল বিষ বের হতে লাগল। "প্রথমে গাঢ় নীল রঙের। তারপর ক্রমে ক্রমে ফিকে হতে লাগল। শেষদিকে জলের মতন রঙ। তার মানে বিষ নেই। এবার শ্লেষ্মা উঠছে।

"আর দেরি করিনি। চন্দ্রবোড়ার মাথাটা মুঠোর মধ্যে ধরে আছাড়ের পর আছাড়। বার কয়েক আছাড় মারতেই দড়ির মতন সোজা হয়ে গেল।"

হঠাৎ তাপ্পিদা হাতঘড়ির দিকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "সর্ব্বনাশ, বারোটা বেজে গেছে। আজ খাওয়া মিললে হয়।"

তাপ্পিদা পাশে রাখা সাইকেলে উঠে পড়ল।

———

NOT FOR SALE

জ্যোতিষীর কাহিনী

তোমরা এতদিন নানারকমের গল্প শুনেছ, ভূতের গল্প, ডাকাতের গল্প, শিকারের কাহিনী।

এতদিন যা সব তোমাদের শুনিয়েছি সেগুলো নিছক মনগড়া ব্যাপার। কোনটা অর্ধেক সত্যি, অর্ধেক কল্পনা, খাঁটি নিখাদ সত্যি কথা একটাতেও ছিল না।

কিন্তু এবার যে কাহিনী তোমাদের শোনাব তাতে মিথ্যার কণামাত্র নেই। সবটাই বাস্তব। আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা।

গত শীতের শেষে রাঁচী গিয়েছিলাম বেড়াতে। একটু বিশ্রাম করার উদ্দেশ্যে। স্টেশন আর ডোরান্ডার মাঝামাঝি জায়গায় হোটেল মিডল্যান্ড। চারদিকে ঝাউগাছ ঢাকা নিরিবিলি সব কামরা। সকালে লনে বেতের চেয়ার পেতে চুপচাপ বসে থাকি। দুপুরবেলা ট্যাক্সি ভাড়া করে এক একদিন এক এক জায়গায় ঘুরে আসি। কোনদিন বা হুড্রু, কোনদিন বা জোনা, কোনদিন দশম, এই তিনটি জলপ্রপাত, একদিন রাজরাপ্পায় ছিন্নমস্তার মন্দির, আবার কাঁকে কিংবা ধুরুয়া।

দিন দশেকের মধ্যেই দর্শনীয় সব জিনিস দেখা হয়ে গেল। সময় আর কাটে না। বিকেল হলে রাস্তা ধরে ডোরান্ডা কিংবা চকের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করি। পা টন-টন না করা পর্যন্ত। ফিরি সাইকেল রিক্‌শায়।

এমনই সময় হোটেলের ম্যানেজার করালীবাবু বললেন, এখানকার হাট দেখছেন স্যার?

দুবার পড়া খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছিলাম। মুখ তুলে বললাম, হাটে আর কি দেখবার আছে?

আছে স্যার। আশেপাশের গাঁ থেকে গরুর গাড়ি করে শাকসবজি, ফলপাকুড়, নানারকম বাড়িতে তৈরী জিনিসপত্র আসে, যান না, আপনার ভালই লাগবে। ঐখানে চেক আর রাশিয়ানরা খুব আসে, তাদের জন্য জিনিসপত্র কেনাই দায়।

NOT FOR SALE

অন্য কোন উদ্দেশ্য নয় নিছক সময় কাটানোর জন্যই বললাম ঠিক আছে। হাট দেখে আসব একদিন। কোথায় হাট বসে?

আমার অজ্ঞতায় করালীবাবু রীতিমত বিস্মিত হলেন। অনন্তপুরের হাট বসে এইতো হোটেলের পিছনে। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যে মাঠটা রয়েছে, সেখানে। কাল সকালেই হাটবার।

হাটে যাবার আগে পর্যন্ত ভেবেছিলাম একরাশ, ফলপাকুড়, তরিতরকারী, পুঁতির মালা, মাটির হাঁড়ি, বেতের মোড়া এইসব দেখব, সেই সঙ্গে প্রচন্ড দেহাতী গণ্ডগোল।

মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারিনি হাটের মধ্যেও এত বড় বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ভোর হতেই বের হয়ে পড়লাম। এখনও এখানে বেশ শীত রয়েছে। কলকাতার বাবুদের পক্ষে তো রীতিমত ঠান্ডা। আপাদমস্তক গরম কাপড়ে আবৃত করলাম। বাড়তির মধ্যে শুধু হাতে নিলাম একটা লাঠি। সব হাটেই অল্প বিস্তর কুকুরের আমদানী হয়। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য লাঠি একটা দরকার।

হাটের মধ্যে গিয়ে কিন্তু ভালই লাগল। প্রচুর তাজা ফলপাকুড়ের স্তূপ। একদিকে নানা রকমের পাখি, খরগোশ, আর গিনিপিগ। গোটা কয়েক ময়ূরও রয়েছে।

যারা বিক্রি করছে তারা বেশির ভাগই আদিবাসী মেয়েছেলে।

ঘুরতে ঘুরতে আনাজের এলাকায় গেলাম।

রাঁচীর পেঁপে বিখ্যাত। এক জায়গায় দেখলাম গরুর গাড়ি বোঝাই পেঁপে মাটিতে ঢালা হয়েছে আর আধা বয়সী একজন মেয়েছেলে একটা কাঠের মাচার ওপর বসে পেঁপে বিক্রি করছে।

পেঁপে কেনার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কেনবার আগেই ব্যাপারটা ঘটল।

একজন বাঙালী ছোকরা অনেকক্ষণ বাছাবাছি করে গোটা দুই পেঁপে কিনল। পেঁপে দুটো ঝুড়িতে রেখে মেয়ে ছেলেটির হাতে একটি পাঁচ টাকার নোট দিল।

গুণে গুণে পয়সা ফেরত দিতে গিয়েই আদিবাসী মেয়েটি চমকে উঠল।

বাঙালী ছোকরাটির দিকে চেয়ে বলল, এই বাবু, তুই আজ বেরিয়েছিস কেন?

NOT FOR SALE

কেন, বেরিয়েছি তো কি হয়েছে? ছোকরাটির মেজাজ গরম হয়ে উঠল।

কিসে এসেছেন? পা গাড়িতে?

হ্যাঁ, সাইকেলে। কেন?

যাবার সময় পা গাড়িতে যাসনি যেন। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যা।

ছোকরাটি ভ্রূক্ষেপও করল না। বাকি পয়সা ফেরত নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঠিক পাশেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা আমার বেশ একটু অস্বাভাবিক ঠেকল। ছোকরাটি চলে যেতে আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। আদিবাসী মেয়েছেলেটির কাছে গিয়ে বললাম, ও ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বললে কেন?

আমার দিকে আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে স্ত্রীলোকটি নিজের কপাল চাপড়াল। সবই অদৃষ্ট বাবুজী। মানুষ আর কি করবে?

তার মানে?

ছেলেটির হাতের লেখাগুলো ভাল ঠেকল না। সামনে ভারি একটা বিপদ আছে।

রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম। ছোকরাটি পয়সা ফেরত নেবার জন্য কিছুক্ষণের জন্য নিজের ডান হাত প্রসারিত করেছিল, তার মধ্যেই স্ত্রীলোকটি মোক্ষমভাবে তার করলেখা পাঠ করে ফেলল। নিতান্ত বুজরুকী। এছাড়া আর কিছু নয়।

আর দাঁড়ালাম না। হাট পার হয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। টেবিলের ওপর সেদিনের খবরের কাগজটা রেখে গেছে এখনও পড়া হয়নি। লনে বসে কাগজটার পাতায় মনোনিবেশ করলাম।

বোধহয় আধঘণ্টা কিংবা তারও কম হবে। হঠাৎ হোটেলের চাকর-বাকরদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। সবাই যে যার কাজ ফেলে বাইরে ছুটছে।

হাটবারে কিছু গোলমাল লেগেই থাকে। অনেক সময় গাড়ি থেকে গরু খুলে গিয়ে আনাজপাতিতে মুখ দেয়। তাই থেকে প্রথমে বচসা, তারপর হাতাহাতি।

সেই রকম কিছু একটা হয়েছে ভেবে আবার কাগজে মন দিলাম। কিন্তু গোলমালটা ক্রমেই যেন বাড়ছে।

NOT FOR SALE

করালীবাবু এদিকে আসছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার করালীবাবু। এত গোলমাল কিসের?

একটা দুর্ঘটনা হয়েছে স্যার। লরির সঙ্গে ধাক্কা। এ স্যর সপ্তাহে একবার তো হচ্ছেই। লরিগুলোকে আমি কি বলি জানেন? যমদূত।

করালীবাবু আর দাঁড়ালেন না। হন হন করে নিজের কক্ষে চলে গেলেন।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। হাতের কাগজটা রেখে ধীর পায়ে রাস্তার দিকে এগোলাম।

প্রায় হোটেলের সামনেই। একটা লরিকে কেন্দ্র করে জমাট ভিড়।

একজনকে ডেকে ঘটনাটি জানতে চাইলাম।

লোকটি রীতিমত উত্তেজিত। লরিওয়ালা আর লরির চালকদের বাপান্ত করল। ব্যাপারটা বোধগম্য হল না।

পায়ে পায়ে আরো একটু এগিয়ে গেলাম। রাস্তার পাশে অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে। কতকগুলো লোক ধরাধরি করে একজনকে তুলছে।

ফাঁক দিয়ে দেখতে অসুবিধা হল না। দেখবার সঙ্গে সঙ্গে মেরুদন্ড বেয়ে একটা শীতল প্রবাহ বয়ে গেল। মাথাটি ঘুরে গেল। চোখের সামনে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার।

খুব আস্তে হোটেলে ফিরে এলাম। বেতের চেয়ারের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ইঙ্গিতে একটা বেয়ারাকে কাছে ডেকে এক গ্লাস জল চাইলাম।

জল পান করে অনেকটা সুস্থ হবার পর মনে মনে সব কিছু বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। সারা মুখে চাপ চাপ রক্ত। খুলিটা বেরিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পরনের জামাকাপড় টুকটুকে লাল। আসবার সময় একপাশে পড়ে থাকা গুঁড়িয়ে যাওয়া সাইকেলটা নজরে পড়ল।

আশ্চর্য ভবিষ্যৎবাণী। শহরের মতন সাইনবোর্ড সাজানো, বিজ্ঞাপনের চুমকি দেওয়া কোন জ্যোতিষী নয়, একেবারে অশিক্ষিতা, সাধারণ স্তরের আদিবাসী স্ত্রীলোক। এক পলকে হাতের লেখা দেখেই এমন অমোঘ সত্য উচ্চারণ করবে, এ যেন ধারণারও অতীত।

কাউকে কোন কথা বললাম না। কি জানি অনেকে হয়তো বিশ্বাসই করবে না। কেউ কেউ কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেবে।

NOT FOR SALE

শুধু করালীবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, করালীবাবু। অনন্ত হুরের হাট আবার কবে?

করালীবাবু বললেন, আজ মঙ্গলবার হাট হয়ে গেল, আবার হাট হবে সামনের শনিবার। কেন, আজ আপনি যাননি হাটে?

হ্যাঁ গিয়েছিলাম, তবে কিছু কেনা হয়নি।

শুনুন স্যার, রাঁচীর আদিবাসীদের তৈরি বিছানার ঢাকা হচ্ছে বিখ্যাত। যেমন সস্তা, তেমনই টেঁকসই। আমি যে একেবারে সময় পাই না। নইলে আপনার সঙ্গে গিয়ে কিনে দিতাম।

আমি আর বেশী আগ্রহ প্রকাশ করলাম না। করালীবাবু সঙ্গে না যাওয়াই ভাল। কথাটা গৃহিনীকেও বললাম না। এক কান থেকে আর এক কান হতে আর কতক্ষণ।

শনিবার দিন পর্যন্ত কোন রকমে ধৈর্য্য ধরে রইলাম।

শনিবার ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। হাটে ক্রেতাদের ভিড় হবার আগে।

আমার উদ্দেশ্য সফল হল। স্ত্রীলোকটি একেবারে একা। এক মনে উলের কি একটা বুনছে।

কাছে গিয়ে কোন রকম ভণিতা না করেই বললাম, সেই ছেলেটি লরি চাপা পড়ে মারা গেছে।

স্ত্রীলোকটি চমকাল না। কোনরকম উদ্বেগ প্রকাশ করল না। আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখে শুধু বলল, এ যে হতেই হবে বাবুজী। আমি যে স্পষ্ট দেখলাম আর ঘণ্টা দেড়েক মাত্র পরমায়ু আছে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু তাও লেখা আছে।

স্ত্রীলোকটি আবার বোনায় মন দিল।

আমি একেবারে তার খুব কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালাম। অনুনয়ের সুরে বললাম, আমার হাতের লেখা একটু দেখে দেবে?

কি হবে বাবু ভবিষ্যৎ জেনে? অন্ধকার গুহায় যে লুকিয়ে আছে, তাকে টেনে বাইরে এনে লাভ কি?

লাভ লোকসানের তর্ক করে সময় নষ্ট করতে মন চাইল না। শুধু বললাম, তা হোক, তুমি দু-একটা কথা অন্তত বল।

NOT FOR SALE

স্ত্রীলোকটি ঘাড় ফেরাল। আমার প্রসারিত হাতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিল মিনিট পাঁচেক, তার বেশী নয়। তারপর বলল, আচ্ছা বাবুজী, দুটো কথা শুধু বলছি। যদি ঘটে, পরে আসবেন। ভাল করে সব বিচার করব।

কি দুটো কথা?

আপনার ছেলেমেয়ে সঙ্গে এসেছে।

হ্যাঁ, স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাই এসেছে।

ছেলেমেয়েদের ক'দিন একটু সাবধানে রাখবেন। রক্তপাতের আশঙ্কা আছে। তবে মারাত্মক হবে না।

আর একটা?

আর একটা ভাল কথা। শীঘ্র আপনার কিছু অর্থলাভ হবে। অর্থ আসবে উত্তর ভারত থেকে।

শুনলাম। আরো দু-একটা প্রশ্ন করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ক্রেতার ভিড় হওয়ায় উঠে পড়লাম।

হোটেলে গিয়ে কাউকে কিছু বললাম না। হয়তো স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা অযথা ভয় পাবে। তবে সব সময়ে ছেলেমেয়ের সঙ্গে সঙ্গে রইলাম। বেড়াতে যেতাম একসঙ্গে, গল্প-গুজব একসঙ্গে, তাদের একলা কোথাও এমন কি রাস্তার ওপারের দোকানেও যেতে দিতাম না।

দিন পনেরো কেটে গেল, অমঙ্গলজনক কিছু হল না।

প্রায় কলকাতার ফেরার সময় কাছে এসে গেল। আর দিন সাতেক। কিছু কিছু গোছগাছও শুরু করে দিলাম।

এমন সময়ে হোটেলে আমাদের একেবারে পাশের রুমে মিস্টার চৌধুরী স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে উঠলেন।

মিস্টার চৌধুরী আমার পূর্ব পরিচিত। মিসেস চৌধুরী আমার স্ত্রীর পুরনো বন্ধু। তাঁদের মেয়ে বাপী আমার ছেলেমেয়ের খুব অনুরক্ত।

মিস্টার চৌধুরী ছাড়লেন না। গাড়ি যোগাড় করে আবার হুড্রু অভিযানের ব্যবস্থা করলেন। আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নিরুপায় হয়ে সম্মতি দিতে হল।

হুড্রুতে পৌঁছে আমি নিজে ছেলের একটা হাত ধরলাম। মেয়েটি এমনিতে শান্ত। সে একবার দেখেছে বলে মোটরেই বসে রইল।

NOT FOR SALE

বড় বড় বিকটাকৃতি কালো কালো পাথর। খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়। আমি ছেলেকে ধরে একটা মসৃণ পাথরের ওপর বসে পড়লাম।

মিনিট কয়েক। হঠাৎ সামনের আর একটা পাথরে বিচিত্র রং-এর একটা পাখি এসে বসল। আমার ছেলে সেই পাখির ছবি ক্যামেরায় তোলবার জন্য আচমকা আমার হাত ছাড়িয়ে ছুটে এগিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম নিয়তির গতি কেউ রোধ করতে পারে না। পারা সম্ভব নয়। আমি যখন চোখ খুললাম, দেখলাম মিস্টার চৌধুরী, মোটরের ড্রাইভার, আর একটি লোক সাবধানে আমার ছেলেকে ওপরে নিয়ে আসছে। ছেলের কনুইয়ের পাশ দিয়ে, হাঁটু দিয়ে তাজা রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে।

তখনই ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হল। বরাতজোর, আঘাত খুব বেশি নয়। দিন চারেকের মধ্যে ছেলে সেরে উঠল। তবে কনুইয়ের কাছে একটা দাগ রয়ে গেল।

ঠিক পাঁচ দিনের দিন পিয়ন গিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল।

এখানেও আমার কিছু সন্দেহ ছিল, কারণ আমার যা কিছু পাওনা প্রকাশকদের কাছ থেকে এবং তাঁরা সবাই কলকাতার বাসিন্দা। তাঁদের কাছে আমার কোন পাওনাও ছিল না।

পিয়নকে জিজ্ঞাসা করলাম, টাকা কোথা থেকে আসছে?

পিয়ন বলন, বেনারস থেকে। বারানসী সাহিত্য প্রকাশ।

সই করে টাকা নিলাম। দেখলাম আমার একটা বাংলা বই-এর হিন্দি অনুবাদ স্বত্ব বাবদ টাকা পাঠাচ্ছে। মনিঅর্ডার আমার কলকাতার বাড়ি ঘুরে রাঁচী এসেছে।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

স্ত্রী বলল, কি হল? কি ভাবছ?

কি ভাবছি এতদিন পরে তাকে বললাম। শুনে একেবারে লাফিয়ে উঠল, আশ্চর্য লোক তো, কথাটা একেবারে চেপে গেছ, আমাকে কিছু বলনি। চল, এই শনিবার আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আমার হাতটাও দেখাব।

শনিবার সস্ত্রীক হাটে গিয়ে হাজির হলাম। যেখানে স্ত্রীলোকটি বসে সেখানে আর একজন বসেছে। পেঁপে নয়, শাকপাতা, লাউ নিয়ে।

NOT FOR SALE

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। বলল সে জানে না, বুধিয়া আসেনি, তাই সে তার জায়গায় বসেছে।

বুধিয়ার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলাম।

বলল, এরোড্রামের কাছে যে ফুলঝর বস্তি, সেখানে থাকে বুধিয়া। উঠোনে একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছ আছে। চিনতে অসুবিধা হবে না।

রবিবার আমায় কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। কাজেই হাতে আর সময়ও নেই। যাবার আগে বুধিয়ার সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়ার ইচ্ছা হল।

একটা সাইকেল রিক্‌শা ধরলাম। ডোরান্ডার মধ্য দিয়ে রিক্‌শা ছুটল।

এরোড্রামের কাছে গিয়ে বুধিয়ার বাড়ি চিনতে মোটেই অসুবিধা হল না। উঠানের অশ্বত্থ গাছের জন্য নয়, তার বাড়ির সামনে লোকের ভিড়।

স্ত্রী বলল, দেখ বাড়িতে হাত দেখাবার জন্য কি রকম ভিড় হয়, ওই ভিড় ঠেলে আমরা কি আর ওর কাছে যেতে পারব।

সেদিন সত্যি বুধিয়ার কাছে পৌঁছাতে পারিনি।

জমে থাকা লোকগুলোই খবর দিল।

সকালে বুধিয়া গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এখনও লাশ নামানো হয়নি। পুলিশে খবর গেছে। তারা এসে ব্যবস্থা করবে। বাবুজীর কি দরকার?

পেঁপের দাম বাকি ছিল।

পকেট থেকে দু-টাকার একটা নোট বের করে সামনের লোকটার হাতে দিয়ে সাইকেল রিক্‌সায় ফিরে এলাম।

সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এলাম, বুধিয়া অন্য সকলের হস্তরেখা এমন নিখুঁত বিচার করে, আর নিজের হাতের রেখাগুলোই দেখতে ভুলে গেল। তা যদি দেখত! তাহলে এভাবে বোধহয় নিজের জীবন শেষ করে দিত না।

কিংবা হয়তো ভাগ্যরেখা পরিবর্তিত করা যায় না। ভবিষ্যৎ অমোঘ, নিজের প্রাণ হরণ করেই বুধিয়া, সেটা প্রমাণ করে দিয়ে গেল।

———

NOT FOR SALE

পাকসিদ্ধ

মরিয়া হয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। সকল প্রকার রন্ধনে পারদর্শী পাচকের প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতা অনুসারে।

এ ছাড়া উপায় ছিল না। আগে যে পাচকটি ছিল, সেটি এসেছিল বারো বছর বয়সে, গেল বাইশে। একটানা দশ বছর এক বাড়িতে কাজ করা প্রায় রেকর্ড। এ রকম নজির আশেপাশে বেশি দেখিনি। মাঝখানে মাস খানেকের জন্য ছুটিতে গিয়েছিল। সে যাওয়াই কাল হল। টেলিগ্রাম এসেছিল বাপ খাবি খাচ্ছে, পাচক কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছাড়ল কিন্তু ফিরল হাসতে হাসতে। কি ব্যাপার? না, বাপ নয়, খাবি খাচ্ছিল চৌত্রিশ বছরের ভাবি বধূ পাচকের আশায়। একেবারে বিয়ে করে বাড়ি ফিরেছে।

ভাল কথা। বয়স হয়েছে, বিয়ে করা দরকার বই কি। কিন্তু দু'দিনের মধ্যে কড়ায় ঝোল চাপিয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

গৃহিণী ছুটে গেলেন রান্নাঘরে।

কি হল রে?

কোন কথা নেই। ঝোলের মসীকৃষ্ণ বর্ণের দিকে চায় আর চোখের জলে বুক ভাসায়। অনেক ধরাধরির পর আসল কথাটা ভাঙল।

ঝোলের রং দেখে 'বহু'র কথা মনে পড়ে গেল, যাকে বিহারের এক গণ্ডগ্রামে ছেড়ে এসেছে।

গভীর দর্শনের কথা। একের মধ্যে 'বহু' রূপ নিরীক্ষণ। অর্থাৎ, ঝোলের মধ্যে। গৃহিণী অনেক বুঝিয়ে এলেন। কিন্তু ফল হল না। কড়ার ঝোল, কড়ায় রইল। পাচক কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে পড়ল।

চোখের জলে ঝাপসা দৃষ্টি, সঠিক দেখতে পাবার কথা নয়। তাই যাবার সময় ভুল করে নিজের গেঞ্জি ভেবে আমার প্রায় নতুন পাঞ্জাবিটা, আর গৃহিণীর ধোপার বাড়ি থেকে আসা একটা ভাল শাড়ি বগলে করে নিয়ে গেল।

তারপর থেকেই মারাত্মক অবস্থা। সংসার প্রায় অচল। বাড়তে বাড়তে গৃহিণীর ওজন প্রায় তিন মণের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। বসতে হাঁপান, উঠতে

NOT FOR SALE

হাঁপান। রান্নাঘরে আগুনের তাতে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায়। ফলে, দিনের মধ্যে দশবার বলেন, রইল তোমার এ ঘর দুয়ার।

বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। কিন্তু সুবিধা হয়নি। কেউ একটি লোক দিয়েছে, কিন্তু সে লোক তেরাত্রি টেকেনি।

এই বন্ধুই বললে, ওসব প্রাচীন প্রথা ছেড়ে দাও। একে তাকে বলে কোন লাভ নেই। কাগজে বিজ্ঞাপন দাও। নিজে বেছে লোক নিতে পারবে।

তাই করলাম। এক সাহিত্যিক বন্ধুকে দিয়ে খসড়া তৈরি করে সোজা কাগজের অফিসে দিয়ে এলাম। নগদ আট টাকা বের হয়ে গেল, কিন্তু আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম এই ভেবে যে এবার নিজে বাছাই করে নিতে পারবো।

দিন দশেক কোন সাড়াশব্দ নেই।

এদিকে বাড়ীতে জীবন দুর্বহ হয়ে উঠছে। যতটা সম্ভব পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। পারতপক্ষে গৃহিণীর সামনে আসি না। এতদিনে শবরীর প্রতীক্ষার অবসান হল।

ভৃত্য খবর আনল, নীচে একটি ভদ্রলোক এসেছেন। খবরের কাগজে কি বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে বাড়ির কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ভদ্রলোক? একটু বিস্মিত হলাম, তারপর ভাবলাম ব্যাপারটা নিজের চোখেই একবার দেখে আসি। নীচে নেমেই অবাক হয়ে গেলাম।

পরনে ফর্সা পাজামা-পাঞ্জাবি। পায়ে পাম্পশু। চুলে অ্যালবার্ট। এসব অবশ্য ইদানীং অনেক পাচকেরই অঙ্গের ভূষণ, কিন্তু অবাক হলাম বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ আর অভিজাত চেহারা দেখে। বললাম, কি ব্যাপার?

একটা পাচকের জন্য বিজ্ঞাপন কি আপনি দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

আমি সেই বিজ্ঞাপন পড়েই এসেছি।

আপনি? কণ্ঠস্বরে বোধহয় একটু বিস্ময় প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

লোকটি মাথা নীচু করে বলল, হ্যাঁ, আমি। অবশ্য যে ধরনের পাচক সাধারণত: এ শহরে কাজ করে, আমি সে জাতের নই। আমি আফ্রিকায় বহুদিন ছিলাম। মোম্বাসা, নাইরোবি আর ডারবানে। বড় বড় রাজপরিবার আর ভারতীয় বণিকদের বাড়ি কাজ করেছি।

NOT FOR SALE

কিন্তু আমাদের মতন লোকের বাড়িতে— আমি একটু সন্দেহ প্রকাশ করলাম।

কি যে বলেন? লোকটি বিনয়ে ঘাড় হেঁট করে ফেলল, আজকাল আর রাজ-রাজড়া পাচ্ছি কোথায়? তাছাড়া বিদেশে থাকতে আর ভাল লাগল না স্যার। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের ছেলে দেশে ফিরে আসাই উচিত।

আমি মাইনে তো খুব বেশি দিতে পারব না। কাজও আমার কম, স্বামী-স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে।

ত্রিশ টাকা দেওয়া কি আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না?

ত্রিশ টাকা, তা ত্রিশ টাকা দিতে পারি। লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ কথাবার্তা দেখে দরদস্তুর করতে আর সাহস হল না।

ব্যস, তাহলেই হবে। আমি থাকব। সত্যি কথা বলতে কি, পয়সার আমার খুব প্রয়োজনও নেই। বিদেশে থাকতে কিছু জমিয়েছি। শুধু এতদিনের শেখা একটা আর্ট অনভ্যাসের জন্য ভুলে যাব, তাই একটা চাকরি করা। আমার নাম অমূল্য ভট্টাচার্য। আদি নিবাস অন্দর কিল্লা চট্টগ্রাম। খালাসীর চাকরি নিয়ে আফ্রিকা গিয়েছিলাম, তারপর জাহাজ ছেড়ে হাতাবেড়ী ধরেছি।

অমূল্য রয়ে গেল। প্রথম দুদিন রান্না করল না। গৃহিণীর সঙ্গে সঙ্গে রইল। বলল, বহুদিন বাঙালীর রান্নার সঙ্গে পরিচিত নই, আসলে মূল কথা তো এটাই। রসনার পরিতৃপ্তির চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, শরীরের উন্নতি। বুঝতেই পারছেন, গাঁদাল পাতার ঝোল আর নিম পাতা ভাজা, শুক্তা, এসব জিভের পক্ষে খুব সুস্বাদু নয়, কিন্তু শরীরের পক্ষে উপকারী। রাঁধুনীকে সেইদিকেই বেশি নজর রাখতে হবে।

একশ বার। ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

অমূল্য রান্নার ভার নিল তিন দিনের দিন।

একটা মস্ত বড় সুবিধা, অফিসের তাড়া নেই। নিজের কারবার। একটার আগে বেরোতে হয় না। কাজেই সকালে ধীরে-সুস্থে রান্না করলেই চলবে। ছেলেমেয়েরা ছোট। এখনও বাড়িতেই পড়ে।

সাড়ে বারটায় খেতে বসলাম। বসেই আছি। অমূল্যর দেখা নেই। স্ত্রী তিনতলায়। ঠাকুর ঘরে। চেঁচিয়ে বললাম, কি হল অমূল্য?

যাই স্যার। রান্নাঘর থেকে অমূল্য উত্তর দিল। মিনিট পনের পরে ভাতের

NOT FOR SALE

থালা নিয়ে ফুঁ দিতে দিতে অমূল্য এসে দাঁড়াল। থালাটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, গ্যাসে রান্না করা চিরকাল অভ্যাস কিনা, এসব উনানে ভারি কষ্ট হয়। তাপটা রেগুলেট করতে পারি না স্যার।

কিছু বললাম না। বলবার মতন অবস্থা তখন নেই। একদৃষ্টে থালার দিকে চেয়ে আছি। এক থালা ভাত প্রায় পাঁকের সামিল। মনে আছে, একবার দাঁতের যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম, গৃহিণী এইরকম গলা ভাত করে দিয়েছিলেন।

অমূল্য ডালের বাটি এনে পাশে রাখল। একটা মাছ ভাজা। দু এক গ্রাস মুখে দিয়ে বলেই ফেললাম, অমূল্য, ভাতটা যে কেমন কেমন মনে হচ্ছে।

একটু গলিয়ে দিয়েছি স্যার। এই বয়সে একটু গলা খাওয়া ভাল।

আর একটু হলে গ্রাস গলায় বাধত। বিগলিত হওয়ার কথা কি বলল অমূল্য? মানে?

মানে আস্তে অস্তে বয়স হয়তো মানুষের। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর শক্তিও কমে অসে। তখন গলা ভাত পরিপাকের সহায়তা করে। হয়তো জিভে বিস্বাদ লাগবে স্যার কিন্তু শরীরের পক্ষে ভারি উপকারী।

কিছু বললাম না। বলার কিছু ছিল না। মাথা নিচু করে খেতে লাগলাম।

অমূল্য টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে বলল, নিক্রুসিকার নাম শুনেছেন স্যার?

নিক্রুসিকা— ওই নতুন যে গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে সাইবেরিয়ার আকাশে? আন্দাজে ঢিল ছোঁড়বার চেষ্টা করলাম।

না স্যার, ডাক্তার নিক্রুসিকা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত পাকস্থলী বিশারদ। তাঁর কাছে আমি পাঁচ বছর কাজ করেছি। তিনি তো ভাত একটু শক্ত হলে ক্ষেপে উঠতেন। তিনি খাইতেন একেবারে পায়সের মতন গলা ভাত— দাঁত যাতে ব্যবহার করতেই না হয়। বলতেন, ওতে পাকস্থলীর কাজ সহজ হয়। এই যে চারিদিকে 'গ্যাস্ট্রিকে'র হিড়িক চলেছে, এর জন্য দায়ী শক্ত ভাত।

আর দ্বিরুক্তি না করে ভাতগুলো ডাল দিয়ে দ্রুত মেখে নিলাম। মাছ খাবার মুখে বিপত্তি, একটু যেন কাঁচা রয়েছে। ইতস্তত করে বললাম, মাছটা যেন কি রকম লাগছে?

একটা দিক ভাজিনি স্যার। বেশি ভাজলে পদার্থ তো আর কিছু থাকে না। ভিটামিন একেবারে খতম। দেখুন না, বাঙালীরা যা মাছ খায়, তাতে পৃথিবীর

NOT FOR SALE

মধ্যে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী জাত হবার কথা। প্রোটিন, আর ফসফরাস কম যায় পেটে! কিন্তু ওই বেশি ভাজার দোষে গুণ সব নষ্ট হয়ে যায়। কাঁচা খেতে পারলে খুবই ভাল স্যার। কিন্তু একেবারে তো পারবেন না। দেখি আস্তে আস্তে যদি অভ্যাস করাতে পারি।

অমূল্য সেখান থেকে সরে যেতেই চট করে মাছটা বাটি চাপা দিয়ে দিলাম। চোখে না পড়ে। পড়লেই তখনই ডাক্তার নিক্রুসিকার উদাহরণ দেওয়া শুরু হবে।

———

NOT FOR SALE

শিয়ালকাঁটা

প্রথমে কয়লার ডিপো, তারপর চায়ের দোকান, কিন্তু পর পর দুটোই লাটে উঠল খদ্দেরদের অতিরিক্ত আনুকূল্যে। অতিরিক্ত আনুকূল্য অর্থাৎ জিনিস নিয়ে পরে দাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন চেষ্টাই খদ্দেররা করত না।

সবশেষে তেলের কল। অবশ্য এটাও ঠিক এভাবে আরম্ভ হয়নি। ছোট একটা দোকান। টিনের দেয়াল, টিনের চাল, ভিতরে গোটা দশেক তেলের পিপে। কোণের দিকে একটা নড়বড়ে চেয়ার, তার চেয়েও বেশি নড়বড়ে একটা টেবিল। চেয়ারের ঠিক ওপরে ফ্রেম বাঁধানো, না, ঠাকুরদেবতার কোন ছবি নয়, মহাপুরুষদের ফটো নয়, সাদা কাগজের ওপর লাল অক্ষরে বড় বড় করে লেখা:

আজ নগদ কাল ধার।

চেয়ারে বসত সত্যসুন্দর সাধুখাঁ। এবার সাধুখাঁ বেশ চালাক হয়ে গেছে। কোন খদ্দের বাকির অনুরোধ জানালেই, হাত তুলে ওপরের লেখার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

ওটা কি রঙে লেখা দেখেছেন তো?

খদ্দের একবার চোখ বুলিয়ে দেখে বলে, লাল রঙের। হুঁ, আপনাদের অনুরোধ রাখতে হলে আমাকে ওই রঙের বাতি টাঙাতে হবে দোকানের সামনে। কারবার তুলে দিতে হবে আমাকে। মাপ করবেন মশাই।

সাধুখাঁ হাতজোড় করছে।

এতে কাজ হয়েছে। কয়েকটা খদ্দের আড়ালে দোকানের নিন্দা করেছে সাধুখাঁর বদনাম, কিন্তু দোকানে বাকি পড়েনি।

ফলে, বছর দশেকের মধ্যে সত্যসুন্দর সাধুখাঁ তিনটে তেলকলের মালিক হয়ে গেল। বাড়ি হল, গাড়ি হল, প্রতিপত্তি তো হলই।

NOT FOR SALE

সত্যসুন্দরের এক ছেলে। তাকে লেখাপড়া শেখাবার কোন চেষ্টাই হল না। কারণ সাধুখাঁ নিজে লেখাপড়ায় বিশ্বাসী ছিল না।

তার নিজের লেখাপড়ার পরিধি মোটেই বেশিদূর নয়। প্রহ্লাদ তবু স্বরবর্ণ শেষ করে 'ক'তে গিয়ে কেঁদে খুন হয়েছিল। 'ক'-এর কৃষ্ণ স্মরণ করে। সাধুখাঁ 'অ'-এতেই কাত। পণ্ডিতমশাই তার পরের কোন অক্ষর আর চেনাতে পারেনি। প্রথম ভাগটা পণ্ডিতমশাইয়ের কোলে ফেলে দিয়ে সাধুখাঁ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এসেছিল। তাকে আর টোলমুখো করা যায়নি।

সাদুখাঁর ধারণা, লেখাপড়া শিখলেই ছেলে আর এ ধরনের ব্যবসা করতে চাইবে না। অফিসে ঢোকবার বায়না করবে।

এসব তেলের ব্যবসায় ইজ্জত যাবে। ব্যবসা ভালই চলছিল, নতুন এক আবিষ্কারে ব্যবসা আরও ফলাও হয়ে উঠল।

ছেলেবেলায় সাধুখাঁ ঠাকুমার মুখে এক ছড়া শুনেছিল :

ছিল শিয়ালকাঁটার বন,
কেটে করল সিংহাসন।

শিয়ালকাঁটার বনের সঙ্গে সিংহাসনের রহস্য কিভাবে জড়িয়ে আছে, ছেলেবেলায় বুঝতে পারেনি, কিন্তু এতদিনে পারল।

পারল মানে, তাকে বোঝাল ছোকরা কেমিস্ট শশধর ঘোষাল। ছোকরা দেখা করে প্রায় দু ঘণ্টার ওপর রইল সাধুখাঁর প্রাইভেট চেম্বারে। বেরোবার সময় করকরে কয়েকখানা নোট আর একটা মোটা মাইনের নিয়োগপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এরপর সাধুখাঁ ছেলেকে ডেকে পাঠাল। ছেলেকে সব বলতেই ছেলে আঁতকে উঠল।

তখনও বেচারী ব্যবসায় বিশেষ পোক্ত হয়নি। বলল, কিন্তু বাবা, এতে খারাপ ফল হবে না তো? সাধুখাঁ মাথা নাড়ল, খারাপ ফল আর এমন কি হবে। চোখের একটু গোলমাল হতে পারে আর পা, পা ফোলা এই তো। শশধর তো এই দুটো কথাই বলে গেল তাহলে? তাহলে আবার কি! পৃথিবীতে কার দৃষ্টি স্বচ্ছ বলতে পারো বাবা। সবাই তো আমরা অল্পবিস্তর চোখের অসুখে ভুগছি। ঠিক জিনিসকে ঠিকভাবে দেখছি কই। তারপর পা ফোলা? পদবৃদ্ধির সঙ্গে তেলের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। চিরকাল পদবৃদ্ধি সকলেরই

NOT FOR SALE

কাম্য। পায়াভারি লোকই পৃথিবীর সম্পদ। তাছাড়া নিজের ফাউণ্ডেশন শক্ত করতে কে না চায়! তার ওপর আরো একটা কথা আছে কি? ছেলে একটু উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

বাংলাদেশে শশধরের অভাব নেই। অনেক তেলকলের মালিকের কাছেই ফরমূলা বিক্রি হয়ে গেছে, কাজেই সবাই এই পথে চলবে।

পাপ হবে না তো?

ছেলের বেরসিক উক্তিতে বাপ বিরক্ত হল। ভ্রূ কুঁচকে বলল, গীতায় শ্রীভগবান কি বলেছন জান? সংগ্রামে পাপপুণ্য বিচার করতে গেলে চলে না। আমাদের এ ব্যবসা তো জীবন সংগ্রাম ছাড়া আর কি!

অতএব লরি নিয়ে লোক ছুটল সাধুখাঁর দেশের বাড়িতে।

শিয়ালকাঁটার বন উজাড় হয়ে লরিতে চলল। বাড়তি টাকায় সাধুখাঁর বাড়ির দেয়াল ভরে গেল। টাকা ব্যাঙ্কে কিংবা সিন্দুকে রাখা বিপদ।

আয়করের চর ঘুরছে আনাচে-কানাচে। কাজেই বাড়ির দেয়ালে গোপন খুপরি করতে হয়েছে। সবই ঠিক চলছিল, হঠাৎ বিপদ হল। সকালবেলা লোক এসেছিল। সাধুখাঁর ভিটেয় আর শিয়ালকাঁটা একটিও অবশিষ্ট নেই।

এবার শিয়ালকাঁটার জন্য আরো দূরে যেতে হবে। অন্য জায়গায়।

সাধুখাঁ বলছে, কুছ পরোয়া নেই, যত দূর হোক, যত টাকা লাগে, শিয়ালকাঁটা আমার চাই। নিয়ে এস।

তারপর দুপুরের দিকে ফোন এল হরিহর অয়েল মিল থেকে।

একশ ব্যারেল সর্ষের তেল চাই। একেবারে বিশুদ্ধ। 'একেবারে বিশুদ্ধ'র অর্থ বুঝতে সাধুখাঁর মোটেই দেরি হল না।

গুদামে তখনই ফোন চলে গেল। টাকা নিয়ে তবে মাল ছাড়বে।

ব্যস, সেই শেষ কথা। ফোনের হাতল হাতেই রইল।

সত্যসুন্দর সাধুখাঁ গড়িয়ে পড়ল গদির ওপর। একটু দূরে কেরানীবাবুরা বসেছিল। তাঁরা হৈ হৈ করে উঠল। জলজ্যান্ত মালিক কথা বলতে বলতে এইরকম ডিগবাজি দিয়ে লুটিয়ে পড়ল কেন, ভেবেই কূলকিনারা পেল না।

খবর গেল ছেলের কাছে। সে আর এক তেলকলে বসে।

ছেলে ফিরল একেবারে ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে। ডাক্তার একবার সাধুখাঁর নাড়ি দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, এখনই আমার নার্সিং হোমে নিয়ে চলুন। দেরি হলে বাঁচানো যাবে না।

NOT FOR SALE

একেবারে তিনটে গাড়ি দরজায় মজুত ছিল। একটা সাধুখাঁর নিজের, একটা তার ছেলের, আর বাকিটা ডাক্তারের।

সাধুখাঁর ছেলের গাড়িতে সাধুখাঁকে ওঠানো হল। ডাক্তারের গাড়ি পিছন পিছন ছুটল।

নার্সিং হোম থেকেই বাড়িতে ফোন করে দেওয়া হল। সত্যভামা সাধুখাঁ মাত্র দিন তিনেক আগে নিউ মার্কেট থেকে হাল ফ্যাশানের ছাব্বিশটা শাড়ি কিনেছিল। মনজমানো পাড় আর চটকদার জমি। সে খবর পেয়েই শাড়ির গোছার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল।

ছেলের বৌ কাছে এসে সান্ত্বনা দিল। মা, আপনি অমন করছেন কেন? এখনও তো ডাক্তার সেরকম কিছু বলেননি।

সত্যভামা আশ্বস্ত হল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, যখন শাড়িগুলো কিনেছে তখনই দোকানের এক কোণ থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠেছিল— টিক, টিক, টিক।

এদিকে যমে-মানুষে লড়াই। ওষুধ আর ইনজেকশনের জন্য আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানীতে ট্রাঙ্ককল।

ডাক্তার বলল, ব্রেনটা বড্ড জখম হয়েছে। শরীরে কোন পদার্থ নেই।

সাধুখাঁর ছেলে বলল, এমন তো হবার কথা নয়। সত্যসুন্দর অয়েল মিলের বিশুদ্ধ সরিষার তেল বাবাকে তো কোনদিন খেতে হয়নি। আমাদের গাঁ থেকে ঘানির তেল আনা হত।

তাহলে এরকম হল কেন?

সংবাদপত্রের লোকেরা ফটোর ব্লক আর জীবনী কম্পোজ করে প্রস্তুত। শুধু বার আর তারিখটা ফাঁক রেখে দিয়েছে। নার্সিং হোম থেকে খবর এলেই বসিয়ে দেব।

সারা বছরে অনেক টাকার বিজ্ঞাপন আসে সত্যসুন্দর সাধুখাঁর তিনটে অয়েল মিল থেকে। তাই কেউ ব্যানার সাজাল, তৈলসম্রাটের জীবনপ্রদীপের তৈল নিঃশেষিত। কেউ লিখল, সত্যসুন্দরের সত্য ও সুন্দর জীবনের পরিসমাপ্তি।

সব ঠিক, কেবল সাধুখাঁর চোখ বোজবার অপেক্ষা। ঠিক এই সময়ে অদ্ভুত এক যোগাযোগ হয়ে গেল।

NOT FOR SALE

সুইজারল্যান্ড থেকে ডাক্তার বেনস্ এসে ভারতে পৌঁছলেন। পৃথিবী বিখ্যাত সার্জন। দিন পনেরো থাকবেন ভারতে। তার মধ্যে দু'দিন বাংলায়, অর্থাৎ কলকাতায়।

তখনই ডাক্তার বেনস্-এর সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল। তিনি রোগের বিবরণ শুনলেন। চিকিৎসার ইতিবৃত্ত।

বললেন, ঠিক আছে। এই আমার কলকাতার ঠিকানা। আমাকে যেন নার্সিং হোমে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হয়।

তখন দিন পাঁচেক সাধুখাঁ অচৈতন্য!

ডাক্তার বেনস্ কলকাতায় আসতেই সাধুখাঁর ছেলে তাঁকে নিয়ে এল নার্সিং হোমে।

তিনি একা এলেন না। সঙ্গে শাগরেদ রমেশ মুন্সী, বোম্বাইয়ের ছোকরা ডাক্তার। সুইজারল্যান্ডে তাঁর কাছে মাস ছয়েক শিক্ষানবিসি করছিল। এদেশের হালচাল জানা আছে বলে, বেনস্ তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা হল। নানারকম নতুন যন্ত্রপাতি দিয়ে। প্রায় আধঘণ্টা পরে ডাক্তার বেনস্ বললেন, ব্রেনটা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে, ওটা পালটাতে হবে।

ব্রেন অকেজো হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, অনবরত গভীর চিন্তা করলে তাই হয়।

সাধুখাঁর ছেলে আর কিছু বলল না। তার বাপের চিন্তা বড় কম ছিল না। আয়করের হাঙ্গামা আগেকার নীলকরদের অত্যাচারের চেয়ে বেশি। তার ওপর ইদানীংকার গোলমাল তো ছিলই। তা হলে উপায়?

উপায় একটা আছে বৈকি?

ডাক্তার বেনস্ সহকারীর দিকে ফিরে তাকালেন। তুমি এখনই চলে যাও। প্রথম সারিতে জারের মধ্যে যে ব্রেন সংরক্ষিত আছে, সেখান থেকে তিন নম্বর ব্রেনটা নিয়ে চলে এস। দেরি কর না।

তারপর ডাক্তার বেনস্ সাধুখাঁর ছেলেকে বললেন, আপনার বাবা ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই না?

ছেলে ঘাড় নাড়ল, আজ্ঞে হ্যাঁ। এ শহরে সবাই তাকে অয়েল কিং বলে জানে।

NOT FOR SALE

ঠিক আছে, যাও রমেশ। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

রমেশ মুন্সী মোটর নিয়ে ছুটল। দরজা খুলেই বিপদ। পায়ের কাছে মস্ত বড় একটা কালো বিড়াল। ব্রেনের গন্ধে এসেছে কিনা, ঈশ্বর জানেন। জানলা খোলা ছিল।

রমেশ তাড়া দিতেই বিড়াল লাফিয়ে জারের ওপর পড়ল। জার ভেঙে চুরমার।

রমেশ বহুকষ্টে বিড়ালটাকে বিদায় করল। ব্রেনগুলো হুক থেকে খুলে সব টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। রমেশ খুব সাবধানে তিন নম্বর ব্রেনটা তুলে নিয়ে নার্সিং হোমে ফিরে এল।

এদিকে ডাক্তার বেনস্ অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। রমেশ ফিরতেই তার হাত থেকে ব্রেনটা নিয়ে অপারেশনে লেগে গেলেন।

প্রায় চার ঘণ্টা সময় লাগল।

বন্ধ দরজার বাইরে সাধুখাঁর স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বৌ উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষমান। এ ছাড়া অফিসের লোকজনও ছিল। সমব্যবসায়ীরাও।

ডাক্তার বেনস্ বাইরে এসে হাতের গ্লাভস্ খুলে বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অপারেশন সাকসেসফুল।

সাধুখাঁর ছেলে বলল, কিন্তু রোগী?

বেনস্ অভয় দিলেন, রোগীও বাঁচবে। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরবে, তার আগে নয়।

এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা পকেটে নিয়ে বেনস্ কলকাতা ছাড়লেন।

সাধুখাঁর পরিবারের সবাই নার্সিং হোমেই রইল। কেউ বাড়ি ফিরল না।

এ ধরনের ব্রেন বসানোর কাজ ভারতে এই প্রথম, কাজেই সংবাদপত্রের লোকেরা নজর রাখল রোগীর ওপর।

অনেক বছর আগে ত্রিচীনাপল্লীতে এক ডাক্তার সাহস করে এক ছোকরার ব্রেন বাদ দিয়ে বানরের ব্রেন অপারেশন করে বসিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ঠিক কি ফল হল সেটা পর্যবেক্ষণ করার আর সময় পায়নি। ব্রেন বসাবার পরই লোকটি হুপ করে সেই যে নারিকেল গাছের আগায় গিয়ে উঠেছিল, সেখান থেকে তাকে নামানো সম্ভব হয়নি। তারপর থেকে এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফালাফি করে বেড়িয়ে লোকটা কোথায় অন্তর্ধান করল, অনেক চেষ্টা

NOT FOR SALE

করেও তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

যা হোক, সাধুখাঁ যখন চোখ খুলল, তখন সাধুখাঁর ছেলে আর ডাক্তার পাশেই ছিল। সব অচেতন ব্যক্তি প্রথম যে কথা বলে, সাধুখাঁ সেই কথাই বলল।

আমি কোথায়?

ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত হন, নার্সিং হোমে আপনি রয়েছেন। এখানে কোন অসুবিধা হবে না।

তার পরের কথা সাধুখাঁ বলল।

আমি এখানে কেন?

ডাক্তার বোঝাবার চেষ্টা করল, আপনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাই আপনাকে এখানে আনা হয়েছিল। আপনি ভাল হয়ে উঠেছেন, আর ভয়ের কিছু নেই।

সাধুখাঁ একটু নিশ্চিন্ত চিত্তেই যেন চোখ বুজল। আবার চোখ খুলল প্রায় আধঘণ্টা পর। শুধু চোখ খোলা নয়, একেবারে বিছানার ওপর উঠে বসল।

তখন পাশে ছিল সত্যভামা সাধুখাঁ।

তার দিকে ফিরে সাধুখাঁ বলল, তুমি এখানে কেন? তোমার কি হয়েছিল?

সত্যভামা অদ্ভুত ভঙ্গীতে মুখ বেঁকিয়ে বলল, বালাই ষাট, আমার কি হবে! তোমার জন্যই এখানে এসেছি। গিয়েই পঞ্চানন ঠাকুরকে আড়াইশো টাকার পুজো পাঠাতে হবে, নইলে মান থাকবে না। বলেছিলাম কি না, হে ঠাকুর, যেন নতুন শাড়িগুলো কিছুদিন অন্তত পরতে পাই।

কথা শেষ করে সত্যভামা দুটো হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো।

নার্সিং হোম থেকে সাধুখাঁ বাড়ি গেল দিন পনেরো পর। সত্যসুন্দর অয়েল মিলের গদিতে গিয়ে বসল আরো মাসখানেক বাদে।

প্রথম দিন বহু লোকে দেখা করতে এল। কর্মচারীরা দাঁড়াল জোড় হাত করে। এ একরকম পুনর্জন্ম ছাড়া আর কি!

গোলমাল বাধল পরের দিন।

গদিতে সাধুখাঁ বসেছিল, ম্যানেজার এসে দাঁড়াল, স্যর, বড় বিপদ হল।

মোটা লাল খাতার পাতা উলটে সাধুখাঁ কেনাবেচার হিসাব দেখছিল, মুখ তুলে বলল, কি বিপদ?

NOT FOR SALE

শিয়ালকাঁটার বদলে আর একরকম গাছ পাওয়া গেছে স্যর। খুব ঝাঁজ। সর্ষের চেয়েও বেশি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সে গাছ সনাতন অয়েল কোম্পানির লোকেরা প্রায় সব কিনে নিয়েছে, মানে কাছাকাছি এলাকার সব গাছ।

সাধুখাঁ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কেন, এই ঝাঁজওয়ালা গাছ কি হবে?

ম্যানেজার গলার স্বর একটু নীচু করে বলল, 'এ জিনিস সর্ষের তেলে মেশালে আর দেখতে হবে না, আসল সর্ষের তেলকেও হার মানাবে, তাছাড়া দামেও সস্তা পড়ত। তবে আপনি যদি হুকুম দেন লোক লাগিয়ে এ গাছের ব্যবস্থাও আমরা করতে পারি।

ম্যানেজারের কথা শেষ হতেই সাধুখাঁ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলল, তোমাকে কাল থেকে আর আসতে হবে না। ম্যানেজার, এই মুহূর্তে তোমাকে আমি বরখাস্ত করলাম। পরে এক সময় এসে তোমার প্রাপ্য বুঝে নিয়ে যেও।

ম্যানেজার হতবাক, তারপর অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলল, স্যার, আমি তো কিছু—

চুপ, আর একটি কথাও নয়, তোমার মতন লোকের মুখ দেখলেও পাপ হয়। যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

ম্যানেজার আর দাঁড়াল না। ছুটে একেবারে সাধুখাঁর ছেলের তেলের কলে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যাপারটা ছেলেকে না জানালে সাধুখাঁ হয়তো বরখাস্তের নোটিশই দিয়ে দেবে।

ছেলেও সব শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। এমন একটা ব্যাপারে তো বাপের মেজাজ দেখাবার কথা নয়। বরং খুশীই তো হবে।

ছেলে ম্যানেজারকে আশ্বস্ত করল। এত বড় একটা রোগ থেকে উঠে বাবার মেজাজ একটু তিরিক্ষে হয়েছে। আপনি গাছ যোগাড় করুন। আমি বাবাকে সামলে নেব।

ম্যানেজার হৃষ্টচিত্তে চলে গেল। তার এক ঘণ্টা পরেই গুদাম থেকে ফোন এল, শীগগির চলে আসুন, এখানে ভারি গোলমাল শুরু হয়েছে।

সর্বনাশ, গুদামঘরের এক কোণে প্রচুর শিয়ালকাঁটা জমা আছে। পুলিস আবার হামলা শুরু করল নাকি?

NOT FOR SALE

ছেলে তখনই মোটর নিয়ে ছুটল। গুদামঘরের সামনে গিয়েই ছেলের চক্ষুস্থির। কর্মচারীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছু এদিক ওদিক পথচলতি মানুষও এসে জমেছে। তাদের সামনে হাত-মুখ নেড়ে সাধুখাঁ বক্তৃতা দিয়ে চলেছে, তোমরা নিজেদের মানুষ বলে পরিচয় দাও? নিজের দেশবাসীকে এই বিষ তুলে দিতে তোমাদের বিবেকে বাধে না? জানো এই শিয়ালকাঁটা কত ভাবে সর্বনাশ করতে পারে?... কেউটের বিষের চেয়েও এর প্রতিক্রিয়া আরও মারাত্মক। কেউটের বিষ মুহূর্তে মানুষকে শেষ করে ফেলে, কিন্তু শিয়ালকাঁটার বিষ তিলে তিলে মানুষকে মরণের পথে এগিয়ে দেয়। তোমরা নির্বিচারে সেই বিষ আসল সর্ষের তেল বলে বাজারে চালাচ্ছ। কলিকাতা আর শহরতলীর বুকে এত চোখের রোগ, পা ফোলা, জানো এসবের জন্য দায়ী কে? ওই শিয়ালকাঁটা। তোমাদের আধঘণ্টা সময় দিলাম, এর মধ্যে সমস্ত শিয়ালকাঁটা গুদামঘর থেকে সরিয়ে ফেল। তারপর আমি নিজে দরজায় চাবি লাগিয়ে দেব, যাতে একটি মালও বাজারে না বের হতে পারে। অন্য গুদামেও আমি এই ব্যবস্থা করছি।

ছেলে বুঝল, আর দেরি করা উচিত নয়। বাবাকে এখন সামলানো যাবে না। যে রকম ক্ষেপে উঠেছে, পুলিসেই হয়তো খবর দিয়ে বসবে। ছেলে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল বাপের দিকে। আপনি আসুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বহু কষ্টে বুঝিয়ে সাধুখাঁকে ছেলে নিজের মোটরে ওঠাল। বাপকে একেবারে অফিস ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে ছেলে সোজা ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাজির হল।

সব শুনে ডাক্তার বলল, আমার তো মনে হয় অপারেশনে কোন গোলমাল হয়েছে। বিদেশী সব কিছুতেই আপনারা নাচানাচি শুরু করেন। এই তো একগাদা টাকা নিয়ে সরে পড়ল, রোগীর মাথাটা বিগড়ে দিয়ে।

আপনি একটা ব্যবস্থা করুন ডাক্তারবাবু, না হলে বাবা যা কাণ্ড করছে, কারবার তো লাটে উঠবেই— আমাদেরও জেলে পচতে হবে।

আচ্ছা দেখি।

তারপর চলল সুইজারল্যান্ডে ট্রাঙ্ককল। ডাক্তার বেনস্-এর খোঁজে। দুই দিন পরে খবর এল বেনস্ বেঁচে নেই।

NOT FOR SALE

বিলাতের এক মুমূর্ষু এমপিকে তিন লাখ পাউন্ডে নিজের ব্রেন বিক্রি করে টেঁসে গেছেন।

সর্বনাশ, তাহলে!

অপারেশনে কোন গোলমাল হয়ে থাকলে কে ধরবে! অথচ বাপকে দিনের পর দিন এভাবে বন্ধ রাখাও চলে না। লোকেই বা কি বলবে! অবশ্য সত্যভামা সাধুখাঁকে ছেলে সব জানিয়েছে। বাবাকে বাজারে ছাড়লে তিনি যে সর্ষের তেলের চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবেন, তাও বুঝিয়েছে।

সত্যভামা বুঝেছে। কারবার গেলে সম্পদও যাবে এটুকু বুঝতে তার মোটেই অসুবিধা হয়নি।

অবস্থা যখন প্রায় চরমের দিকে তখন ডাক্তার একটি লোককে নিয়ে ছেলের কাছে হাজির।

ছেলে লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল। ডাক্তার বেনস্-এর সহকারী রমেশ মুন্সী।

রমেশই বলল। ব্যাপারটা গোড়া থেকেই একটু গোলমাল হয়ে গেছে।

কি রকম?

বিড়ালে কাঁচের জার ভেঙে সব ব্রেন ওলোট-পালোট করে দিয়েছিল। ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়ীর ব্রেনই দেবার কথা ছিল, কিন্তু ওলোট-পালোট হয়ে যাবার জন্যে যে ব্রেনটি লাগানো হয়েছে সেটি রতনপুর প্রাইমারি বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের। আদর্শবাদী শিক্ষক, জীবনে অন্যায় সহ্য করেননি। মিথ্যাও বলেননি। একটি ছাত্র নকল করেছিল, তাকে ধরিয়ে দিতে গিয়ে, তলপেটে ছুরি খেয়ে খতম হয়ে গিয়েছিলেন।

আমি সারাদেশে ব্রেন খুঁজে বেড়াচ্ছি। বিভিন্ন জীবিকার মানুষের ব্রেন। কিছু টাকা ওঁর আত্মীয়ের হাতে দিয়ে ব্রেনটা কিনে নিয়েছিলাম।

এখন উপায়?

রমেশ নাথা নাড়ল, কোন উপায় দেখছি না। আমি তো অপারেশন করতে পারব না। বেনস্ আমকে শেখাননি। তবে একটা কথা বলতে পারি।

সাগ্রহে ছেলে বলল, কি কথা?

এসব ঝামেলায় ব্রেন এ যুগে অচল। আরো গোলমালের সৃষ্টি হবে।

আরে তাই তো বলছি। আপনি ডাক্তার, কড়া ওষুধ তো আপনাদের হাতে।

NOT FOR SALE

রমেশ হাসল, তার চেয়ে কড়া ওষুধ আপনাদের কাছেই আছে। সাধুখাঁকে আসল সর্ষের তেল খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই, তার বদলে সত্যসুন্দর অয়েল মিলের বিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহার করান। একটু বেশি রকম বিশুদ্ধ। ব্যস, গ্লুকোমা, বেরিবেরি, হার্টের ব্যধি এই তিন দেবতায় কাবু করে দেবে। আর তিনি দেশের শিয়ালকাঁটাও নির্মূল করার অবকাশ পাবেন না। পুলিস ডাকবারও অবসর নয়।

———

NOT FOR SALE

কালো গোলাপ

শেষ রাত থেকে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে একটানা। জানলার ভারী পর্দাটা টেনে দিয়ে টেব্‌ল-ল্যাম্প জ্বেলে বিকাশ মিত্র একটা বই নিয়ে টেবিলের ধারে বসেছিলেন। সামনে ধূমায়মান চায়ের কাপ। হাতে পাইপ। মাঝে মাঝে মুখ তুলে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের দুর্যোগের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করছিলেন।

হঠাৎ দরজায় খুটখুট শব্দ।

বিকাশ মিত্র ফিরে চাইলেন, কে?

সন্তর্পণে দরজা ঠেলে প্রৌঢ় ভৃত্য রাইচরণ ঘরে ঢুকল।

বাবু, একটি মেয়েছেলে দেখা করতে চান।

মেয়েছেলে? বিকাশ মিত্র ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তাঁর কাছে লোক আসার একটি অর্থই হয়। ঘোরতর বিপদে পড়েছে, সাহায্যের প্রয়োজন। তা না হলে গল্পগুজব করতে কে আসবে শহরের বিখ্যাত শখের গোয়েন্দা বিকাশ মিত্রের কাছে।

ওপরে নিয়ে এস। আদেশ দিয়ে বিকাশ মিত্র বইটা সরিয়ে চেয়ার ঘুরিয়ে বসলেন।

একটি সুশ্রী তরুণী ঘরের মধ্যে ঢুকল। পরনের শাড়ি-জামা বেশ ভিজে গিয়েছে। মাথার চুলেও ফোঁটা ফোঁটা জল।

কি ব্যাপার? পাইপে টান দিয়ে বিকাশ মিত্র গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তরুণী আঁচল মুখে দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, তারপর একটু সামলে নিয়ে বলল, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে!

বিকাশ মিত্র কোন কথা বললেন না। দুটি চোখ কুঁচকে তরুণীর আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন। সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে মেয়েটি যেন আরো সংকুচিত হয়ে পড়ল।

NOT FOR SALE

অনেকক্ষণ পরে বিকাশ মিত্র একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, সব কিছু খুলে বলুন।

তরুণী খুব মৃদু গলায় বলল, আমার বাবা আজ ভোরে মারা গেছেন।

মারা গেছেন? গম্ভীর গলায় বিকাশ মিত্র প্রশ্ন করলেন।

মেয়েটি একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে বলল, মারা গেছেন মানে সম্ভবতঃ কেউ মেরে ফেলেছে তাঁকে।

বিকাশ মিত্র আড়চোখে একবার দেয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে দেখলেন। প্রায় ন'টা বাজে। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে দুটো চোখ বন্ধ করে বললেন, সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলুন। কোন কথা চাপবার চেষ্টা করবেন না।

মেয়েটি অল্প কেশে গলাটা একটু ঠিক করে নিল, তারপর খুব আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল।

রোজকার মতন আজকে ভোরেও বাবাকে ডাকতে গিয়েছিলাম। ঘরের পর্দাটা সরিয়ে দেখলাম বাবা টেবিলের ওপর মাথা দিয়ে বসে আছেন। সামনে একটা বই খোলা। বই পড়া বাবার একটা বহু পুরোনো নেশা, বাতিকও বলতে পারেন। প্রায়ই ভোররাতে উঠে পড়াশোনা করতেন। মা মারা যাবার পর থেকে এ অভ্যাসটা আরো যেন বেড়ে উঠেছিল। কাছে গিয়ে ডাকলাম। কোন সাড়া নেই। ভাবলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন। আরো কাছে গিয়ে অল্প ধাক্কা দিতেই—

কথাটা শেষ হবার আগেই মেয়েটি কেঁদে উঠল। সমস্ত ঘটনা ছবির মতন ভেসে উঠল মেয়েটির সামনে।

খুব শান্ত গলায় বিকাশ মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নামটা কি জানতে পারি?

কান্নাভেজা গলায় মেয়েটি বলল, মিনতি, মিনতি রায়।

চেয়ারের হাতলে পাইপটা ঠুকে ছাইগুলো ফেলতে ফেলতে বিকাশ মিত্র সান্ত্বনার সুরে বললেন, কেঁদে আর কি লাভ বলুন মিনতি দেবী। কাঁদলে কি আর মরা মানুষ ফিরে আসে। তার চেয়ে সব কিছু খুলে বলুন, দেখি কতদূর কি কিনারা করতে পারি।

মিনতি আঁচল দিয়ে চোখদুটো মুছে নিয়ে ধরাগলায় বলতে আরম্ভ করল, একটু ধাক্কা দিতেই বাবা হেলে পড়লেন। শরীর বরফের মতন ঠাণ্ডা। নাকের

NOT FOR SALE

দুটো পাশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। সামনে একটা কাগজ। তার ওপরে পেন্সিল দিয়ে শুধু একটি অক্ষর লেখা 'চ'।

বিকাশ মিত্র বাধা দিলেন, মাপ করবেন, হাতের লেখাটা কার?

মিনতি বলল, বাবারই হাতের লেখা, একটু দূরে টেবিলের ওপর একটা কালো রংয়ের গোলাপ ফুল। আমাদের বাগানে ও ফুলের গাছ নেই। এ ফুলটা কোথা থেকে এল বুঝতে পারছি না। তখনই আমাদের বাড়ির ডাক্তার সেনকে ফোন করে দিলাম। তিনি এসে পরীক্ষা করে বললেন, ঘণ্টা দুয়েক আগে সব শেষ হয়ে গেছে। কিসে মৃত্যু হয়েছে সে কথাটা তিনি পোস্ট মর্টেম না হলে বলতে পারবেন না। তারপরই আপনার কথা মনে হল। মনীষাদির জড়োয়া নেকলেশটা আপনিই উদ্ধার করেছিলেন। একবার ভাবলাম আপনাকে ফোন করি, তারপর একেবারে সোজা চলেই এলাম আপনার কাছে।

বিকাশ মিত্র কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন, পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, ডাক্তার সেনই থানায় ফোন করে দিয়েছেন। মিনতি খুব আস্তে বলল।

পুলিস এসেছে?

না, আসেনি। অন্ততঃ আমি বেরোবার সময় পর্যন্ত তো নয়।

বিকাশ মিত্র দাঁড়িয়ে উঠলেন। হাত বাড়িয়ে কোটটা টেনে নিতে নিতে বললেন, পুলিস আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গিয়ে পৌছাতে হবে, নয়তো ওদের খানাতল্লাশীর পর আমাদের দেখবার মতন আর কিছু থাকবে না।

বাড়িতে পা দিয়েই মিনতি চমকে উঠল। সামনে পুলিসের ভিড়। ভীষণ গোলমাল। পাড়া-প্রতিবেশীও অনেকে এসে জুটেছে।

একটু এগিয়ে গিয়েই মিনতি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বহুদিনের পুরোনো চাকর চন্দ্রনাথকে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে।

মিনতিকে দেখেই চন্দ্রনাথ হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল, দেখুন দিদিমণি, আমার অবস্থা! আমি নাকি বাবুকে—কথা শেষ হবার আগেই চোখের জলে বুড়োর দুটো গাল ভেসে গেল। সে আর একবার কথা বলবার চেষ্টা করতেই

NOT FOR SALE

ইনস্পেক্টর সায়েব ধমক দিয়ে উঠলেন, চোপরাও, খুনে কোথাকার! তোমার হয়েছে কি, ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে সে খেয়াল আছে?

এবার বিকাশ মিত্র এগিয়ে এলেন, কি ব্যাপার মিস্টার নাগ, আসামীকে পাকড়াও করেছেন নাকি?

বিকাশ মিত্রকে দেখে মিস্টার নাগ সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠলেন, তারপর বললেন, হ্যাঁ, স্যার, আর একটু দেরি হলেই ঝানু বুড়ো কেটে পড়ত। খুব সময়ে এসে পড়েছি।

প্রমাণ পেয়েছেন এর বিরুদ্ধে?

প্রমাণ? রায়বাহাদুর নিজে এর নাম লিখে গেছেন। এই দেখুন না কাগজটা।

সঙ্গে সঙ্গে ইনস্পেক্টর নাগ একটা কাগজ বিকাশ মিত্রের সামনে ধরলেন।

বিকাশ মিত্র কাগজটার ওপর আলগোছে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, চলুন, ঘরের মধ্যেটা একবার দেখে আসি।

ছোট্ট ঘর। একপাশে একটি টেবিল, খানদুয়েক চেয়ার, একটি নাতিদীর্ঘ খাট। ঘরে জানলা দুটি। একটি দরজা, সেটি ভিতরের দিকে। সেই দরজা দিয়ে বাইরে যাবার কোন উপায় নেই। কেবল পাশে মিনতির ঘরে যাওয়া চলে। মিনতির ঘরটিও ছোট। আসবাবপত্র বেশি নেই।

বিকাশ মিত্র ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে বসে বললেন, কিন্তু একটা কথা মিস্টার নাগ, আপনার আসামী রায়বাহাদুরের ঘরে ঢুকল কি করে?

ইনস্পেক্টর নাগের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। ভাবটা যেন শখের গোয়েন্দা আর সরকারী পুলিসে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মুখে বললেন, ঘরের মধ্যে ঢুকেছে এ কথা আপনাকে কে বললে?

মানে? বিকাশ মিত্র একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন, ঢোকেনি, আগে থেকেই ঢুকে বসেছিল। কাল সন্ধ্যা থেকে কিংবা রাত থেকে খাটের তলায় লুকিয়েছিল।

ও, তাহলে বেরোল কোথা দিয়ে? মিনতি দেবী যখন এ ঘরে ঢুকলেন তখন ঘরে কোন লোক ছিল না, আর মিনতি দেবীর ঘরের দরজাও ভিতর থেকেই বন্ধ ছিল। তাই না?

মিনতি ঘাড় নাড়ল।

তাছাড়া, এত নীচু খাটের তলায় লোক ঢুকবেই বা কি করে। আধুনিক ডিজাইনের খাটের এই একটা মস্ত সুবিধা।

NOT FOR SALE

ইনস্পেক্টর নাগের মুখটা একটু যেন বোকা বোকা দেখাল। তারপরই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ওসব ভেবে আর লাভ কি? বদমাইশের অসাধ্য কাজ দুনিয়ায় কিছু আছে নাকি! সব চেয়ে বড় কথা, রায়বাহাদুর নিজের হাতে 'চ' অক্ষর লিখে গেছেন। 'চ' মানেই চন্দ্রনাথ, এতো একটা শিশুও বুঝতে পারে। পুরোনো চাকরগুলোই তো শয়তান। আমার বিশ বছরের পুলিসের চাকরিতে এই ধরনের কম কেস ঘাঁটলাম! হুঁ!

বিকাশ মিত্র কোন উত্তর দিলেন না। ইতিমধ্যেই তিনি তন্নতন্ন করে ঘরটা পরীক্ষা করতে শুরু করেছিলেন। ঘরের মেঝের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নীচু হয়ে সবুজ রংয়ের রেশমী সুতোর টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখলেন। টেবিলের ওপর থেকে কালো গোলাপটি রুমালে জড়িয়ে তিনি আগেই তুলে নিয়েছিলেন।

চৌকাঠ পার হয়ে মিনতির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, একবার হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি। মর্গেও যাব আর পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটাও যোগাড় করতে হবে। নমস্কার।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ইনস্পেক্টর নাগের দিকে ফিরে বললেন, চলি মিস্টার নাগ। একটা কথা, 'চ'-এর জন্য যদি চন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে, তাহলে তো আপনাদের বড়কর্তা চণ্ডীবাবুকেও হাতকড়ি লাগানো উচিত, কি বলেন?

মাসখানেক পরের কথা।

দুটি চেয়ারে মুখোমুখি বসে বিকাশ মিত্র আর মিনতি রায়।

হঠাৎ একটু দাঁড়িয়ে বিকাশ মিত্র বললেন, আপনি বোধ হয় একটু আশ্চর্যই হয়ে গেছেন মিনতি দেবী। এত শীঘ্র যে কেসটার কিনারা হবে তা অবশ্য আমিও ভাবিনি।

মিনতি বলল, কেসটার সম্বন্ধে জানবার জন্য আমি খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছি মিস্টার মিত্র।

বিকাশ মিত্র চেয়ারে বসে পাইপে বারদুয়েক টান দিয়ে বললেন, শুনুন তাহলে।

আপনার ঘরটা দেখেই বুঝতে পারলাম যে বাইরে থেকে কেউ ভিতরে

NOT FOR SALE

আসেনি। এলে অন্ততঃ আপনি জানতে পারতেন। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় কেউ যে ঘরে ঢুকে আবার বেরিয়ে গেছে, এও সম্ভব নয়। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে দেখলাম যে তীব্র বিষে আপনার বাবার মৃত্যু হয়েছে। কালো গোলাপটি পরীক্ষা করে জানলাম যে গোলাপে বিষ মাখানো ছিল। সে বিষ যে কত তীব্র তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। শুধু শুঁকলেই, দু'সেকেণ্ডের মধ্যে যে কোন জোয়ান লোকের মৃত্যু হতে পারে। এ পর্যন্ত সবই ঠিক হল, কিন্তু এই বিষমাখানো গোলাপ এল কোথা থেকে? আপনার বাবা কাগজে 'চ' লিখে গেছেন বলেই বাড়ির পুরোনো চাকর চন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করতে হবে এ ধারণাটা এত মামুলী যে এতে আমি মোটেই আমল দিইনি। শুধু শুধু একটা মানুষ আর একটা মানুষের মৃত্যু ঘটায় না। তার একটা কারণ থাকে। খোঁজ করে জানলাম, আপনার বাবার কোন শত্রু ছিল না। ব্যাপারটা একটু ঘোরালো বলেই মনে হল। আপনি প্রথম যেদিন আমার কাছে এলেন, সেদিন লক্ষ্য করলাম আপনার দু'হাতে পাঁচটি আংটি আর প্রত্যেক আংটিতেই খুব দামী পাথর বসানো। আজকালকার কম অলংকারের যুগে এটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। আপনার বাবার আঙুলেও, রিপোর্টে দেখলাম, অনেকগুলো দামী পাথর বসানো আংটি ছিল। আপনাদের ঘরের আলমারির মধ্যে কাঠের একটা হরিণের চোখেও দেখলাম মূল্যবান পাথর। দামী পাথরের যেন ছড়াছড়ি বলেই মনে হল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম আপনার বাবার দামী পাথর কেনার খুব বাতিক ছিল। এজন্য উনি একবার বর্মাদেশেও পাড়ি দিয়েছিলেন। যে আপনার বাবাকে মেরেছে সে একটিও দামী পাথর সরায়নি। কাজেই বোঝা যাচ্ছে পাথর চুরি করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। কিংবা পাথর সরাবার সুযোগ সে পায়নি। মানুষকে হত্যা করার সাধারণতঃ দুটি উদ্দেশ্য থাকে, একটি লোভ, আর একটি প্রতিহিংসা।

আপনাদের বুড়ো চাকর চন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম যে মংপু বলে একটা বর্মী মাঝে মাঝে আপনার বাবার কাছে আসত। আপনার বাবা মারা যাবার দিন কয়েক আগে আপনাদের বাড়ির পিছনে খালি জমিতে মংপুর থাকার জন্য একটা চালাঘরও তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। আপনারা জানতেন যে মংপু আপনার বাবার বাতের জন্য বাঘের চর্বি নিয়ে আসত, কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়।

NOT FOR SALE

কি তাহলে আসল ব্যাপার? উদ্বিগ্ন গলায় মিনতি জিজ্ঞাসা করল।

পাইপটা নিভে গিয়েছিল। বিকাশ মিত্র দেশলাই জ্বালিয়ে সেটা ধরিয়ে নিলেন, তারপর বললেন, আসল ব্যাপার মংপু দামী পাথরের ব্যবসা করত। মংপুর সঙ্গে ভাব জমাতে বেশি দেরি হল না। সেতো আপনিও দেখেছেন, কতদিন ওর চালাঘরের দাওয়ায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। বেশ কয়েক ভাঁড় তাড়ির বদলে মংপুর মনের অনেক গোপন কথা জানতে পেরেছি। সে খুব ভাল সাপের খেলা দেখাতে পারত। তার চালাঘরের কোণে বেতের ঝাঁপি চাপা অনেক রকমের সাপ ছিল। আপনার বাবার সঙ্গে মংপুর আলাপ হয়েছিল বর্মাদেশের মেমিও শহরে। পাহাড় থেকে মংপু অনেকগুলি পাথর সংগ্রহ করেছিল। তখন সে ওগুলোর দাম সম্বন্ধে কিছুই জানত না। আপনার বাবা মংপুকে বুঝিয়েছিলেন ওসব ঝুটো পাথর। নামমাত্র দামে তার কাছ থেকে তিনি ওই সব পাথর কিনে নিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মংপু আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। কতকগুলো পাথর তার নিজের কাছে ছিল, সেগুলো সে এক জহুরীর কাছে নিয়ে যেতে ঠিক দাম জানতে পারে। বর্মীরা ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। আপনার বাবার ঠিকানা তার কাছে ছিল। আপনার বাবাই দিয়েছিলেন। যদি ভাল পাথর আরো জোগাড় করতে পারে তাহলে তাঁকে যাতে পাঠিয়ে দিতে পারে।

সুদূর বর্মা থেকে মংপু বাংলাদেশে এসেছিল। আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করে আগের পাথরগুলোর ন্যায্য দাম চেয়েছিল।

আপনার বাবা বোধ হয় তাকে মিষ্টকথায় ভোলাতে চেয়েছিলেন। তাকে ঠাণ্ডা করার জন্য নিজের জমিতে চালাঘরও তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্মীজাতকে তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি। প্রতিহিংসা নেবার জন্য এরা বছরের পর বছর অপেক্ষা করে।

একদিন মংপু সুযোগ পেল এবং সহজেই কাজ শেষ করল।

কিন্তু বন্ধ ঘরে সে ঢুকল কেমন করে?

মিনতির গলার স্বর কেঁপে কেঁপে উঠল।

বিকাশ মিত্র মুচকি হাসলেন, ঘরে সে ঢোকেনি। কোন মানুষই ঢোকেনি সে ঘরে।

তবে?

NOT FOR SALE

আপনার বাবা কোন মানুষের হাতে মারা যায়নি।

সে কি? আশঙ্কায় মিনতির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

পরের ব্যাপারটা অবশ্য আমাকেই অনুসন্ধান করে বার করতে হয়েছে। মংপুর কাছ থেকে আর কিছুই জানা যায়নি। আমি দেখলাম ঘরের দরজা জানলা সব যদি বন্ধ থাকে, তবে একমাত্র আসার পথ ভেন্টিলেটার দিয়ে। কিন্তু সেখান দিয়ে মানুষের আসা সম্ভব নয়। একমাত্র আসতে পারে সরীসৃপ জাতীয় কিছু। যে সাপগুলো মংপুর ঘরে ছিল, সেগুলো সবই বিষদাঁত ভাঙা, নয়তো তাদের নিয়ে খেলা করা মংপুর পক্ষে সম্ভব হত না। কিন্তু রেশমী সূতো দিয়ে সাপের শরীরের সঙ্গে বিষমাখানো কালো গোলাপ বেঁধে দিয়ে অনায়াসেই সেটাকে ভেন্টিলেটার দিয়ে ঘরের মধ্যে চালান দেওয়া যায়। এই কালো গোলাপ মেমিওর পাহাড় অঞ্চলে ফোটে এবং বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। মংপুকে সন্দেহ করার এও আমার একটা কারণ। মংপু এটা বেশ জানত, একবার কালো গোলাপটি ঘরের মধ্যে ফেলতে পারলে, কৌতূহলবশতঃ আপনার বাবার পক্ষে ফুলটি তুলে নিয়ে শুঁকতে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার বাবা সাপটাকেও দেখতে পেয়েছিলেন, সম্ভবতঃ ফুলটা শোঁকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। সেইজন্য হাতের কাগজ পেয়ে শেষ মুহূর্তে লিখতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তীব্র বিষের প্রকোপে একটি অক্ষর লিখেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছিলেন।

বাবা শুধু লিখেছিলেন 'চ'। মিনতি অস্ফুট কণ্ঠে বলল।

হ্যাঁ সাপটার নাম লিখতে যাচ্ছিলেন। চন্দ্রবোড়া সাপ। মংপু নিজের সম্বন্ধে এত নিশ্চিন্ত ছিল যে সে কোথাও পালিয়ে যাবার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও পাপীরা কিছুতেই নিজেদের নাশকতা লুকোতে পারে না। কেমন করে দু'-একটা চিহ্ন পিছনে ফেলে রেখে যায়। এই কালো গোলাপ আর রেশমী সূতোই মংপুকে গারদে পাঠাল। কথাটা বলে নিজের হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তেই বিকাশ মিত্র দাঁড়িয়ে উঠলেন। রাত আটটা বাজে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিকাশ মিত্র হাসলেন। একদিন বরং নিমন্ত্রণ খাইয়ে দিন। আচ্ছা আসি।

NOT FOR SALE

চন্দ্ররহস্য

বৈজ্ঞানিক শশাঙ্কমোহনের নাম শুনেছ? শশাঙ্কমোহন সরখেল?

আগে একটা সাবানের কারখানার মালিক ছিলেন। নিস্তারিণী সোপ ওয়ার্কস। এখন ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় চুপচাপ বাড়িতে বসে আছেন। অবশ্য কিছুদিন সুস্থির হয়ে বাড়িতেও থাকবার উপায় ছিল না। দলে দলে লোক এসে বাড়ি ঘেরাও করেছিল। লোক মানে যারা নিস্তারিণী সোপ ওয়ার্কস-এর তৈরী সাবান কিনেছিল, তারা আর তাদের আত্মীয়স্বজন।

কাপড়-কাচা সাবান, কিন্তু সে সাবান কাপড়-জামায় ঠেকালেই নাকি জামা-কাপড় ফুটো হয়ে যাচ্ছে। আর গায়ে মাখার যে সাবান 'সুরভি', সেটা যে যে ব্যবহার করেছে সবাই এখন শয্যাগত। কিছুক্ষণ রগড়ালেই এমন দুর্গন্ধ বের হয়েছিল, যে বমি করতে করতে বেচারীরা কাহিল। বিছানা থেকে আর মাথাই তুলতে পারছে না।

কারিগরের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা সবাই বলেছে, কর্তার ফরমুলা। যা বলবার মালিককে বলতে হবে। তাই সবাই মালিকের বাড়ি এসেছিল।

এসেছিল বটে কিন্তু নাগাল পায়নি। ব্যাপারটার আঁচ পেয়ে শশাঙ্কমোহন সরখেল মামার বাড়ি ভদ্রেশ্বরে পালিয়েছিলেন। তিন মাস আর এ মুখো হননি।

কারবার গেলেও সরখেলের কোন ক্ষতি ছিল না। বাপ অনাদি সরখেল চোখ বোজবার সময় কলকাতায় তিন তিনখানা বাড়ি রেখে গিয়েছিলেন। সব পেয়েছিলেন একমাত্র সন্তান শশাঙ্কমোহন।

শশাঙ্কমোহন বিয়ে-থা করেননি। বলতেন, আজীবন বিজ্ঞানসাধনা করব। বিজ্ঞানই আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে সব।

তারপরই নিস্তারিণী সোপ ওয়ার্কস খুললেন। খোলার মাস ছয়েকের মধ্যেই অবশ্য বিজ্ঞানসাধনার এ দিকটা বন্ধ হয়ে গেল।

তবে শশাঙ্কমোহন দমলেন না। কারখানা বন্ধ হল বটে, কিন্তু বাড়ির একটা ঘরই কারখানা করে তুললেন। এবার আর সাবান কিংবা ওষুধবিষুধ নয়,

NOT FOR SALE

একেবারে গ্রহনক্ষত্র নিয়ে পড়লেন। একটা মস্ত বড় সুবিধা, কোন গোলমাল হলেও, মঙ্গল, শুক্র, বুধ এরা দলবল নিয়ে বাড়ি ঘেরাও করবে না।

সন্ধ্যাবেলা খাওয়াদাওয়া সেরে শশাঙ্কমোহন একেবারে চিলেকোঠায় উঠে যেতেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব বিশেষ কেউ ছিল না। কেউ দেখাও করতে আসত না। তবু চাকর ভজহরিকে কড়া নির্দেশ দেওয়া ছিল, এ সময় যেন কেউ তাঁকে বিরক্ত না করে। বিজ্ঞানসাধনার পথ বড় কঠিন পথ। বাধা পেলে সব কিছু বানচাল হয়ে যেতে পারে। তাতে শশাঙ্কমোহনের চেয়েও পৃথিবীরই ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।

চিলেকোঠায় নানা যন্ত্রপাতি ভরতি। পুরোনো আমলের একটা টেলিস্কোপ ছিল। শশাঙ্কমোহন অনেক টাকা দিয়ে নীলাম থেকে কিনেছিলেন।

একটা উঁচু টুলের ওপর বসে সেটার একদিকে চোখ রেখে তিনি অনেক রাত পর্যন্ত গ্রহনক্ষত্রের রহস্য নিরীক্ষণ করেন। মাঝে মাঝে রাত কেটে ভোরও হয়ে যায়।

রাশিয়ার চাঁদে অবতরণ নিয়ে সারা বিজ্ঞানীমহলে যখন হইচই, তখন একমাত্র শশাঙ্কমোহন চুপচাপ। শুধু চুপচাপ নয়, পাড়ার দু-একজন খবরের কাগজ পড়বার লোভে তাঁর বৈঠকখানায় যখন জড় হল, তখন শশাঙ্কমোহন পরিষ্কার বলে দিলেন, ব্যাপারটা একটা মহা ধাপ্পা।

মহা ধাপ্পা? পৃথিবীর লোক চাঁদে লুনার অবতরণ নিয়ে হুলুস্থুল করছে, আর আপনি বলছেন ধাপ্পা?

শশাঙ্কমোহন সশব্দে টেবিল চাপড়ে বললেন, হ্যাঁ, বলছি ধাপ্পা। আমি বৈজ্ঞানিক, আমি কখনও বাজে কথা বলি না। যা বলি, তা প্রমাণ করি। যা প্রমাণ করতে পারব, তাই বলি।

লোকেরা দু-একটা কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু থেমে গেল। একটি কথাও বলল না, কারণ শশাঙ্কমোহনের ভৃত্য একটা ট্রের ওপর চায়ের কাপ সাজিয়ে ঘরে ঢুকছিল।

সচরাচর শশাঙ্কমোহন কোনদিন পড়শীদের জন্য একটি পয়সাও খরচ করেন না। ভাল করে কথাও বলেন না, কিন্তু আজ তাঁর বিপরীত ব্যবহার দেখে সবাই অবাক্।

বসুন আপনারা, আপনাদের সঙ্গে আলোচনা আছে।

NOT FOR SALE

সবাই বসল। আলোচনা না থাকলেও বসত, কারণ চায়ের কাপগুলো টেবিলে পৌঁছে গেছে। গ্রহনক্ষত্র আমার নখদর্পণে তা আপনারা জানেন? একটি ইজিচেয়ারে শশাঙ্কমোহন কাত হলেন, প্রায় সারাটা রাত আমার সৌরমণ্ডলেই কাটে।

কেউ কোন কথা বলল না। চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল।

কাল রাত্রেও আমি সোমদেবকে পর্যবেক্ষণ করেছি কিন্তু লুনার কোন চিহ্ন দেখতে পাইনি। একটা কালো বিন্দু নিশ্চয় আমার চোখে পড়ত।

একেবারে পাশের বাড়ির হরিশবাবু, তাঁর চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন, তা হলে এত বড় বড় বিজ্ঞানীরা মিথ্যা কথা বলছে? রাশিয়া যে এ রকম একটা কিছু করবে এ তো বহুদিন থেকেই আমাদের জানা। চাঁদে যাবার জন্য রাশিয়া আর আমেরিকার মধ্যে প্রতিযোগিতা। রাশিয়াই জিতল।

শশাঙ্কমোহন একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুললেন। তারপর সেই পাটা নাচাতে নাচাতে বললেন, রাশিয়া বা অন্যদেশের বিজ্ঞানীরা যে মিথ্যা বলছে, তাতো আমি বলছি না।

তবে? সমবেত চিৎকার।

ভুল হতে পারে। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। বিজ্ঞানীরা মানুষ।

বিজ্ঞানীদের ভুল?

পড়শীদের মধ্যে চিন্তাহরণ চাকলাদার সবচেয়ে কমবয়সী। এমন অবিশ্বাস্য কথা শুনে বেচারীর বিষম লাগল। বেদম কাশতে আরম্ভ করল।

আহা, কে নাম করছে। একজন বলল।

কেউ নাম করছে না। চা কণ্ঠনালীতে না গিয়ে বায়ুনালীতে ঢুকে গেছে তাই এই বিপত্তি। একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে। যাক, আপনারা আমার কথা শুনুন।

শশাঙ্কমোহন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

কয়েকজন বাজার করার ছুতোয় কিংবা বাড়িতে দরকারী কাজ আছে এই অছিলায় বেরিয়ে পড়ল। জনদুয়েক বসে রইল। তারা পাড়ার দুটি বেকার। আবার হয়তো চায়ের কাপ আসতে পারে এই আশায় উঠল না।

একজন খেই ধরিয়ে দিল।

কি বলছিলেন শশাঙ্কবাবু?

NOT FOR SALE

বলছিলাম, বিজ্ঞানীদের ভুল হতে পারে, তাঁরা মিথ্যা হয়তো বলছেন না।

কি রকম?

খুব সম্ভব লুনা অন্য গ্রহে অবতরণ করেছে, চন্দ্রে নয়।

অ্যাঁ, সেকি? অলটিমিটার কি তাহলে ভুল রেকর্ড করেছে? পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব সকলেরই জানা। ঠিক সেই দূরত্বে লুনা গিয়ে চাঁদ স্পর্শ করেছে।

শশাঙ্কমোহন হাসলেন। এডিসন আর জেমস ওয়াট মেশানো হাসি।

বললেন, ঠিক সেই দূরত্বে অন্য কোন গ্রহ অবস্থান করছে না, একথা কি হলফ করে বলা যায়?

কিন্তু সে রকম কোন খোঁজ তো কোন বিজ্ঞানী পাননি।

নভোমণ্ডলের রহস্য এত সোজা হলে আর ভাবনা ছিল কি! প্রতিমুহূর্তে কত নতুন গ্রহের সৃষ্টি হচ্ছে, কত পুরোনো গ্রহ লয়প্রাপ্ত হচ্ছে। তার সন্ধান রাখা কি সম্ভব!

কিন্তু চাঁদে নামেনি তার প্রমাণ কি? একজন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল।

অকাট্য প্রমাণ এই যে, তাহলে আমার টেলিস্কোপে ধরা পড়ত। কিন্তু আমি কাল সারারাতও দেখেছি চাঁদ অক্ষত, অবশ্য তার নিজের কলঙ্কচিহ্ন ছাড়া আর কোন বিন্দু কোথাও নেই। এ ছাড়াও কারণ আছে।

খুব মুরুব্বীয়ানার সুরে শশাঙ্কমোহন কথাগুলো বললেন। সামনে বসা দুজনের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালিত করে।

আমি বলে যাচ্ছি, কোন অসুবিধা হলে বলবেন।

অসুবিধা একটু হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চাকলাদার বলল।

সে কি মশাই, আমি এখনও আরম্ভই করিনি, তার আগেই অসুবিধা। তা অসুবিধাটা কিসের?

আজ্ঞে চায়ের। আর এক কাপ করে চা পেলে হত।

অন্যদিন হলে শশাঙ্কমোহন এসব কথাতে আমলই দিতেন না। ভিড় হবার আগে সব বিদায় করে দিতেন। কিন্তু আজ তাঁর কিছু শ্রোতা দরকার। নতুন যে তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন সেটা লোককে না শোনাতে পারলে তৃপ্তি নেই।

চাকরকে ডেকে আরো দু' কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন।

চা আসতে আবার বলতে আরম্ভ করলেন।

চাঁদের নিজস্ব কোন কিরণ নেই আপনারা নিশ্চয় জানেন। যে কোন

NOT FOR SALE

শিশুপাঠ্য ভূগোলে এ কথা পড়েছেন। চাঁদের যে জ্যোতি আমরা দেখতে পাই তা সূর্যের প্রতিফলিত রশ্মি।

অবিকল মাধব নন্দীর মতন।

চাকলাদার চুমুক দেবার ফাঁকে পাঁকে ফোড়ন কাটল।

শশাঙ্কমোহন ঢোক গিললেন।

চাঁদের সঙ্গে মাধব নন্দীর তুলনা।

কে মাধব নন্দী?

ওই যে রায়বাড়ির, সরকার। বাবুর চেয়েও এককাঠি সরেশ। বাবুর আলোয় নিজে দেদীপ্যমান। সূর্যের আলোয় চাঁদের ভাস্বর হওয়ার ব্যাপার আর কি!

ও, তা হবে। শুনুন যা বলছি। কাগজে দেখেছেন তো লুনা চাঁদের গায়ে মিশে যাচ্ছে এমনই নরম মাটি সেখানকার। অবশ্য মাটি নাও হতে পারে, হয়তো ভস্ম কিংবা অন্য কোন ধরনের খুব মিহি ধাতু যার পরিচয় আমরা পৃথিবীর লোক জানি না। সেখানে—

একেবারে জল। চাকলাদার বাধা দিল।

জল? জল কি মশাই? জল নেই একটুও। জল থাকলে তো ভাবনাই ছিল না।

না, না, চাঁদের কথা বলছি না, চায়ের কথা বলছি। আপনার ভজহরি একেবারে ঠাণ্ডা জল দিয়েছে এক কাপ। না দুধ, না চিনি।

যাক শুনুন কথাটা, শশাঙ্কমোহন চায়ের চেয়েও চাঁদের ব্যাপারে বেশি আগ্রহশীল। সূর্যের রশ্মি প্রতিফলিত করতে হলে জল, কিংবা কাঁসা, রুপো, সোনা জাতীয় ধাতু দরকার, যার ওপর সূর্যের আলো পড়লে আলোটা ঠিকরে যেতে পারে। কাঁচ থাকলেও প্রতিফলন সম্ভব। জমাট বালি থাকলে তা থেকে কাঁচের কাজ হতে পারে। সমুদ্রের ধারে সূর্যের কিরণ পড়লে বালি চিকচিক করে নিশ্চয় দেখেছেন। সিলিসিক অ্যাসিড—

কথা বলতে বলতে শশাঙ্কমোহন আবেশে দুটো চোখই বন্ধ করে ফেলেছিলেন, চোখ খুলেই হতভম্ব হয়ে গেলেন।

ঘর খালি। কেউ নেই। অবশ্য চায়ের কাপ দুটোও খালি।

শশাঙ্কমোহনের নিমীলিত চক্ষুর অবকাশে দুজন পড়শীই পালিয়েছে।

NOT FOR SALE

শশাঙ্কমোহন উঠে দাঁড়ালেন। বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললেন, মহামূর্খ, বিজ্ঞানচর্চায় কোন উৎসাহ নেই। এইজন্যই দেশের এই অবস্থা।

সোজা একেবারে চিলেকোঠায় চলে এলেন। যন্ত্রপাতির পাশে মাঝারি সাইজের একটা টেবিল। তার ওপর নানারকম নকশা আঁকা এক গাদা কাগজ। সৌরমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি। অন্য সব গ্রহ উপগ্রহের ছবি। শশাঙ্কমোহনের নিজের হাতে আঁকা।

শুধু পড়শীদের নয়, পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের অজ্ঞতায় তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। লুনা যে চন্দ্রগ্রহে অবতরণ করেনি, এ সত্যটা বলবার মতন বুদ্ধি কারো নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে ভিটামিনের অভাব চলেছে, তাতেই এই দুর্দশা। বিজ্ঞানীদের মাথাতেও কিছু নেই। সেইজন্যই কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, আইনস্টাইনের পরে প্রাকৃতিক জগতে নতুন কিছু আবিষ্কার হচ্ছে না।

ঠিক এই সময় ভজহরি কাঁচের গ্লাসে তরল পানীয় নিয়ে এল।

শশাঙ্কমোহন সাগ্রহে গ্লাসটা টেনে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করলেন।

ব্রাহ্মীশাক, উচ্ছে, থোড় আর নিমপাতার নির্যাস। প্রতিদিন নিয়ম করে এটা পান করেন বলেই শশাঙ্কমোহনের মাথা এত সতেজ। রাশিয়া তাঁকে ধাপ্পা দিতে পারেনি।

রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর ভজহরি শশাঙ্কমোহনকে কড়া করে তিন কাপ কফি করে দিল। শশাঙ্কমোহন আজ সারারাত জাগবেন। লুনা যে চন্দ্রে অবতরণ করেনি এই সহজ সত্যটা তাঁকে জগতের সামনে প্রমাণ করতেই হবে। মুশকিল হয়েছে তাঁর লেখা বড় বড় সংবাদপত্র আর মাসিক পত্রিকা আবার ছাপতে চায় না। সাবান তৈরি করার সময় একাধিকবার শশাঙ্কমোহন গোটা দুয়েক প্রবন্ধ ছাপাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হননি। প্রবন্ধ দুটি ফেরত দিয়ে সম্পাদক লিখেছিল যে প্রবন্ধ দুটি নাকি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। স্থানে স্থানে রসায়নজ্ঞানের অভাবও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। শশাঙ্কমোহন রাগে মাথার অর্ধেক চুল ছিঁড়েছিলেন। মনে মনে ভেবেছিলেন প্রবন্ধ দুটি ইংরেজিতে তরজমা করে বিলাত কিংবা আমেরিকার কোন কাগজে পাঠাবেন, কিন্তু তার আগেই সাবানের কারখানা বন্ধ হয়ে গেল, লোকের হইহল্লায়। প্রবন্ধ পাঠানো আর হয়ে উঠল না।

এবার কিন্তু অন্য ব্যাপার।

NOT FOR SALE

শশাঙ্কমোহন কফি খেয়ে তৈরি হয়ে চিলেকোঠায় চলে এলেন। ঠেলে ঠেলে টেলিস্কোপটা একটু এগিয়ে নিয়ে গেলেন। চেয়ারের পাশে টেবিল রাখলেন। টেবিলের ওপর মোটা সাইজের খাতা আর কলম।

সারারাত ধরে যা দেখবেন সব লিখে নেবেন খাতায়। কিছু বাদ না পড়ে। তারপর খেটেখুটে, নানা তথ্য দিয়ে ভরাট করে, ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধের থান ইট তৈরি করে শুধু পড়শীদের নয়, সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীমহলে ছুঁড়ে মারবেন।

দশটা বাজতেই শশাঙ্কমোহন কাজ শুরু করলেন।

সেদিন পূর্ণিমা। সন্ধ্যা হতেই কাঁসার থালার মতন চাঁদ দেখা গেল। চারদিক আলোয় ঝলমল করছে। চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করার পক্ষে খুব উপযুক্ত সময়।

শশাঙ্কমোহন টেলিস্কোপে চোখ রাখলেন।

খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন, চাঁদের বুকে লুনার চিহ্নও নেই। তিনি যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই হয়েছে। চাঁদের কাছাকাছি কোন উপগ্রহে লুনা অবতরণ করেছে আর রাশিয়া সেই উপগ্রহকে চাঁদ বলে ভুল করেছে।

নতুন কোন উপগ্রহ যার আজ পর্যন্ত নামকরণ হয়নি। বিজ্ঞানীরা যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আজও অজ্ঞান। কিছু বলা যায় না, এই আবিষ্কারের পরে শশাঙ্কমোহনের নামেই হয় তো উপগ্রহটি নামকরণ হবে 'শশাঙ্কাস্'।

শশাঙ্কমোহন স্থির করলেন চাঁদকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে তারপর টেলিস্কোপ দিয়ে সেই নতুন উপগ্রহের সন্ধান করবেন। সেই উপগ্রহেই লুনার খোঁজ পাওয়া যাবে। তারপর ব্যাপারটা রাশিয়ার চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেই হবে।

চাঁদের ভৌগোলিক তথ্য শশাঙ্কমোহনের প্রায় নখদর্পণে। অনেকগুলো নকশাও নিজের হাতে এঁকে রেখেছেন। কোথায় আলো, কোথায় জমাট অন্ধকার, সব তাঁর জানা।

চোখ সরাতে গিয়েই শশাঙ্কমোহন থেমে গেলেন।

একি কাণ্ড! এমন মারাত্মক দৃশ্য তো এর আগে তাঁর চোখে পড়েনি।

শশাঙ্কমোহন কোঁচার খুট দিয়ে দুটি চোখ বেশ ভালভাবে মুছে নিলেন। টেলিস্কোপের কাঁচটাও মুছলেন।

কিন্তু দৃশ্যের কোন পরিবর্তন হল না।

NOT FOR SALE

ঠিক চাঁদের ওপর দিকে কালো একটা নালা। বর্ণ দেখে রীতিমত গভীর বলে মনে হচ্ছে। এতদিন ধরে চাঁদ নিয়ে চর্চা করছেন, এ নালা কোনদিন শশাঙ্কমোহনের চোখে পড়েনি। এমন কি আগের রাতেও প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে শশাঙ্কমোহন চাঁদের দিকে চোখ রেখে বসেছিলেন, এ নালা দেখতে পান নি।

অ্যাঁ! শশাঙ্কমোহন আর্তনাদ করে উঠলেন।

শশাঙ্কমোহনের দোষ নেই, অন্য যে কোন লোকই এমন অবস্থায় ঠিক একই ভাবে চিৎকার করে উঠত।

গভীর নালাটা দুলছে। খুব আস্তে আস্তে। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। আবার ডান দিক থেকে বাঁ দিকে।

এরপর শশাঙ্কমোহনের বসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হুররে বলে চিৎকার করেই নাচতে শুরু করলেন। নাচতে অবশ্য শশাঙ্কমোহন জানেন না, কোন বৈজ্ঞানিক বিখ্যাত নৃত্যবিদ্ এমন খবর জানা নেই। ফলে সুসংবদ্ধ নাচ নয়, এলোপাথাড়ি হাত-পা ছোড়া আরম্ভ হল। সেই সঙ্গে লাফ। এমন একটা আবিষ্কার বিজ্ঞানীমহলে কি পরিমাণ আলোড়ন তুলবে, ভাবতেও শশাঙ্কমোহন উন্মাদ হয়ে উঠলেন। ফলে নাচ থামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

কিন্তু বিধি অসীম দয়াবান. চিলেকোঠার ছাদটা যে বেশ নীচু, লাফ দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে শশাঙ্কমোহন সে কথাটাই বিস্মৃত হয়েছিলেন।

ফলে, সশব্দে মাথা ঠুকে যেতে শশাঙ্কমোহন মেঝের ওপর বসে পড়লেন।

কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য মাত্র। তারপর আবার উঠে টেলিস্কোপে চোখ রাখলেন।

না, কোন ভুল নেই। নালা কিংবা পরিখাই হবে হয়তো। মাঝে মাঝে স্থির, মাঝে মাঝে দুলছে।

দু' হাতে মাথা চেপে শশাঙ্কমোহন চুপচাপ বসে রইলেন। এত বড় একটা আবিষ্কারের কথা কাকে তিনি প্রথম জানাবেন। রাষ্ট্রপতিকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলে হয়, কিন্তু তারপরই ভাবলেন, লাভ নেই। জানাতে হলে খ্যাতনামা কোন বৈজ্ঞানিককেই জানাতে হয়। ব্যাপারটা তারা যতটা বুঝবে, সমাদর করবে, অন্য কেউ ততটা পারবে না।

কিন্তু ওই নালাটা ওভাবে কাঁপছে কেন? এই সময়ে ভজহরিকে উঠিয়ে একবার এক গ্লাস নির্যাস পান করলে হত। ব্রাহ্মীশাক, উচ্ছে, থোড় আর নিমপাতার নির্যাস। তাহলেই বুদ্ধিটা খুলত।

NOT FOR SALE

শশাঙ্কমোহন উঠে ঘড়ি দেখলেন। রাত দুটো কুড়ি। এ সময় নীচে গিয়ে ভজহরিকে ডেকে তোলাই সমস্যা। তা ছাড়া, এখন এই সাধনার আসন ছেড়ে উঠে গেলে সাধনার বিঘ্ন হবে।

কিছুক্ষণ মাথা চুলকাতে চুলকাতেই সব কিছু জলের মতন পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সহজ ব্যাপারটা এতক্ষণ শশাঙ্কমোহনের মাথায় ঢোকেনি, এটাই আশ্চর্য।

ওটা নালা নয়, পরিখাও নয়। ফাটল। সূর্যের অসহ্য তাপ পড়ছে চন্দ্রের ওপর, সেই তাপে চন্দ্রের ওপরের স্তরে ফাটল ধরা খুবই স্বাভাবিক। দারুণ উত্তাপের জন্যই সর্বদা ভূমিকম্প হচ্ছে। ফাটলটা ভূকম্পনের জন্যই ওভাবে এদিক থেকে ওদিক দুলছে।

কিন্তু ফাটলটা এতদিন দেখা যায়নি কেন? শশাঙ্কমোহন আগের রাত্রেও তো চাঁদ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। কিছু দেখতে পাননি।

সৌরজগতে প্রতিমুহূর্তে কত বিচিত্র পরিবর্তন হচ্ছে কেউ বলতে পারে! নিশ্চয় চাঁদের আশপাশের আবহাওয়া মণ্ডলে কোন বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেছে।

ভাবতে ভাবতেই কথাটা মনে পড়ল।

ইউরেকা বলে লাফ দিতে গিয়েই আবার মাথাটা চিলেকোঠার ছাদে গিয়ে ঠুকে গেল। বেশ সজোরে। শশাঙ্কমোহন পড়লেন। তাঁর ওপর চেয়ারটা কাত হল।

তা হোক, সিদ্ধির পথে অনেক বাধা, অনেক পতন অতিক্রম করতে হয়। অন্য বৈজ্ঞানিকদেরও হয়েছিল।

কলম দিয়ে কাগজের ওপর শশাঙ্কমোহন খসখস করে লিখে গেলেন। চাঁদের পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডলে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার কারণ চাঁদের নিকটবর্তী কোন উপগ্রহে লুনার অবতরণ। একটা বিজাতীয় বস্তু তীব্রগতিতে, মাধ্যাকর্ষণের শক্তি পার হয়ে, সৌরমণ্ডলে এসে হাজির হয়ে সেখানকার সব ব্যবস্থার ওলোটপালোট করে দিয়েছে। সূর্যরশ্মির প্রখরতা বেড়েছে কিংবা চাঁদের সহ্যশক্তি কমেছে। সেইজন্যই এই উপগ্রহে প্রবল ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, যার ফলে বিরাট একটা ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে।

এই পর্যন্ত লিখে শশাঙ্কমোহন থামলেন। ফাটলটা আয়তনে বাড়ছে কিনা

NOT FOR SALE

সেটাও লক্ষ্য করতে হবে। পর পর তিন রাত ধরে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করলেই তার অভিজ্ঞ চোখে এটা ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

পর পর তিন রাত শশাঙ্কমোহন দেখলেন। ফাটল কাঁপছে ঠিকই, কিন্তু আয়তনে বাড়ছে না।

আর দেরি নয়। দেশের একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীকে ডেকে তাঁর এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার না দেখানো পর্যন্ত শশাঙ্কমোহনের স্বস্তি নেই। প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর একটা মতামত থাকলে বিজ্ঞানীমহলে শুধু নয়, দেশের লোকও স্বীকার করে নেবে।

তারপর, তারপর কি হবে, শশাঙ্কমোহন আর ভাবতেই পারলেন না। দেশ-বিদেশে হইহই পড়ে যাবে। চারদিকে শুধু বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ আসবে। শুধু এ দেশে নয়, সাগরপারেও।

অনেক ভেবেচিন্তে শশাঙ্কমোহন ঠিক করলেন সত্যেনবাবুকে নিয়ে আসবেন। শ্রীসত্যেন বোস। বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ। নিরহংকার, অমায়িক ভদ্রলোক। লুনার চাঁদে অবতরণ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলছেন কিনা শশাঙ্কমোহন স্মরণ করতে পারলেন না। আর বলে থাকলেও শশাঙ্কমোহন তাঁর নতুন আবিষ্কারটা বোঝালেই তিনি লুনার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারবেন।

খাওয়াদাওয়া সেরে শশাঙ্কমোহন বেরিয়ে পড়লেন। সত্যেনবাবুকে খবর দেবার জন্য। এখনও চাঁদের আয়তন বড় থাকতে থাকতেই এলে ভাল। তাহলে কম্পমান ফাটলটা পরিষ্কার দেখতে পাবেন।

শশাঙ্কমোহন যখন সত্যেনবাবুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছলেন, তখন দুপুরের রোদ কমে এসেছে। বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে সত্যেনবাবু শুয়ে ছিলেন। হাতে একটা বই।

শশাঙ্কবাবু স্লিপ দিতেই ডেকে পাঠালেন।

সৌম্য সুন্দর চেহারা। মুখে-চোখে প্রতিভার ছাপ।

বইটার দিকে উঁকি দিয়েই কিন্তু শশাঙ্কমোহন হতাশ হলেন। ফকির লেনে জোড়া খুন। এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক বসে বসে গোয়েন্দা কাহিনী পড়ছেন!

কি দরকার বলুন?

আজ্ঞে, চাঁদে একটা ফাটল আবিষ্কার করেছি। কম্পমান ফাটল।

আপনি চাঁদে গিয়েছিলেন? কিসে গিয়েছিলেন? ফিরলেন কবে?

NOT FOR SALE

সত্যেনবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

না, যাইনি এখনও। তবে যা ব্যাপার হচ্ছে, যেতে একবার হবে। পৃথিবীর লোক চাঁদ সম্বন্ধে যা-তা রটাচ্ছে। আমি টেলিস্কোপে রাতের পর রাত পর্যবেক্ষণ করে ফাটলটা আবিষ্কার করেছি। ফাটলটা কেন কাঁপছে, তার কারণও একটা বের করেছি। অবশ্য বৈজ্ঞানিক কারণ। আপনি যদি দয়া করে আজ রাত্রে একবার আমার বিজ্ঞানাগারে পদার্পণ করেন, তাহলে নিজের চোখে সব দেখতে পাবেন। সামান্য প্রচেষ্টা, কিন্তু আপনি এটুকু বুঝতে পারবেন রাতের পর রাত কি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। আর লুনা যে চাঁদে অবতরণ করেনি এটাও আপনাকে বুঝিয়ে দেব। চলুন স্যার।

সত্যেনবাবু উজ্জ্বল দুটি চোখ মেলে শশাঙ্কমোহনের আপাদমস্তক দেখলেন। ঠোঁটের দুটি প্রান্ত একটু বুঝি ঝুলে পড়ল। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, আমার তো যাওয়া সম্ভব হবে না। রোজ রাত্রে কতকগুলি অধ্যাপক আসেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনার কাজ থাকে। আমি আপনাকে ভাল একটি লোক দিচ্ছি।

পিছন ফিরে সত্যেনবাবু জলদগম্ভীর গলায় ডাকলেন, অরিন্দম, অরিন্দম।

পাশের কামরা থেকে একটি অল্পবয়সী ছোকরা বের হয়ে এলেন। ফরসা, কৃশদেহ। পরনে প্যান্ট, আর শার্ট। শার্টের হাতা গোটানো।

ইনি অরিন্দম বসু। আমার ছাত্র। অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করছেন। এঁকে নিয়ে যান। পরে এঁর কাছ থেকে আমি সব শুনে নেব।

অগত্যা শশাঙ্কমোহন অরিন্দমকে নিয়েই ফিরে এলেন।

রাত হতেই শশাঙ্কমোহন চিলেকোঠায় হাজির হলেন। সঙ্গে অরিন্দম। প্রথমে নিজে টেলিস্কোপে চোখ রেখে দেখলেন, তারপর বললেন, এই দেখুন স্যর, আজ যেন ফাটলটা আরো ভীষণ কাঁপছে। রাশিয়া আবার একটা লুনা পাঠাল কিনা ঈশ্বর জানেন।

অরিন্দম কিছুক্ষণ অবাক্ চোখে শশাঙ্কমোহনের দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর টেলিস্কোপে চোখ দিলেন।

ওপরের দিকে দেখুন। চাঁদের উত্তর দিকে। দেখছেন কালো একটা রেখা ভীষণ কাঁপছে।

শশাঙ্কমোহন অবিরাম গতিতে বলে যেতে লাগলেন।

মিনিট কয়েক, তারপরই অরিন্দম টেলিস্কোপের কাছ থেকে সরে এসে

NOT FOR SALE

সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন তারপর শশাঙ্কমোহনের দিকে ফিরে বললেন, এদিকে আসুন।

বিস্মিত শশাঙ্কমোহন এগিয়ে গিয়ে অরিন্দমের পাশে দাঁড়ালেন।

ওই দেখুন আপনার চাঁদের ফাটল। অরিন্দম আঙুল দিয়ে দেখালেন। এই দেখার জন্য স্যরকে আনতে চাইছিলেন?

চিলেকোঠার ছাদের এক কোণে চড়াইপাখির বাসা। সেখান থেকে একটা খড় ঝুলছে। আজ বাতাস জোর, তাই খুব দুলছে খড়টা।

শশাঙ্কমোহন বুঝলেন টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে ওই খড়টুকুই ফাটলের রূপ নিয়েছে। আর বাতাসের জন্যই সেটা কম্পমান। শশাঙ্কমোহনের চোখের সামনে সমস্ত সৌরমণ্ডল তার গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঘুরতে লাগল। থামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

———

NOT FOR SALE

দামোদর অপেরা পার্টি

সারা বাসন্তীপুর গ্রামের চোখে ঘুম নেই। আর মাঝখানে দুটো দিন। তারপরই দামোদর অপেরা পার্টি এসে হাজির হচ্ছে। অতবড় অপেরা পার্টি যে এ গাঁয়ে আসছে এ শুধু রায়বাবুদের কৃতিত্ব। মোটা টাকা দাদন দিয়েছেন, শুধু তাই নয়, রায়েদের ছোট ছেলে নিজে গিয়েছেন কলকাতায়। অধিকারী দামোদর পতিতুণ্ডির সঙ্গে দেখা করে সব বন্দোবস্ত করে এসেছেন। কথা ছিল দু'দিন থিয়েটার হবে, কিন্তু দামোদর হাত জোড় করেছে। সে সম্ভব নয়। হাজীপুরের ছোট তরফ বায়না দিয়ে রেখেছেন। মনসা পূজোর দিন হাজীপুরে যেতেই হবে।

ঠিক আছে। তাই সই। ছোটবাবু ফিরে এলেন—গোঁফে তা দিয়ে এইবার নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে। মানিকচকের ওরা আর কিছু করতে পারবে না।

মানিকচকের কুণ্ডুরাও ঠিক করেছিল এই দামোদর অপেরা পার্টিকে নিয়ে যাবে। সেজন্য চাঁদা আদায়ও শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। খবর পেয়ে বাসন্তীপুরের সবাই রায়বাড়ির দেউড়ীতে ধর্না দিয়েছিল। মানিকচকের কাছে বাসন্তীপুর হারবে, তা কি হতে পারে, তা হয়েছে কখনও?

রায়বাড়ির দুই ছেলে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন, ঠিক আছে। চিন্তা করো না। দামোদর অপেরা পার্টি আমরা আনবই। যত টাকাই লাগুক। মানিকচকের কুণ্ডুদের কাছে মাথা নোয়াব না।

কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। বাসন্তীপুরের লোক বেড়াতে বেড়াতে মানিকচকে গিয়ে বলে এল। মনসা পূজোর আগের দিন থিয়েটার হচ্ছে কদমতলার মাঠে। পার্টির বিখ্যাত বই 'সীতার বনবাস'।

মানিকচকের দু'একজন টিটকারিও দিল।

গত বছরের মতন না হয় যেন ভায়া! 'কুরুক্ষেত্রে গান্ধারী'।

পাগল নাকি, বাসন্তীপুরের লোক প্রতিবাদ করেছে, এবার মেয়ের পার্টে মেয়েরাই নামবে। দেখতে যেয়ো। দড়িদড়া দিয়ে বেশ করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে যেও নিজেদের, নয়তো হিংসেয় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

গত বছরে অবশ্য একটা কেলেঙ্কারি হয়েছিল।

NOT FOR SALE

এ দল নয়, বর্ধমান থেকে ইউনিয়ন থিয়েটার কোম্পানী এসেছিল। মেয়ের পার্টে দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ছেলেরাই নামে। কিন্তু কে বলবে ছেলে। হাবভাব চলন-বলন অবিকল মেয়েলি।

তা না হয় হল, তা বলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে তো আর যাওয়া যায় না!

শেষ দৃশ্য। 'কুরুক্ষেত্রে গান্ধারী'। স্টেজে ঢুকল চোখে কাপড় বেঁধে। স্টেজের উপর মৃতদেহ ছড়ানো। এক একটা দেহ ছুঁচ্ছে আর বিলাপ করছে। খুব করুণ দৃশ্য। দর্শকের চোখে জল আসার কথা, প্রায় এসেও ছিল। এমন সময় কাণ্ডটা ঘটল।

একেবারে সামনে এসে বসল গান্ধারী। উজ্জ্বল আলোর মুখোমুখি। প্রথম সারির লোকেরা হাসাহাসি শুরু করল, তারপর সেই হাসির স্রোত সারা আসরে ছড়িয়ে পড়ল।

সেই বিকালে গান্ধারী গোঁফ-দাড়ি কামিয়েছিল, এখন প্রায় ভোর পৌনে পাঁচ। কচি ধানচারার মতন গান্ধারীর দু'গালে দাড়ির খোঁচা। গোঁফের কালো রেখাও প্রকট।

চোখে কাপড় বেঁধে গান্ধারী নিস্তার পেল। এ দৃশ্য তাকে দেখতে হল না। কিন্তু দর্শকরা হেসে খুন।

শেষকালে অধিকারীমশাই নিজের হাতে সিন টেনে নিষ্কৃতি পেলেন।

দামোদর অপেরা পার্টি একদিন আগে এসে হাজির হল। মেয়েরা এল পাঁচখানা গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে। পুরুষরা হেঁটে। থাকার ব্যবস্থা রায়বাড়ির অতিথিশালায়।

সারা বাসন্তীপুর ভেঙে পড়ল রায়বাড়ির উঠানে! তাদের কৌতূহল অভিনেত্রীদের ঘিরে। মেয়ের পার্টে মেয়েরা করে এমন দল তারা এর আগে আর দেখেনি। বাড়ির ঝি-বৌরা পর্যন্ত লজ্জা-শরম ভুলে গাছের ফাঁকে ফাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে।

সকলেরই নজর সুন্দর একটি মেয়ের ওপর। বয়স উনিশ কুড়ির বেশি নয়। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। টানা চোখ। পানের রসে ঠোঁট দুটি রাঙা।

কেউ বলল, ওই সীতা, কেউ বলল সরমা। আবার একজন যে আনতে গিয়েছিল স্টেশনে, সে অন্য সকলকে বোঝাল, না, না, ও সীতাও নয়, সরমাও

NOT FOR SALE

নয়। সীতার বনবাসে আবার সরমা কোন্ চুলোয়। ও হচ্ছে বিবেক। কি গলা, মানুষকে কাঁদিয়ে দেবে।

কমবয়সী এক ছোকরা টিপ্পনী কাটল, ভাল গান গায় কি করে জানলে, পাঁচকড়িদা, গান শোনালে নাকি?

পাঁচকড়ি চটল। বেশি পাকামো করিসনে গোপলা। আমরা শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলে চিনতে পারি। একটু গুনগুন করছিল, আমি ঠিক ধরে ফেলেছি। তোরা ভাবিস পাঁচকড়ি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় বলে, রাস্তার লোক। তা নয়। আমার ঠাকুর্দা তিনকড়ি সরখেল। ঘরের কোণে তানপুরো রাখতেন আর আসনে গঙ্গাজল ছিটিয়ে খাম্বাজ রাগিণী ধরতেন। গানের তালে তালে তানপুরো টুং টাং করে বেজে উঠত।

এর পরে আর কথা আছে?

পাঁচকড়ি থামল না। আরও দু' একটা পরিচয় করিয়ে দিল।

ওই যে মোটা মতন মেয়েছেলেটি পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাসছে, ওই সীতা সাজে। মণিমালা দেবী। প্রত্যেক রাতে চারটে করে মেডেল বাঁধা। পাতাল প্রবেশের পর দশ মিনিট পর্যন্ত আসরে হাততালি চলে।

বাবা, ওই অত মোটা! একেবারে ঘাড়ে গর্দানে! সীতা মানায় ওকে?

বাসন্তীপুরের কে একজন বলল।

খোদ অধিকারী ইঁট খুঁজতে এদিকে আসছিল, কথাটা তার কানে যেতে খিঁচিয়ে উঠল।

বলি, মূল রামায়ণ পড়া আছে মশাইদের? সীতার কাজটা কি ছিল? রাক্ষসপুরীতে চোর্বচোষ্য ভোজন আর অশোক কাননে বসে বসে চেড়ীদের সঙ্গে গালগল্প? কোন খাটুনী ছিল? একটু নড়ে-চড়ে বসা? গায়ে মাংস লাগবে না কেন বলুন? বাত যে ধরেনি, এই রামের বাপের ভাগ্যি!

ইঁট তুলে নিয়ে দামোদর পতিতুণ্ডি ফিরে গেল।

পাঁচকড়ি সারাটা রাস্তা অপেরা পার্টির সঙ্গে এসেছে। অনেক মজাদার কাহিনী শুনেছে। সেগুলো গাঁয়ের লোককে বলতে না পারলে স্বস্তি নেই। সব বলবে, আগে তো মানুষগুলোকে চিনিয়ে দিক।

প্যাঁটরা বগলে করে যে কালো মতন লোকটা রোয়াকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, ওই সংসার বিরাগী মহর্ষি বাল্মিকী। সীতা তপোবন ছেড়ে অযোধ্যায়

NOT FOR SALE

ফিরে যাবার সময় কি কান্না কাঁদে লোকটা। আসরে কারো চোখ শুকনো থাকে না। এখানে এই কান্নার পার্ট, আর 'চক্রধারী' বইতে কংস সেজে সে কি দাপাদাপি! তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে নিজের গালপাট্টা খানিকটাই উড়িয়ে দিল একদিন। ভাগ্যিস নকল গালপাট্টা।

এমন ভাবে পাঁচকড়ি বলে, যেন নিজের চোখে সে দামোদর অপেরা পার্টির অভিনয় দেখেছে। রাতের পর রাত।

সে দিনটা কোন রকমে কাটল। পরের দিন ভোরে সবাই ছুটল কদমতলার মাঠে। আসর তৈরী হচ্ছে। বড় বড় প্যাকিং কেস খোলা হয়েছে। সাজ-পোশাকে ভর্তি।

অধিকারী বসে আছে একটা উঁচু প্যাকিং কেসের ওপর। লক্ষ্মণ আর বশিষ্ঠ দাঁতন করছে। শত্রুঘ্নর গায়ে র‍্যাপার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ম্যালেরিয়া— তার ওপর পিলে। কাল পালাজ্বরের দিন গিয়েছে। মেয়েরা এখনও কেউ ওঠেনি।

শুধু বাসন্তীপুর নয় পাশের মানিকচক আর দেবীপুরের লোকও কিছু কিছু এসে দাঁড়িয়েছে।

মানিকচকের বলাই মণ্ডল পাঁচকড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

পাঁচুদা।

বল? পাঁচকড়ির সময় নেই। একটা কাজের ভার পেয়েছে। প্যাকিং কেস থেকে সাজ-পোশাকগুলো বের করে রোদে রাখছে। তলোয়ার আর তীর-ধনুকগুলো সারি সারি রাখছে মাঠের ওপর।

বলাই মণ্ডল ভয়ে ভয়ে বলল, একটা কথা ছিল।

তা বলবে তো। কথা রইল তোমার পেটে, আমি বুঝব কি করে!

রাম কে সাজছে গো?

অধিকারীমশাই স্বয়ং, ওই যে বসে আছেন প্যাকিং কেসে। এখন প্যাকিং কেসে বসে আছেন, রাত্রে বসবেন সিংহাসনে।

আহা হা, রাম সাজারই চেহারা বটে। তা একবার আলাপ করিয়ে দেবে, ও পাঁচুদা? কথা বলে জন্ম সার্থক করব।

এ আবার একটা কথা। পাঁচকড়ি বলাই মণ্ডলকে নিয়ে দামোদরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রাত পেন্নাম।

NOT FOR SALE

আহা, দিলে তো হিসাবটা গোলমাল করে। তেরো... তেরো, চোদ্দ, চোদ্দ—

অধিকারীমশাই তক্তা গুনছিল। তক্তা গোনা শেষ হতে অধিকারী মুখ তুলে চাইল।

কি ব্যাপার?

পাঁচকড়ি আলাপ করিয়ে দিল, এই বলাই মণ্ডল মানিকচকের। থিয়েটার পাগলা লোক। একসময় নিজেরও খুব শখ ছিল।

বলাই মণ্ডল হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল।

পাঁচকড়ির বসবার অবসর নেই। দামোদর অপেরা পার্টির দেখাশোনার ভার রায়বাবুরা তার ওপর দিয়েছেন। নিয়ে আসা থেকে স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত।

বিকেলের মধ্যে আসর তৈরি। অনেকগুলো হ্যাজাক ঝোলানো হল। স্টেজের ধারে ধারে পেট্রোম্যাক্স। থিয়েটার শুরু ন'টায়, কিন্তু সাতটা থেকেই লোক আসতে আরম্ভ হল। আটটার মধ্যে লোকারণ্য।

পাঁচকড়ি প্রাণান্ত। আসরে ছোটাছুটি করছে। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে স্টেজের মধ্যেও দেখে আসছে। আশ্চর্য কাণ্ড, দিনের বেলায় যাদের খুব সাধারণ বলে মনে হয়েছিল, রঙে সাজে পোশাকে রাত্রে তারা এক একজন অপ্সরা।

রায়বাবুরা এসে বসলেন পৌনে ন'টায়। ন'টায় থিয়েটার শুরু হল। লোকের চোখের পলক পড়ে না। যেমন দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, তেমনি অভিনয়। অধিকারীমশাই মাত করে দিচ্ছে। এক এক লাইন আওড়াচ্ছে, আর দশ মিনিট ধরে হাততালি।

তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত এমনি চলল একটানা, তারপর গোলমাল শুরু হল। পঁচিশ মিনিট কেটে গেল, সীন আর ওঠে না।

লোকেরা চঞ্চল হয়ে উঠল। রায়বাবুরা বিরক্ত। একসময় ছোটবাবু ডাকলেন, পাঁচু, ও পাঁচু।

পাঁচকড়ি ঝিকের আশেপাশে ঘুরছিল। টেঁপি এসেছে। বিরাট খোঁপায় চাঁপাফুল গুঁজে। দেখে দেখে পাঁচকড়ির আর আশ মেটে না। এমন সীতা পেলে পাঁচকড়িও পারে অমনি রামের পার্ট করতে। কিন্তু হবার নয়। টেঁপির বাবা দশ গণ্ডা করকরে টাকা চেয়েছে। এ টাকা জোগাড় করতে পাঁচকড়ির একটা জন্ম কেটে যাবে।

NOT FOR SALE

বাবুর ডাকে পাঁচকড়ি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

ডাকলেন, আজ্ঞে?

দেখে আয় তো একবার, সব ঘুমিয়ে পড়ল নাকি! ড্রপ আর ওঠে না কেন!

পাঁচকড়ি ভিতরে গেল। না, ঘুমিয়ে পড়েনি, কিন্তু অবস্থা তার চেয়েও মারাত্মক। রাম আর বাল্মীকিকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের না পাওয়া গেলে সীন উঠবে কি করে!

সে কি, পাওয়া যাচ্ছে না কি?

ভরত প্রায় কাঁদো কাঁদো। অধিকারী না থাকলে তাকেই সব দেখাশোনা করতে হয়। সেই ম্যানেজার। বিদেশ, বিভুঁই। এখানে থিয়েটার বন্ধ করে দিলে, জনতা মারমুখী হয়ে আক্রমণ করবে, রঘুবংশ ধ্বংস করবে, কাউকে রেহাই দেবে না। জন তিনেক খুঁজতে গেছে রাম আর বাল্মীকিকে।

পাঁচু বাইরে এসে সেই কথাই বলল। খুব চুপি চুপি। আসরের মধ্যে অন্য গাঁয়ের লোকও কিছু রয়েছে। তাদের কানে গেলেই সর্বনাশ। বাসন্তীপুরের মুখ দেখানোই দায় হবে।

রায়বাবুরা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, পুকুরে পড়ে-টড়ে যায়নি তো!

পুকুরে ডুবতে যাবে কেন? তারপর শীতকালের পুকুর। ডুববেই বা কোথায়! রাম এদিক ওদিক করলেও বাল্মীকি রয়েছেন সঙ্গে। রামের সমস্ত জীবনায়ন যাঁর নখদর্পণে তিনি এমন বেয়াক্কেলে কাজ করতে দেবেনই বা কেন!

পাঁচকড়ি আর একজন মিলে খুঁজতে যাবার উপক্রম করবার মুখেই ড্রপ নড়ে উঠল।

সবাই বসল স্থির হয়ে। পাঁচকড়ি সরে গেল একপাশে।

রাজসভা। সিংহাসনে রাম। পাশে বশিষ্ঠ, ভরত আর শত্রুঘ্ন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করার কথা হচ্ছে। যজ্ঞের বিধি—স্ত্রীকে বাম পাশে বসিয়ে ক্রিয়াকলাপ করতে হয়। কিন্তু কে বসবে রামের পাশে? সীতা নির্বাসিতা তমসার তীরে।

বশিষ্ঠের এই কথা শুনে রাম ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল। বইতে এত কান্নাকাটি নেই। শুধু গোটা তিনেক দীর্ঘশ্বাস আছে। রামের কান্না থামে না।

বশিষ্ঠ পাকা লোক। বহু আসর মাত করেছে। বুদ্ধি খরচ করে বানিয়ে বানিয়ে বলল, স্থির হও রঘুপতি। বৃথা কেন করিছ ক্রন্দন।

NOT FOR SALE

বশিষ্ঠ কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে হিতে বিপরীত হল। রাম দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে আবার কেঁদে উল, কি বলছ, বৌ ছেড়ে কি করে থাকব! যেখান থেকে পার তাকে এনে দাও। তা যদি না পার তো এই রইল তোমার মুকুট, রইল তোমার রাজবেশ। অযোধ্যার কাঁথায় আগুন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্র রাজমুকুট ছুঁড়ে ফেলল, গলার মণিমুক্তার হার, সেই সঙ্গে নিজের পরচুল আর গোঁফ।

সীন পড়ে গেল। সবাই অবাক। স্থিতধী পরম প্রাজ্ঞ রামের একি দুর্মতি! প্রিয়ার শোকে এমন আত্মহারা হওয়া কি শোভন!

পাঁচকড়ি যখন ভিতরে ঢুকল, তখন রামচন্দ্রকে মাটির ওপর শুইয়ে ফেলে ভরত আর শত্রুঘ্ন মাথায় জল ঢালছে। আর রামচন্দ্র মুখ দিয়ে এমন সব কথা উচ্চারণ করছে যে, শুনে রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি পর্যন্ত কানে আঙুল দিচ্ছে।

পাঁচকড়ি বাল্মীকির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কি ব্যাপার কি?

কি আর ব্যাপার, খুব টেনেছে। অনেক করে বললুম অধিকারীমশাইকে, বড় পার্ট তোমার, একটু খেয়াল করে গিলো। তা কে কার কথা শোনে!

রামের দুঃখে বাল্মীকি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

পরের সীন আরম্ভ হল। বাল্মীকির তপোবন। সীতা আর বাল্মীকি। সীতা চলে যাবে বাল্মীকির আশ্রম ছেড়ে। একথা বাল্মীকির বহু আগে থেকেই জানা। জানা জিনিস, তবু মনে হতেই মহর্ষির দু'চোখের পাতা ভিজে আসছে। সীতার দুঃখে সমস্ত শরীর টলমল করছে। ভালোভাবে দাঁড়াতেই পারছে না।

সীতার অবস্থা আরও মারাত্মক। কথা বলার প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু গলা দিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ বের হচ্ছে। বাল্মীকির তপোবন ছাড়তে হবে বলে শোকে এত বিমর্ষ হয়েছে জানকী!

লোকের চেঁচামেচিতে এবারও ড্রপ পড়ল।

বিরক্ত মুখে ছোটবাবু স্টেজের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছু বলবেন কি, ব্যাপার দেখে তিনিই হতভম্ব।

সীতা দু'হাতে গলা টিপে বসে আছে। মাঝে মাঝে কাশছে আর বলছে, মাথায় থাক আমার বিপদতারিণীর প্রসাদ। যেমনি দেশ, তার তেমনি নৈবেদ্যের ছিরি।

NOT FOR SALE

ছোটবাবু কিছু বলবার আগেই ঘণ্টা পড়ল ঢং ঢং করে।

ছোটবাবু বাইরে এসে বসলেন।

বাল্মীকির তপোবন। সীতা আর বাল্মীকি। আগের সীনই আবার শুরু হল। সীতা অনেকটা সামলে উঠেছে। মাঝে মাঝে কেবল কাশছে। বিদায় নিচ্ছে বাল্মীকির কাছে। স্বয়ং রামচন্দ্র আহ্বান করেছেন অযোধ্যায়। সেখানে তাকে যেতে হবে। বাল্মীকির স্নেহ ভোলবার নয়। তাই বিদায় নিতে বারবার চোখ জলে ভরে উঠছে।

এইখানে বাল্মীকির অপূর্ব অভিনয় হল। সংসার বিরাগী ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, সুখ দুঃখ চেতনা অনুভূতির অনেক ঊর্ধ্বে কিন্তু নতুন করে মায়াজালে জড়িয়ে পড়ল। সীতা, লব আর কুশ তিনটি গ্রন্থি তার নিরাসক্ত জীবনে।

বাল্মীকি অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সীতার দিকে। মমতামেদুর দৃষ্টি নয়। রোষকষায়িত লোচন।

সীতা থামতেই বজ্রনির্ঘোষে বলল, যাব বললেই হুট করে চলে যাওয়া চলে না, একমাসের নোটিশ দিতে হবে। গৃহকর্মের যেটুকু বাকি আছে, সব করে দিয়ে তবে ছুটি।

সীতা অবাক। দর্শকেরা ততোধিক।

বাল্মীকি একেবারে পাকা গৃহস্থের মতন কথা বলছে। এমনকি নোটিশ দেওয়ার আইনও বাতলাচ্ছে। এ আবার কি রকম মডার্ন রামায়ণ।

মায়াকান্না রাখো। ওতে হনুমান ভুলতে পারে, আমি ভুলছি না। আজকালকার বাজারে যমজ ছেলে নিয়ে দু'বেলা খাওয়ার খরচ জানো? তোমার রামচন্দ্রকে বলবে হিসেব করে টাকা মিটিয়ে দিতে, তবে ছাড়ব।

ব্যাপারটা হয়তো আরও বাঁকা দিকে যেত, বাঁচাল লব আর কুশ। বত্রিশ বছরের লব ও আঠাশ বছরের কুশ ছুটতে ছুটতে এসে মাকে ঘিরে দাঁড়াল। মাগো, দাও মা সাজায়ে, আমরা অযোধ্যাপুরীতে যাব পিতার কাছে।

সীতা ছেলেদের নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

থিয়েটার এখানেই শেষ হল। পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত আর এগোল না।

এগোবার উপায়ও ছিল না। রাম বেঁকে দাঁড়াল। ওসব চলবে না।

পাঁচকড়ি এককোণে দাঁড়িয়ে রামের রুদ্রমূর্তি দেখল। ঊর্মিলা আর বশিষ্ঠ চেপে ধরে আছে তাকে। ভরত পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। হাতে ক্যাশবাক্স।

NOT FOR SALE

এই নিন দাদা, আপনার ক্যাশবাক্স। এই নাকে কানে খত। আর একটি দিনও যদি এই অপেরা পার্টিতে আমি থাকি। কেলেঙ্কারির একশেষ। আপনি অন্য ম্যানেজার দেখুন, আমার দ্বারা হবে না।

ঊর্মিলাও বোঝাল, কি হচ্ছে কি? যত বয়স বাড়ছে তত ভীমরতি হচ্ছে! পাতাল প্রবেশ হবে না কি? বাল্মীকি বসে থাকতে নতুন রামায়ণ তৈরী করবে না কি তুমি!

রাম গর্জন করে উঠল, কে বললে পাতাল প্রবেশ হবে না? আলবাত হবে। তবে প্রত্যেকবার সীতাই বা পাতালে যাবে কেন? খাওয়ার সময় এক একদিন এক একজনের পাতে মাছের মুড়ো পড়ে না? তেমনি এবারে পাতালে যাবে ঐ ছিঁচকাঁদুনে ভরত। রঘুবংশের কলঙ্ক। অমন ভাইয়ে আমার দরকার নাই। শত্রুঘ্ন কই! শত্রুঘ্ন!

একটা প্যাকিং কেসের ওপর কাঁথামুড়ি দিয়ে লবণবিজয়ী শত্রুঘ্ন কোঁ কোঁ করছিল। কোঁ কোঁ করেই বলল, আমাকে আর ওসব ব্যাপারে টানবেন না দাদা। মরছি নিজের জ্বালায়। পালাজ্বর দিন পাল্টেছে। কবিরাজের একটা বড়ি এনে রেখেছিলাম, পেণ্টার ব্যাটা রংয়ের বড়ি ভেবে তাই গুঁড়িয়ে মেয়েদের মুখে মাখিয়ে দিয়েছে—উহুঁ, হুঁ, হুঁ।

শত্রুঘ্ন কাঁথার আড়ালে অন্তর্হিত হল।

পরের দিন মোটঘাট বেঁধে সব রওনা হল। ছোটবাবু ছাড়বার পাত্র নন, যে টাকা দাদন দেওয়া হয়েছে তা ছাড়া একটি বাড়তি পয়সা দিলেন না। এ কি থিয়েটার? এ তো বেলেল্লাপনা। পাঁচখানা গাঁয়ের কাছে বাসন্তীপুরের মাথা হেঁট।

অধিকারীমশাই একেবারে অন্য মানুষ। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল। চোখ মাটির দিকে।

বাল্মীকিকে ধারে কাছে কোথাও দেখা গেল না। প্যাঁটরা বগলে নিয়ে এগিয়ে গেছে স্টেশনের দিকে।

সীতা গরুর গাড়িতে বসে গোটা চারেক ডাবের জল খেয়েছে, কিন্তু গলার জ্বলুনি কমেনি।

পাঁচকড়ি সঙ্গেই ছিল। রেলেও তুলে দিয়ে এল। সারা রাস্তা কিন্তু একটি কথাও বলল না। খুব আশা করেছিল আশপাশের গাঁয়ের লোক, বিশেষ করে

NOT FOR SALE

মানিকচক, অবাক হয়ে সীতার বনবাস অভিনয় দেখবে, কিন্তু যা হল তাতে আর কথাটি বলা যাবে না।

আসল ব্যাপার জানা গেল কিছুদিন পরে। বেশ কিছুদিন।

মানিকচকের বলাই মণ্ডল কথাটা পাড়ল।

কেমন হল হে 'সীতার বনবাস?'

পাঁচকড়ি বিষণ্ণ গলায় বলল, কেন দেখলে তো নিজের চোখে।

কই আর দেখলাম পাঁচুদা! পায়ে কাঁটা ফুটে তিন দিন শয্যাশায়ী।

তেমন সুবিধে হয়নি। প্রথমদিকে ভালই করছিল কিন্তু শেষে সব গোলমাল হয়ে গেল।

তা ওদের আর দোষ কি পাঁচুদা। ঠাকুরদেবতা সাজলে কি হবে, আসলে মানুষ তো।

তার মানে? পাঁচকড়ি অবাক হল। মানে, ধর কেউ যদি গিয়ে ছোটবাবুর নাম করে রাম আর বাল্মীকিকে বলে শিবঠাকুরের প্রসাদ একটু মুখে দিতে হবে। গাঁয়ের এই নিয়ম। তারপর নেশার মুখে কি পরিমাণ জ্ঞান থাকে! পাত্রের পর পাত্র টানলে পায়ের ঠিক থাকে, না পার্টির ঠিক থাকে? তারপর আর একজন গেল পুরোহিত সেজে। মানকচু, ওল, টক দই দিব্যি নৈবেদ্য সাজিয়ে বলল। বিপদতারিণী পুজোর নৈবেদ্য। হাঁ করুন, মুখে ফেলে দিই। ধর্মপ্রাণা সতীসাধ্বী, তার ওপর রামকে হারিয়ে মনের দুঃখও কম নয়।

ঠাকুর দেবতার প্রসাদে না বলতে পারে না। পারে পাঁচুদা?

পাঁচকড়ি হাতের বাঁশের লাঠিটা তোলবার আগেই বলাই মণ্ডল তীরবেগে পালাল।

———

NOT FOR SALE

আরণ্যক

যুক্তির আতস কাঁচ দিয়ে সবকিছুর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন আছে, তেমনি আছে অতীন্দ্রিয় জগৎ। সে জগতে সবকিছু বিচিত্র, সবকিছু যুক্তির মাধ্যমে যাচাই করা চলে না। এই অতি-প্রাকৃত জগৎকে গায়ের জোরে অস্বীকার যারা করে, তারা পৃথিবীর বারো আনা রহস্যের খোঁজ পায় না।

অনেক সময় আমরা মনকে বোঝাই, এসব চোখের ভুল, মনের ভুল, যা ঘটছে নিছক কল্পনা অথবা মনের তৈরি মায়া, কিন্তু সঙ্গোপনে নিজের মনের মুখোমুখি যখন বসি, তখন এসব অবজ্ঞা করা দুরূহ হয়ে ওঠে।

ভণিতা ছেড়ে আসল ঘটনার কথা বলি।

রায়পুর থেকে ছত্রিশ মাইল পশ্চিমে। আধা-শহর। নাম খুরশীদগড়। আধা-শহর বলছি এই জন্য, পাকা রাস্তা আছে, গোটা কয়েক অফিস, একটা পেট্রোল পাম্প, মোটরের কারখানা। পাকা রাস্তার পরিধি পার হলেই নিবিড় জঙ্গল। ছোট ছোট টিলা। কিছুটা অঞ্চল সংরক্ষিত। সরকারী বনবিভাগের।

প্রথম এসেছিলাম বছর দশেক আগে। এক টিম্বার কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে।

কাজ বিশেষ কিছু নয়। জঙ্গল থেকে কাটা কাঠের হিসাব রাখতে হত। দুজন কর্মচারি, মাসান্তে তাদের মাইনে দেওয়া। অবসর সময়ে শিকার।

শিকারের হাতেখড়ি হয়েছিল উড়িষ্যার জঙ্গলে। বাবা সেখানে বনবিভাগে ছিলেন। জরিপের কাজ। তিনিই হাতে করে শিকার শিখিয়েছিলেন। প্রথমে সম্বর, অ্যান্টিলোপ, তারপর বন্য বরাহ; শেষকালে লেপার্ড।

নিজের দক্ষতার ওপর বেশ আস্থা হয়েছিল। এদিক ওদিক থেকে শিকারের জন্য ডাকও আসত।

তারপর খুরশীদড়ে আবার যখন এলাম, তখন আমার পদোন্নতি হয়েছে। এক বিশ্বজোড়া পেট্রোল কোম্পানির আমি ভ্রাম্যমান পরিদর্শক।

NOT FOR SALE

বড় শহর বদলায়। তার রাস্তাঘাট, বাড়ি-বাগানে কয়েক বছর অন্তর রূপ পাল্টায়। কিন্তু খুরশীদগড়ের মতন আধা-শহর শতাব্দীর পর শতাব্দী একরকম থাকে।

পুরনো বাসিন্দারা এসে ঘিরে ধরল। কুশল প্রশ্ন, নিমন্ত্রণের হিড়িক। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প গুজব। আড্ডা ভাঙবার মুখে আদিবাসীর দল এসে দাঁড়াল।

খালি গা, পরনে নেংটি, চুলে পালক গোঁজা। কারো কারো হাতে টাঙ্গি আর বর্শা।

এদের বাস জঙ্গলের মধ্যে ঝর্নার ধারে। রাস্তা তৈরির কাজ করে। মেয়ে পুরুষ দুজনেই।

সারা বছর এ কাজ থাকে না, বিশেষ করে বর্ষাকালে। তখন এরা জঙ্গল সাফ করে চাষবাস করে হরিণ কিংবা পাখি শিকার করে আগুনে ঝলসে খায়।

বাবু তুই এসেছিস—এবার বাঁচা। মনে হল চেনা লোক। দশ বছর আগে আমাকে দেখেছে।

মুখ তুলে দেখলাম, ঠিক তাই, মোড়ল কথা বলছে। চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু পেশী এখনো সতেজ। টান টান চেহারা।

আগের বার বাঁচিয়েছিলি।

এর আগে একবার চিতার উপদ্রব হয়েছিল। এদের ছাগল, মুরগি তুলে নিয়ে যেত। একবার উঠোনে তেল মাখিয়ে একটা বাচ্চাকে রোদে শুইয়ে রেখেছিল, দিন-দুপুরে চিতা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিয়ে উধাও। এক বুড়ো কাছে বসে পাহারা দিচ্ছিল। সে মুহূর্তের জন্য দেখল, একটা হলুদ ঝিলিক উঠোনের ওপর পড়েই আবার মিলিয়ে গেল। সেই সময় এরা দল বেঁধে এসেছিল।

বাবু, তোর বন্দুক নিয়ে একবার চল। আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে।

গিয়েছিলাম।

চিতা শিকার সহজ নয়। বন্দুক হাতে সব সময় সজাগ থাকতে হয়। চিতার থাবার তলায় ডানলোপিলোর প্যাডিং। পাশ দিয়ে গেলেও শব্দ পাওয়া যায় না। তাছাড়া এরা গাছে উঠতেও দক্ষ। যে গাছের তলায় শিকারী বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে আছে, চিতা হয়তো ওঁৎ পেতে রয়েছে সেই গাছেরই ডালে। সুযোগ বুঝে শিকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

NOT FOR SALE

প্রথমত একটা 'কিল' রাখা হল।

ঝর্নার ধারে একটা ঝোপের পাশে মরা মোরগ।

আমি কাছেই একটা গাছের ডালে বসে রইলাম। একদিন , দুদিন গেল, কিছু হল না।

অথচ ঝোপের মধ্যে চিতার ল্যাজ আঁচড়ানোর শব্দ কানে এল। বার দুয়েক পাতার ফাঁকে তার জ্বলন্ত দুটি চোখও দৃষ্টিগোচর হল। কিন্তু চিতা বাইরে এল না।

সম্ভবত সে বাতাসে মানুষের গন্ধ পেয়ে থাকবে। বুঝলাম, এবারে তাকে কাবু করা যাবে না।

আদিবাসীদের বললাম, তোমরা এক কাজ কর, তিনদিক থেকে ঝোপটা পেটাতে শুরু কর। তাহলেই চিতা বের হয়ে পড়বে। ফাঁকা দিকে আমি তৈরি থাকব বন্দুক নিয়ে। বের হলেই গুলি চালাব। এতে বিপদের সম্ভাবনাও যথেষ্ট। মরিয়া চিতা লোকেদের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যার ওপর পড়বে তার নিস্তার নেই। কিন্তু শিকারে কিছু বিপদের সম্ভাবনা থাকেই।

ঝোপের একটা দিকে ঝর্না। ঝর্না এখানে অনেক নিচে। ঝুঁকে পড়লে তবে তার উচ্ছল জলস্রোত দেখা যায়। ঢালু পাড় জঙ্গলে সমাকীর্ণ। সেদিকে বন্দুক তাক করে আমি বসলাম।

এদিকে লোকেরা টিন আর ক্যানেস্তারা পিটতে লাগল। অত্যুৎসাহী দু-একজন কাপড়ের বলে পেট্রোল মাখিয়ে তাতে আগুন জ্বেলে ঝোপের মধ্যে ফেলতে শুরু করল।

কাজ হল। ঝোপের অন্তরাল থেকে চিতার ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল।

প্রায় ঘণ্টা কয়েক পর। ঝোপের মধ্যে একটা তীব্র আলোড়ন। চিতাটা লাফিয়ে শূন্যে উঠল।

পরিষ্কার দিনের আলো। আকাশে ছিটেফোঁটা মেঘ নেই।

হলুদ রঙের একটা বলের আকার। চিতা নিজের শরীরটা গুটিয়ে নিয়েছে। কাচের মার্বেলের মতন জ্বলছে দুটো চোখ। বড় বড় দাঁতের ফাঁক দিয়ে লাল টকটকে জিভটা বেরিয়ে পড়েছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করলাম। পর পর দুটো। প্রথমটা পিছনের পায়ের ওপর লাগল। দ্বিতীয়টা চোয়ালে। চোয়াল ভেঙে যাবার শব্দ হল। শূন্যেই

NOT FOR SALE

ডিগবাজী দিয়ে চিতাটা নিচের ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। তার প্রাণে বেঁচে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। চোয়াল গুঁড়িয়ে যেতে নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু আপশোষ হল, শিকার হাতের মুঠোয় এল না।

খুব অল্প সময়, তবু তার মধ্যে নজর এড়ায়নি। চিতার একটা কান নেই। সম্ভবত বনেবাদাড়ে ঘোরার সময় কাঁটাগাছে লেগে কানটা কেটে গেছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আরও বিস্ময়কর।

চিতার দেহের একপাশে কোন দাগ নেই। ধূসর বর্ণ। পরে দু-একজন পশুতত্ত্ববিদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেছি। তারা কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি।

চিতাটা যে মারা গিয়েছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার আরও একা কারণ ছিল।

তারপর থেকে আর কোনরকম উপদ্রব হয়নি।

দশ বছর পরে আবার সেই উপদ্রব।

বাঁচা বাবু, বাঁচা। সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে।

পিছনে দাঁড়ানো একজন মোড়লের কথার প্রতিবাদ করল।

একি বাঘ যে বাবু বন্দুকে টোটা ভরে মারবে, আর বাঘ খতম। এতো পিরেত বাঘের রূপ ধরে এসেছে।

শুনলাম, কোন মন্তব্য করলাম না।

আদিবাসীদের জগতে ভূতপ্রেতের অবাধ রাজত্ব। হঠাৎ ঝড়ে গাছ পড়ে গেলে সেও অপদেবতার কাণ্ড, আবার গভীর রাত্রে শকুনি শাবকের করুণ কান্নাও প্রেতের কারসাজি।

যা হোক, ঠিক করলাম, পরের দিনই শিকারে বের হব।

মোড়লকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলাম।

চিতার গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষরূপে ওয়াকিবহাল হবার জন্য।

পরের দিন সকালে খাটিয়ায় বসে চা পান করছি, মোড়ল এসে দাঁড়াল।

কি খবর বল?

খবর আর কি বলব বাবু। কাল মোমিন যা বলেছে, কথাটা মিথ্যা নয়।

মোমিন কে? আর সে কি বলেছে?

মোমিন আমার ভাইয়ের ছেলে। সে যে বলেছে, চিতা নয়, অপদেবতা, ঠিকই বলেছে।

NOT FOR SALE

কেন?

তাকে শিকার করা যায় না। মাস ছয়েক আগে বন বিভাগের এক সাহেব এসেছিল। দশ দিন ধরে নাজেহাল। এই দেখল চিতা সামনের এক গাছের আড়ালে, বন্দুক ছুঁড়ল, ব্যস, কোথাও কিছু নেই। একটু পরেই দেখল চিতা পিছনের পাথরের এক ঢিবির পাশে।

শেষকালে সাহেব বন্দুক কাঁধে নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। স্বীকার করেছিল, চিতা নয়, ভৌতিক কিছু একটা।

হেসে বললাম, সাহেব শিকারে যাবার আগে ক'গ্লাস সরাব টেনে নিতেন, সে হিসাব রাখ মোড়ল? শুধু সামনে পিছনে কেন, তেমন হলে চারপাশে চারটে চিতা দেখতে পেত।

আমার রসিকতায় মোড়ল হাসল না।

মোড়লের কাছে শুনলাম, নদীর ওপারে বনের মধ্যে চিতার আস্তানা।

সময় সুযোগ বুঝে সে নদী সাঁতরে এপারে চলে আসে।

দুপুরে যখন এপারের মাঠে আদিবাসী ছেলেরা গরু, ছাগল , চরাতে আসে তখন তাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে চিতা ছোট সাইজের গরু কিংবা ছাগলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। তারপর আধমরা শিকার পিঠে নিয়ে অক্লেশে নদীর পার হয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে যায়।

কোন কোনদিন এপারের জঙ্গলের মধ্যে বসেও আহার শেষ করে। একটা বেপরোয়া ভাব, অকুতোভয়, অসমসাহসিক।

পীতবর্ণের এই অগ্নিশিখা সকলের আতঙ্ক।

আমি বললাম ঠিক আছে, আজ দুপুরবেলা গাছের ডালে বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা করব, ঠিক গোচারণ ভূমির পাশে। হয়তো কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু এছাড়া পথ দেখছি না।

খাওয়াদাওয়ার পর খাঁকি সার্ট আর হাফ প্যাণ্ট পরে তৈরি হচ্ছি, এল গোকুলপ্রসাদ।

আমি যে পেট্রোল কোম্পানির প্রতিনিধি, গোকুল প্রসাদ সেই কোম্পানির এখানকার ডিস্ট্রিবিউটর।

'আমাকে দেখে বলল, একি, রণসাজে কোথায়? অবশ্য কিপা নদীর ধারে হরিয়াল আর তিতিরের ঝাঁক নামে এই সময়।

NOT FOR SALE

পাখি নয় গোকুল, চিতা শিকারের।

দৃশ্যতঃ গোকুল প্রসাদের মুখের রঙ বদলায়। সে গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, জঙ্গলে যে চিতা অত্যাচার করছে, সেটা নাকি?

হ্যাঁ, আদিবাসীর দল এসেছিল। সেই চিতার কথাই বলল।

সর্বনাশ, ও কাজ করবেন না। গোকুল প্রসাদের কণ্ঠে আতঙ্কের স্পর্শ।

কেন?

ওটা চিতা নয়, অশরীরী কিছু।

উচ্চহাস্য করে উঠলাম। জানতাম, গোকুল প্রসাদ কখনো নেশা ভাং করে না। জীবনে বিড়ি সিগারেটও খায়নি। কাজেই নেশার ঘোরে কিছু দেখবে এমন সম্ভাবনা কম।

তবে গোকুল প্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বছর খানেক আগে। তখনে পর্যন্ত সে অকলঙ্ক চরিত্র ছিল বছরখানেকের মধ্যে যদি নেশার দাস হয়ে থাকে তো বলতে পারব না।

তাই প্রশ্ন করলাম, কি ব্যাপার বল তো?

গোকুল প্রসাদ খাটিয়ার ওপর চেপে বসল।

দিন পনেরো আগে আমি রায়পুর থেকে ফিরছিলাম। চাচার বাড়ি থেকে বের হতে দেরী হয়ে গেল। মাঝপথে সন্ধ্যা নামল। আমি গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম। জঙ্গলের পাশের রাস্তায় এসেছি, দেখি ঝোপের ধারে একটা চিতা। বসে বসে নিজের থাবা চাটছে। মোটরের হেড লাইটে তার দুটো চোখ সবুজ মার্বেলের মতন জ্বলে উঠল।

আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে কোন হাতিয়ার নেই। চিতা যদি মোটরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলেই বিপদ।

মরিয়া হয়ে অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিলাম। স্পীডো মিটারের কাঁটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। মোটর বাতাসের বেগে উড়ে চলে গেল।

মাইল দুয়েক গিয়ে মোটরের গতি কমালাম। বাঁক ঘুরতেই এক দৃশ্য। ঝোপের কাছে বসে চিতাটা থাবা চাটছে।

আমি হেসে অভয় দিলাম তোমার কি ধারণা এত বড় জঙ্গলে চিতা মাত্র একটি-ই? আর নেই?

গোকুল প্রসাদ মানতে চাইল না।

NOT FOR SALE

কিন্তু এক চিতা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। এক সহিত, এক বসার ভঙ্গি। পরপর চারবার এক দৃশ্য দেখলাম?

আমি আর কিছু বললাম না।

এ দেশে সিদ্ধিপান নেশার মধ্যে পরিগণিত হয় না। খুব সম্ভব চাচার বাড়িতে গোকুল প্রসাদ সিদ্ধির সরবৎ পান করে থাকবে। তারই কল্যাণে রাস্তার দু-পাশে কেবল চিতাই দেখেছে।

একটু বসে গোকুল প্রসাদ চলে গেল। তারপরই মোড়ল এল।

আমি তৈরিই ছিলাম; মোড়লের সঙ্গে বের হয়ে পড়লাম।

এবার 'কিল' কি হবে? পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম।

একা ছাগলের বাচ্চা এনেছি। সেটাকে গাছের তলায় বেঁধে রাখব। তুই মাচা বেঁধে গাছের ডালে বসবি।

এমন ব্যবস্থায় সন্দেহ প্রকাশ করলাম।

কিন্তু চিতার পক্ষে গাছে ওঠা মোটেই অসুবিধাজনক নয়।

মোড়ল বলল, সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তুই গাছে উঠে গেলে তলার জঙ্গল থেকে কাঁটাগাছ এনে তলায় রেখে দেব। কাঁটাগাছ দেখলে বাঘ সেদিকে ঘেঁষে না।

আয়োজন অবশ্য ভালই, কিন্তু কোন কারণে বিপদের সম্মুখীন হলে দ্রুত গাছ থেকে অবতরণ করার পথ বন্ধ।

আমি শুধু মোড়লকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে গাছে মাচা বাঁধা হবে তার আশেপাশে অন্য গাছ আছে?

মোড়ল মাথা নাড়ল : না।

আমার এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য, চিতাটা পাশের কোন গাছে উঠে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে কিনা?

যখন মাচার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন দুপুরের রোদ স্তিমিত। এমনিতেই ঘন অরণ্যের সঙ্গে সূর্যালোকের প্রবেশ নিষেধ।

জনচারেক লোক অপেক্ষা করছিল। একজনের হাতে দড়িতে বাঁধা ছাগলছানা। সেটার পরিত্রাহি চিৎকারে অরণ্য মুখরিত।

আমি ভেবেছিলাম আমার সঙ্গে কেউ একজন মাথায় থাকবে, কিন্তু, কার্যকালে দেখা গেল কেউ থাকতে রাজী নয়।

NOT FOR SALE

এমনকি মোড়লেরও বাড়িতে মেয়ের অসুখ। তবে যাবার সময় মোড়ল আশ্বাস দিয়ে গেল, আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না, ছাগলছানার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে চিতাটা শীঘ্রই দেখা দেবে।

তাছাড়া, এই সময় বনের জন্তুরা অনেকেই নদীতে জলপান করতে আসে।

অতএব গাছে হেলান দিয়ে বন্দুক কোলে নিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রোদের তেজ ম্লান হয়ে এল। গাছের ছায়া দীর্ঘতর। দু-একটা মেটে রঙের খরগোশ ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। পাখিরা কুলায়ে ফিরল তাদের অপূর্ব কাকলিতে অরণ্যের নীরবতা খানখান হয়ে গেল।

সন্ধ্যা নামল। ঝোপে ঝোপে জোনাকির ঝাঁক। দূরে দু-একটা ময়ূরের ডাক শোনা গেল। কিন্তু চিতার দেখা নেই।

আরও আশ্চর্য; ছাগলছানা নির্ভয়ে ঘুমোচ্ছে। কোনদিক থেকে কোন উপদ্রব হতে পারে, এমন চিন্তা তার নেই।

কাগজে মোড়া খাবার আর ফ্লাস্ক থেকে জল পান করলাম। বুঝতে পারলাম, সারাটা রাত এই রকম ত্রিশঙ্কুর মতন কাটাতে হবে।

এই সময়ে গাছ থেকে নেমে ফেরার চেষ্টা বাতুলতা।

একটু বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, নিশাচর পাখির কর্কশ কণ্ঠস্বরে তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল।

ছাগলছানা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঝোপের পাশে দুটি জ্বলন্ত দৃষ্টি।

বুঝতে পারলাম চিতা ঝোপের মধ্যে অপেক্ষা করছে। সুযোগ বুঝে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এখন আর অন্ধকার নেই। চাঁদের অমল জ্যোৎস্নায় বনভূমি যেন স্নান করে উঠেছে। আমি যেদিকে বসে আছি, সেদিকটা অন্ধকার, ঘন পাতার রাশির জন্য, কিন্তু গোচারণভূমি, নদীর পাড়, ছোট ছোট ঝোপ সব দুগ্ধ বল।

ঝোপটা নড়ে উঠল। আমি বন্দুক নিয়ে তৈরিই ছিলাম!

চিতা সন্তর্পণে ঝোপ থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল।

চিতাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কোথাও একটা অন্ধকার নেই।

আমি এক ঝলক দেখেই চমকে উঠলাম। একটা কান কাটা। শরীরের একদিকে কোন দাগ নেই। ধূসর বর্ণ।

NOT FOR SALE

তার অর্থ, বছর দশেক আগে যে চিতাকে গুলি করে হত্যা করেছিলাম, পরলোক থেকে সেই চিতা ফিরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য মুহূর্তের জন্য এমন একটা চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, তারপরই মনকে বোঝাতে শুরু করলাম। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে।

কাঁটা ঝোপের আঘাতে যে কোন জন্তুরই কান কাটা যেতে পারে। এর মধ্যে আশ্চর্যজনক কিছু নেই। বিশেষ করে সিংহ, বাঘ, চিতা যারা শিকার ধরবার আগে গুড়ি মেরে চলে।

আর দেহের কিছুটা ধূসর হওয়াও বিচিত্র নয়। কে জানে, সামনে দাঁড়ান চিতাটা দশ বছর আগে নিহত চিতার বংশোদ্ভুত কিনা।

চিতার গন্ধে ছাগলছানা জেগে উঠেছে। শুধু জেগে ওঠা ভয় বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে।

তারস্বরে চিৎকার করছে আর রজ্জুমুক্ত হবার প্রাণপণ চেষ্টা।

আশ্চর্য, চিতার লক্ষ্য কিন্তু ছাগলছানা নয়। সে একদৃষ্টে আমার দিকে দেখছে। দুটি চোখে প্রতিহিংসা বিচ্ছুরিত।

একটু চিন্তায় পড়লাম। কিছু বলা যায় না। যে ডালে আমি বসে আছি সেটা এমন কিছু উঁচুতে নয়। দু-একবার চেষ্টা করলে নাগাল পেয়ে যেতে পারে।

তারপর দুজনে গড়াগড়ি করে কাঁটার স্তূপের ওপর পড়ব।

বন্দুক ঠিক করে বসে রইলাম।

চিতা শূন্যে লাফ দিলেই ট্রিগার টিপব। দোনলা বন্দুক। প্রয়োজন হলে দ্বিতীয় গুলিও ছুঁড়তে হবে। ঠিক তাই।

চিতাটা নিচু হয়ে মাটির সঙ্গে নিজেকে প্রায় মিশিয়ে দিল। প্রবেলবেগে ল্যাজটা আছড়াচ্ছে। ল্যাজের ঝাপটায় শুকনো পাতার স্তূপ ইতস্ততঃ উড়তে লাগল। দৃষ্টি কিন্তু আমার দিকে।

কয়েক মুহূর্ত, তারপরই চিতা লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়লাম।

ঠিক পাঁজরে গিয়ে লাগল। শূন্যেই মুখ বিকৃত করে চিতাটা পাক দিয়ে সশব্দে মাটির ওপর পড়ল।

চারপা প্রসারিত করে মরণযন্ত্রণায় সমস্ত শরীরটা বার কয়েক কুঞ্চিত করল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

NOT FOR SALE

এখন নামা বিপদজনক। তাছাড়া আমার নামার উপায়ও ছিল না। তলায় কাঁটার স্তূপ।

অনেক শিকার কাহিনীতে পড়েছি, বাঘ নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে, মৃতের ভান করে। উৎফুল্ল শিকারী কাছে গেলে, তার প্রচণ্ড থাবার আঘাতে কিংবা দংশনে প্রাণ হারায়।

ঠিক করলাম, সারাটা রাত গাছের ওপরই থাকব। যা কিছু করার, ভোরের আলো ফুটলে করাই সমীচীন হবে।

কোমরের বেল্ট খুলে নিজেকে গাছের ডালের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধলাম। নিদ্রার ঘোরে ছিটকে নিচে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

নির্মেঘ আকাশ। সবকিছু দিনের মতন পরিষ্কার। চিতার দিকে দেখতে দেখতে চমকে উঠলাম।

স্পষ্ট দেখেছিলাম আমার গুলি তার পাঁজর বিদ্ধ করেছিল, কিন্তু চোয়াল বেয়ে টাটকা রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে।

দশ বছর আগে ঠিক যেখানে গুলি লেগেছিল। পাঁজর আর চোয়ালের দূরত্ব অনেকটা। গুলি পিছলে চোয়ালে লাগবে, তা সম্ভব নয়।

আশ্চর্য কাণ্ড। এই প্রথম শরীরে একটা শিহরণ অনুভব করলাম। অরণ্যে অন্য সব শব্দ যাদুমন্ত্রে যেন থেমে গেল। এমন কি ঝিঁঝির ডাকও।

এক সময়ে নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলাম।

যখন ঘুম ভাঙল, তখন ভোর হয়ে গেছে। চারদিকে পাখির স্বর শোনা যাচ্ছে।

সামনের দিকে চেয়েই চমকে উঠলাম। কোথাও চিতা নেই। অথচ ছাগলছানাও উধাও।

অলৌকিক ব্যাপার। গাছ থেকে অনেক কষ্টে নেমে পড়লাম। কাঁটায় দু-এক জায়গায় ছিঁড়ে গেল।

কাছে গিয়ে ভাল করে দেখলাম। রক্তের সামান্য দাগও নেই। ছাগলছানা যে দড়িতে বাঁধা ছিল, তাও নেই। খুঁটিটাও নিখোঁজ।

তাহলে কাল রাতে সব কিছু কি স্বপ্নে ঘটেছিল? তা কি সব।

নিজের বন্দুক পরীক্ষা করে দেখলাম। দুটো গুলিই রয়েছে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল তার কোন প্রমাণ নেই।

NOT FOR SALE

একটু পরেই আদিবাসীরা এসে জড়ো হবে। কি বলব তাদের? আমার কাহিনী তাদের চিতার সম্বন্ধে অলৌকিকত্বই প্রমাণ করবে।

ছাগলছানাটাও নেই। তার অর্থ চিতা এসেছিল।

আমার পরাজয়ের কাহিনী আদিবাসীদের কাছে রটে যাওয়ার চেয়েও নিঃশব্দে আত্মগোপন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চলতে শুরু করলাম।

একটু চলতেই মনে হল পিছনে কে যেন আমাকে সন্তর্পণে অনুসরণ করছে। পিছন ফিরে দেখেই থমকে দাঁড়ালাম। চলার শক্তিও কে যেন হরণ করে নিল।

গাছের আড়ালে সেই চিতা। দুটি চোখে আগুনের ঝলক। চোয়াল আর পাঁজরে রক্তক্ষত।

আহত চিতা কি আমাকে অনুসরণ করছে?

কিন্তু বন্দুকে গুলি দুটো যখন অটুট, তখন চিতা আহত হল কি করে?

বন্দুক তুললাম। মনে হল, ভোরের কুয়াশার মধ্যে চিতা যেন মিলিয়ে গেল।

একবার নয়, একদৃশ্য বার বার তিনবার।

কখনও সামনে, কখনও পাশে, কখনও পিছনে।

অগ্নিঝরা দৃষ্টি দিয়ে আমাকে জরিপ করতে করতে চিতা চলেছে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। বয়স হয়েছে। শিকার করার শক্তি আর নেশা কোনটাই নেই। প্রায় অবসর জীবনযাপন করছি।

মাঝে মাঝে রায়পুর অঞ্চলের বনবিভাগের কয়েকজন দেখা করতে আসে।

সকলের মুখেই এক কাহিনী শুনি।

কাটা কান আর রক্তাক্ত দেহ নিয়ে যে চিতাকে প্রায়ই রাত্রের অন্ধকারে দেখা যায়, তাকে বধ করা কোন শিকারীর পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

সকলেই বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছে, ওটা সাধারণ চিতা নয়। হয়তো চিতাই নয়, চিতার প্রেতাত্মা।

আমারও তাই মত।

কিন্তু আমার যুক্তিবাদী বন্ধুরা যাঁরা সবকিছু বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিতে চান, তাঁদের আমি কি করে বোঝাব।

অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্য যুক্তিনির্ভর নয়, বিশ্বাসনির্ভর।

———

NOT FOR SALE

বনকুঠির রহস্য

চিঠিটা পেয়ে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বছর দশেক তো হবেই, মানে কলেজ ছাড়ার পর থেকে সুকুমারের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। শুনেছিলাম ওড়িশার এক জঙ্গলে কাঠ কেটে চালান দিচ্ছে। ব্যবসায় বেশ দু'পয়সা করেছে। কলকাতায় সে আসেই না।

চিঠিতে লেখা, ভাই আমার বড় বিপদ, তুই আমাকে বাঁচা। যত তাড়াতাড়ি পারিস আয়। কটকে নেমে ট্যাক্সিতে সারানার জঙ্গলে চলে আসবি। আমার বাংলোর নাম বনকুঠি। যাকে জিজ্ঞাসা করবি সেই দেখিয়ে দেবে। আসিস ভাই। তোর আশায় রইলাম। ইতি সুকুমার—

চিঠিটা পেয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। কী এমন বিপদ হতে পারে সুকুমারের? ব্যবসার জন্য যদি টাকার দরকার হয়ে থাকে তাহলে আমি আর কী সাহায্য করতে পারি। আমার সামান্য চাকরি। একলা মানুষ তাই কোনোরকমে চলে যায়।

তবে কি ওখানকার মজুরদের সঙ্গে কোনরকম গোলমাল বাধল? তাহলেই বা আমি কী করতে পারি।

যাই হোক, বিপদ যখন লিখেছে তখন একবার যাওয়া দরকার।

অফিস থেকে দশদিনের ছুটি নিয়ে বের হয়ে পড়লাম।

কটকে নামলাম সন্ধ্যা ছ'টায়। স্টেশনে অনেক ট্যাক্সি রয়েছে, কিন্তু সারানার জঙ্গলে যেতে কেউ রাজী নয়।

যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে যেতে চার ঘণ্টা লেগে যাবে। ফেরার সময় অত রাতে বিপদ আছে। খুব চিতাবাঘের উপদ্রব। দু'একজন বলল, রাতটা ওয়েটিংরুমে কাটিয়ে সকালেই যাবেন।

ভেবে দেখলাম সেটাই ঠিক হবে। নতুন জায়গায়, বিশেষ করে জঙ্গলে রাতে না যাওয়াই ঠিক।

ওয়েটিংরুমে রাতটা কাটিয়ে সকালে ট্যাক্সি ধরলাম, শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা যাবার পর জঙ্গলের এলাকা শুরু হল। বড় বড় শাল আর কেঁদ গাছ।

NOT FOR SALE

ঘন লতার ঝোপ। সূর্যের আলো বন্ধ। দিনের বেলাতেই আবছা অন্ধকার। একটু এগিয়েই ট্যাক্সি থেমে গেল। আর পথ নেই।

"কী হল?"

"আর রাস্তা নেই। আপনাকে হেঁটে যেতে হবে।"

"সারানা জঙ্গল কত দূর?"

"এই তো শুরু হল", ট্যাক্সি ড্রাইভার আঙুল দিয়ে একটা ফলকের দিকে দেখিয়ে দিল। তাতে লেখা সারানা জঙ্গল।

জিজ্ঞাসা করলাম, বনকুঠি কতটা দূর হবে?

"তা বলতে পারব না। আপনি নেমে খোঁজ করুন।"

"অগত্যা ভাড়া মিটিয়ে কাঁধে ঝোলা আর হাতে সুটকেস নিয়ে নেমে পড়লাম।"

সরু পায়ে চলা পথ। ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে এল। ঝিঁঝির একটানা শব্দ, নাম না জানা পাখির করুণ ডাক, বাতাসে পাতা কাঁপার শিরশিরানি আওয়াজ। এই অজ জঙ্গলে সুকুমার থাকে কি করে? অর্থের জন্য মানুষ বুঝি সব কিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়।

বেশ কিছুটা যাবার পর জনতিনেক কাঠুরিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সকলের হাতেই কুড়াল। ঝুড়িগুলো টুপির মতন মাথায় পরেছে।

তাদের প্রশ্ন করলাম, "বনকুঠি কোন্ দিকে?"

তারা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করল, কয়েকবার আমাকে আপাদমস্তক দেখলে, তারপর একজন বলল, "বনকুঠি সোজা ডানদিকে, পুকুরের পাশে।"

চলতে চলতে লক্ষ্য করলাম কাঠুরিয়ারা একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। গভীর জঙ্গলে নতুন লোক দেখে তাদের কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। একটু পরে ঝোপের আড়ালে আর তাদের দেখা গেল না। সোজা হাঁটতে লাগলাম। ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গিয়েছে। শহুরে লোক, এত হাঁটা অভ্যাস নেই। পা দুটো টন-টন করছে। একটু এগোতেই পুকুর দেখা গেল। পুকুর নয়, বিরাট ঝিল। জল দেখা গেল না। পদ্মপাতায় ভর্তি।

তার পাশেই একটা বাংলো। একতলা। চারপাশের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলোর রঙও সবুজ। ছোট গেট। গেটের উপর একটা লতা উঠেছে। তাতে বেগুনি রঙের থোকা-থোকা ফুল, চমৎকার বাংলো। পথের কষ্ট যেন নিমেষে মুছে গেল।

NOT FOR SALE

গেটের কাছ বরাবর গিয়ে নজরে পড়ল, একটা কাঠের ওপর সবুজ রং দিয়ে লেখা, বনকুঠি।

গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। দরজায় তালা ঝুলছে। তার মানে সুকুমার নেই। বেরিয়েছে। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। সুটকেস আর ঝোলা পাশে রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। বেশ ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল, ঘড়ি দেখে চমকে উঠলাম। দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। তখনও দরজায় তালা ঝুলছে। বুদ্ধি করে ঝোলার মধ্যে পাউরুটি আর কলা এনেছিলাম। কটক স্টেশন থেকে ফ্লাস্কে গরম চা ভরে নিয়েছিলাম। আপাতত তাই খেয়ে প্রাণ বাঁচালাম।

নেমে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। সব জানলা বন্ধ। সেটাই স্বাভাবিক। এই ঘন জঙ্গলে কেউ জানলা খুলে বাইরে যায় না। জানলা দিয়ে বাইরে থেকে সাপ খোপের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ার ষোলআনা সম্ভাবনা।

আরও দু'ঘণ্টা কাটল। সুকুমার কলকাতায় চলে গিয়েছে। আমি যে আসবই, সেটা তো তার জানবার কথা নয়। তবু চিঠি যখন আমাকে দিয়েছে, তখন তার দু'একদিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল। দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। খুব কম-দামি মরচে পড়া তালা ঝুলছে। জোরে কয়েকবার টানতেই তালাটা খুলে এল। বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। একটা খাট, বিছানা পাতা। একপাশে আলমারি। বোধ হয় কাপড় জামা রাখার। একটা গোল টেবিল, একটা চেয়ার।

খিদেয় চোখে অন্ধকার দেখছি। ছুটে রান্নাঘরে গেলাম। একটা জালের মিটসেফ। খুলতেই দেখলাম, চাল, ডাল, আলু আর ডিম রয়েছে। নীচে একটা স্টোভ। রান্না করার অভ্যাস আমার ছিল। একসঙ্গে চাল ডাল চড়িয়ে দিলাম। তার মধ্যে আলুও ছেড়ে দিলাম। দুটো ডিমও ভাজলাম।

খাওয়া সেরে নিলাম। সুকুমারের জন্য খিচুড়ি আর ডিমভাজা আলাদা করে রেখে দিলাম।

তারপর সোজা শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, জানি না, খুটখাট শব্দ হতে উঠে বসলাম। দরজার ওপারে বিশ্রী একটা মুখ দেখা গেল। খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। খুদে লাল চোখ। পরনে ছেঁড়া শার্ট আর প্যান্ট।

চেঁচিয়ে উঠলাম, "কে?"

NOT FOR SALE

লোকটা ভিতরে এসে বলল, "আপনি কে? বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন কি করে?"

তার কথায় উত্তর না দিয়ে বললাম, "তুমি কে, আগে তাই বলো?"

"আজ্ঞে, আমি এ বাড়ির দেখাশোনা করতাম। রান্না, বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া সব।"

"আমি সুকুমারের বন্ধু। সুকুমার কখন আসবে? আমি ভোর থেকে অপেক্ষা করছি।"

লোকটার ভাঙাচোরা মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল। দুটো চোখ বিস্ফারিত, আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "কে আসবে? বাবু? মরা মানুষ কি ফিরে আসে?"

কথাটা কানে যেতেই লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালাম।

"কে মরা মানুষ? কী যা-তা বলছ?"

"আপনি শোনেননি কিছু? নিজের দোষে বাবু মরণ ডেকে আনল।"

মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। সুকুমার নেই। যে বিপদের ভয়ে সে আমাকে চিঠি লিখে আসতে বলেছিল, সেই বিপদই বুঝি তাকে গ্রাস করল। আমার কি আসতে দেরী হয়েছে? কী লজ্জা, বন্ধুর প্রাণ বাঁচাতে পারলাম না। লোকটাকে বললাম, "সব ব্যাপারটা খুলে বলো তো। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

লোকটা মেঝের ওপর বসল। খুব নিচু গলায় বলতে শুরু করল, "বাবু তো কাঠের কারবার করতেন, জঙ্গলের একেবারে শেষের দিকের একটা গাছ আছে। সেটাকে আমরা তো তোঙ্গা গাছ বলি। সে গাছ কেউ কাটে না। তাতে অপদেবতার বাস। কাঠুরিয়ারা কেউ সে গাছ কাটতে রাজি হল না। সবাই চলে এল জঙ্গল থেকে, কিন্তু বাবু নাছোড়বান্দা। বললো, এ জঙ্গলের সব গাছ আমি ইজারা নিয়েছি, কোন গাছ আমি ছাড়ব না।" বাবু কুড়াল নিয়ে নিজেই তার ডাল কাটতে শুরু করলেন, গোটা তিনেক ডাল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কাটা জায়গা দিয়ে রক্তের মতন আঠা ঝরতে লাগল। আমি জোর করে বাবুকে টেনে বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। তারপর—"

"কী তারপর?"

"পরের দিন ভোরে এসে দেখি সদর দরজা খোলা। বাবু মেঝের ওপর

NOT FOR SALE

পড়ে আছেন। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বের হচ্ছে বাবুকে কেউ গলা টিপে মেরে ফেলেছে। বাবুর হাতের মুঠোয় তোঙ্গাগাছের ছোট একটা ডাল।" বললাম, তার মানে সুকুমারকে ডাকাতে মেরে ফেলেছে।"

"না বাবু, এখানে চোর ডাকাত নেই। এত গভীর জঙ্গলে কে আসবে ডাকাতি করতে। ডাকাত হলে বাবুর টাকাকড়ি, জামাকাপড় নিয়ে যেত না? কিচ্ছু কেউ ছোঁয়নি। তাছাড়া বাবুর আর এক হাতের মুঠোয় একটা কাগজ ছিল। তাতে লেখা, তোঙ্গা বাবার কোপ থেকে আমাকে বাঁচাও। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তোঙ্গাগাছের শক্ত ডাল আমার গলা চেপে ধরেছে। উঃ।"

"কাগজ কোথায়?"

"এই যে বাবু।" লোকটা উঠে রান্নাঘরে গিয়ে একটা হাঁড়ির মধ্যে থেকে ডায়েরির একটা ছেঁড়া পাতা নিয়ে আমার হাতে দিল।

লোকটা যা বলেছিল সেই সবই কাগজে লেখা রয়েছে। সুকুমারেরই হাতের লেখা।

জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি বাংলা পড়তে পার?"

"বলতে পারি বাবু পড়তে পারি না।"

"তবে এ লেখা পড়লে কী করে?"

"আমি পড়িনি বাবু। পুলিশের লোক এসেছিল খবর পেয়ে। তাদের মধ্যে একজন বাংলা জানত, সেই পড়ে শুনিয়েছিল। কাগজটা আমার হাতে ফেরত দিয়ে বলেছিল, যত সব আজগুবি কাণ্ড।"

কথাটা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল। সব ব্যাপারটা কেমন রহস্যজনক। অলৌকিক ব্যাপারে আমার মোটেই বিশ্বাস নেই। "কতদিন আগে এটা হয়েছে?"

লোকটা হিসাব করে বলল, "তা দিন পনেরো তো হবেই।"

"মিথ্যে কথা, ধমক দিয়ে উঠলাম। "দিন পাঁচেক আগে সুকুমার আমাকে চিঠি দিয়েছিল। এই দেখ সেই চিঠি।" পকেট থেকে পোস্টকার্ডটা লোকটার দিকে এগিয়ে দিতে গিয়েই চমকে উঠলাম। পোস্টকার্ডে একটি আঁচড়ও নেই। কেবল লাল লাল ছোপ।

সুকুমারের গলায় যে ধরনের লাল দাগের কথা লোকটা বলেছিল, অনেকটা বুঝি সেই ধরনের।

———

NOT FOR SALE

বরযাত্রী

আগুনের যেমন সর্বনাশা দাহ আছে, তেমনই মনোহারিণী দীপ্তিও আছে।

এক সপ্তাহ ধরে সারা বাঙলার বুকে মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলল। বহু পরিবারের আশা-ভরসা একটি উত্তপ্ত সীসার স্পর্শে নিশ্চিহ্ন। মূল্যবান জাতীয় সম্পত্তি বৈশ্বানরের তাণ্ডবলীলায় কয়েক মুষ্টি ভস্মে পরিণত।

তবু এই হিংসার অন্তরালে কৌতুকের স্ফুলিঙ্গও মাঝে মাঝে দেখা গিয়েছিল। কিছু কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হয়েছিল।

একটি খবর নিশ্চয় আপনারা পড়েছেন। সাইকেলে বরবধূর প্রত্যাবর্তন। অবশ্য সবটা প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না, কারণ ধারেকাছে সংবাদপত্রের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না।

বর আমার অনুজপ্রতিম, কাজেই তার মুখ থেকে ঘটনাটা আমি শুনেছি।

কোন যানবাহন নেই। বরযাত্রীরা খাওয়াদাওয়া সেরেই রওনা হয়ে পড়েছেন। বরের বাড়ি থেকে আসবার মতনও কেউ ছিল না। বুদ্ধি করে বর সাইকেল এনেছিল, তারই পিছনে নববধূকে বসানো হল। মাথায় টোপর বর সাইকেল চালাতে শুরু করল।

নির্জন পথঘাট। অনিশ্চয়তার জন্য দোকানপাটও খোলেনি। মাইল দুয়েক ফাঁকা রাস্তা দিয়ে নির্বিঘ্নে এগিয়ে গেল।

সর্বনাশ হল তেঁতুলতলার মোড়ে।

ফটাস্ করে শব্দ। সাইকেলের পিছনের টায়ারটি দেহরক্ষা করল।

ব্রেক টিপে বরকে নামতে হল। দাম্পত্য জীবনের ঊষালগ্নে এভাবে ব্রেক টিপতে হবে বর আশাও করেনি।

বরের প্রথমে ধারণা হয়েছিল কাঁটা কিংবা পেরেক হয়তো টায়ারে বিঁধেছে, কিন্তু অপাঙ্গে একবার নববধূর দিকে দৃষ্টি দিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

এতক্ষণ যে টায়ার গতায়ু হয় নি, এটাই আশ্চর্য। নববধূর ওজন সাড়ে তিন মণ। বাসর তেমন জমেনি। গোলমালের জন্য তরুণী সমাগম মোটেই হয়নি। বরের নিজের মনের অবস্থাও চঞ্চল ছিল। এই আবহাওয়ায় বৌভাতের

NOT FOR SALE

অনুষ্ঠান কিভাবে সম্পন্ন করবে, তার চিন্তাতেই উদ্বিগ্ন। কাজেই পাশে বসা নবলব্ধ অর্ধাঙ্গিনীকে ভাল করে দেখার সুযোগই হয়নি। অবশ্য সাইকেল চালাবার সময় কিছু কিছু মালুম হচ্ছিল।

কি হল? চন্দনের ফোঁটা ঘামে বিলুপ্ত। সারা মুখ আরক্ত। কিছু লজ্জা, কিছু ভয় মেশানো কণ্ঠস্বর।

বরের মনে হল যেন গোটা তিনেক সেতার একযোগে ঝংকার দিয়ে উঠল। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে নিজের কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, বিশেষ কিছু নয়, টায়ারটা ফেঁসে গেছে।

নববধূ নেমে দাঁড়াল। মাথা নীচু করে বলল, আমি মোটা বলে বোধ হয়। তাই না?

বর জিভ কামড়াল, ছি ছি, খাদ্য আন্দোলনের সময় নিজেকে মোটা বলতে নেই।

তাহলে কি হবে এখন?

মানে, দোকানপাট সব বন্ধ কিনা, তাই হয়েছে মুশকিল।

বেনারসীর আঁচল ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে নববধূ বলল, কি করে বাড়ি যাবে?

বর মুখ তুলল। দু' আনা দামের শিঙাড়া প্যাটার্ন নাকের পাশে নববধূর আয়ত দুটি চোখে অসহায়তার ছাপ। চোখাচোখি হতে বর ত্রিভুবন ভুলল।

শুধু মনে পড়ল সে চাতরাশ্রী। একেবার নয়, পর পর তিনবার।

কোন ভয় নেই, বর একটু নীচু হয়ে নববধূকে কোলে তুলে নিল।

আঃ, ছাড়, ছাড়, নববধূর ভয়ার্ত, সলজ্জ কণ্ঠ, এখনই পথের দু'পাশে ভিড় জমে যাবে।

ভিড় অমনি জমলেই হল। একশো চুয়াল্লিশ ধারা চালু রয়েছে না এ তল্লাটে। তবে একজন করে একজন দেখে যেতে পারে।

বর বীরবিক্রমে পা ফেলে এগিয়ে গেল।

তার পরের ব্যাপার সামান্য। দরজা খুলে বরবধূকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েই বরের মা অবাক। ততক্ষণে হাত ব্যথা হওয়ায় বর নববধূকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছে।

মা গালে হাত দিয়ে শুধু বললেন, বিয়ের পরের দিন থেকেই বৌকে কাঁধে চড়ালি বাবা!

NOT FOR SALE

আমার এ কাহিনী অবশ্য বরবধূ নিয়ে নয়, বরযাত্রী নিয়ে।

সেই কথাই বলি।

আমাদের পাড়ার ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায়, বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই হলে হবে কি, এখনও দেখায় যেন নবকার্তিক। অগ্নিবর্ণ, দীর্ঘদেহ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা।

শিবপুরে ছোটখাট এক লোহার কারখানা। তারই মালিক।

গোলমালের সময় ত্রিলোচন আমার কাছে এল পরামর্শ নিতে।

দাদা, বড় মুশকিলে পড়েছি।

সান্ত্বনা দিলাম, এ মুশকিল তো তোমার একলার নয় ভাই, সকলের। সারা দেশ জ্বলছে, আমরা তো আর দেশছাড়া নই।

তা তো জানি, কিন্তু আমার একবার কারখানায় যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। গোটা কয়েক মাল বাইরে পড়ে আছে, সেগুলো গুদামে তুলে আসব।

তোমার তো গাড়ি রয়েছে?

কিন্তু গাড়িতে যদি ইঁট-পাটকেল ছোঁড়ে? কিংবা হাতবোমা?

একটু চিন্তিত হলাম, তারপরই কথাটা মনে পড়ে গেল।

একটা কাজ কর ত্রিলোচন। তোমার এমন চেহারা— বর সেজে বেরিয়ে যাও। গত মাসে আমার ভাইয়ের বিয়ে হল, তার টোপরটা রয়েছে। সেটা মাথায় নেবে।

ত্রিলোচন আরক্ত হল।

কি যে বলেন দাদা, এই বয়সে বর। আমার নিজেরই একঘর ছেলেপুলে।

আরে এ তো আর লোকগণনা নয় যে বাড়িতে এসে তোমার সন্তানসন্ততি গুনবে। তাছাড়া, তুমি তো সত্যি বর নয়, হাঙ্গামার বর। নিজের কাজটা হয়ে গেলেই টোপর খুলে ফেলবে।

কিন্তু ফুল দিয়ে আবার গাড়ি সাজাবার প্রশ্ন রয়েছে তো?

আরে না, না, এ দুর্যোগে নিজে একটু সাজলেই যথেষ্ট, আবার গাড়ি সাজানো। একটা গোলাপ না হয় বনেটে এঁটে দিও। তাতে খরচ কমবে, আভিজাত্য বাড়বে।

ত্রিলোচনের সঙ্গে আমার এইটুকুই কথা হয়েছিল। আমি ভাবলাম, ত্রিলোচন মন ঠিক করে নিয়েছে। সে বর সেজেই কারখানা রওনা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু বিধি বাম। ব্যাপারটা একেবারে সম্পূর্ণ অন্য রূপ নিল।

NOT FOR SALE

ত্রিলোচনের বর সাজতে লজ্জা করল। তারপর বর একলা গাড়িতে চলেছে বিয়ে করতে, এটাই যেন দৃষ্টিকটু। নিতবর নেই, পুরোহিত নেই, অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, এসব মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। যারা গাড়ি আটকাবে তাদের বোঝানো সম্ভব হবে না।

অনেক ভেবেচিন্তে ত্রিলোচন ঠিক করল বরযাত্রী সাজবে। তাহলে নিজেকে বিশেষভাবে সাজাবার প্রয়োজন হবে না। সঙ্গে বাড়তি লোক থাকারও দরকার নেই। বললেই হবে, নিজের মোটরে বন্ধুর বিয়েতে যোগ দিতে চলেছে।

একটা সাদা কাগজে লাল কালি দিয়ে ত্রিলোচন বড় বড় করে লিখল, 'বরযাত্রী', তারপর সেই কাগজটা মোটরের পিছনের কাঁচে আটকে দিল।

ব্যস, আয়োজন সম্পূর্ণ।

এবার ত্রিলোচন সংকটতারিণীর নাম জপ করতে করতে মোটরে উঠল। ড্রাইভার ক'দিন আসছে না। নিরুপায় ত্রিলোচনকে নিজেকেই চালনচক্র ধরতে হল।

সেদিন গোলমাল একটু কম, তবে থমথমে ভাবটা কাটেনি। পথঘাট জনশূন্য, দোকানপাট বন্ধ। দু'একটা গলির মোড়ে ছোট ছোট জনতা। মাঝে মাঝে পুলিসের গাড়ি টহল দিচ্ছে।

নির্বিঘ্নে ত্রিলোচন শিবপুর পৌঁছাল। শুধু নেপালী দারোয়ান ছিল, তার সাহায্যে জিনিসগুলো গুদামজাত করল।

এবার ফেরার পালা। রুমালে ঘাম মুছে ত্রিলোচন বাড়ির পথে রওনা হল।

ঠিক নেবুতলার মোড়ে ত্রিলোচনের মোটর থামল, মানে থামাতে হল তাকে।

দুটি বছর বাইশ-তেইশের ছোকরা, পরনে হাফসার্ট আর সরু প্যান্ট, হাত তুলে মোটর আটকাল।

ত্রিলোচন প্রথমে ভেবেছিল এরা বোধ হয় যানবাহনের অভাবে আটকে পড়েছে, সাহায্য চায়।

তাই সে বলল, আপনারা কোন্‌দিকে যাবেন? উত্তরে না দক্ষিণে?

বয়সে যেটি বড়, সে ভ্রূ দুটি সিনেমা-তারকার কায়দায় তুলে বলল, উত্তরেও নয় দক্ষিণেও নয়। আমাদের লক্ষ্য স্থির।

NOT FOR SALE

ছোটটি আরো মারাত্মক কথা বলল।

দেশের এই দুঃসময়ে আপনি কি মোটরে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন?

একটা ডাব পেলে হত হাতের কাছে। প্রচুর জলভরা কচি ডাব। ত্রিলোচনের মনে হল কণ্ঠনালী একেবারে মরুভূমি-সদৃশ। একটু আর্দ্রভাবও নেই। কথা বলতে গেলেই বিকৃত চীৎকার উৎসারিত হবে। অর্থহীন শব্দের সমষ্টি।

এ কি দাদা, একেবারে সাইলেন্ট পিকচার বনে গেলেন যে? আওয়াজ ছাড়ুন।

ঘন অন্ধকারে ক্ষুদ্র এক আলোর বিন্দু, কিন্তু সেইটুকুই আশা আর আশ্বাসের প্রতীক। নিমজ্জমান মানুষের কাছে কুটোর সামিল।

ঘাড় ফিরিয়ে ত্রিলোচন গাড়ির পিছনের কাগজটার দিকে আঙুল দেখাল। ঢোঁক গিলে কম্পান্বিত কণ্ঠে বলল, বরযাত্রী, মানে আমি বরযাত্রী কিনা।

ছেলে দুটি কোমরে হাত দিয়ে মোটরের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে ভিতরটা দেখল, তারপর বড় ছেলেটি বলল, কি ব্যাপার বলুন তো মশাই, ঘণ্টা আড়াই আগে দেখলাম এ রাস্তা দিয়েই গেলেন, আবার ফিরছেন এ পথ দিয়ে এত তাড়াতাড়ি। ছাঁদনাতলা খুঁজে পাচ্ছেন না বুঝি? নাকি শেষ মুহূর্তে বিয়ে নাকচ হয়ে গেল?

ত্রিলোচন আশ্চর্য হয়ে গেল। এত বছর থেকে গাড়ি চালাচ্ছে, অথচ ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেও যন্ত্রপাতি কি করে চালু থাকে ভেবেই পেল না।

একটু পরে সাহস করে নীচের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। যন্ত্রপাতি নয়, দু'হাঁটুতে ক্রমান্বয়ে ঠোকাঠুকি হয়ে যান্ত্রিক শব্দ হচ্ছে। নিজেরই দুই হাঁটু।

উত্তর দেবার আগে ছোটটি আর একটি প্রশ্নের তীর নিক্ষেপ করল।

আজ তো কোন বিয়ের লগ্ন নেই মশাই! সিভিল ম্যারেজ না মিলিটারি ম্যারেজ?

পকেট থেকে বহুকষ্টে রুমালটা বের করে ত্রিলোচন কপাল, গাল, ঘাড় মুছল। গরম খুব বেশি নয়, ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, তবু স্বেদের বিন্দু সারা দেহে।

থেমে থেমে, দম নিয়ে ত্রিলোচন বলল, মানে, ভীষণ একটা মুশকিলে পড়ে গেছি।

তা তো বুঝতেই পারছি। মিথ্যা কথা বলার অনেক মুশকিল। এক মিথ্যা

NOT FOR SALE

ঢাকতে হাজার মিথ্যা বলতে হয়। মশাই বোধ হয় প্রথমভাগ শেষ করে একেবারে তৃতীয়ভাগ ধরেছিলেন। দ্বিতীয়ভাগ আর পড়েননি। নইলে দেখতেন সেখানে লেখা আছে সদা সত্য কথা কহিবে।

অবিকল লজিকের অধ্যাপকের বক্তৃতার ভঙ্গীতে কথাগুলো বয়ঃকনিষ্ঠ বলে গেল।

এরপর কিছু একটা না বললে কি হবে ভাবতেও ত্রিলোচনের হৃদকম্প হল। পকেটে হাতবোমা আছে কিনা ব্যোমকালী জানেন। ছুরিছোরা থাকাও বিচিত্র নয়।

ত্রিলোচন এবার মরিয়া হয়ে গেল। মোটরের জানলার পাশেই বড়টি দাঁড়িয়েছিল, ত্রিলোচন দুটো হাত বাড়িয়ে তার একটা হাত আঁকড়ে ধরল।

তাহলে আসল কথাটা বলি আপনাদের?

বলতে আর বাধা দিচ্ছে কে? সেটা শোনবার জন্যই আমরা বিপদের ঝুঁকি নিয়েও মোটর থামালাম। বলে ফেলুন, বলে ফেলুন। আপনার মোটর মাহেশের রথ নয়, আর আপনিও জগন্নাথ বিগ্রহ নন যে রথ স্পর্শ করে আর বিগ্রহ দর্শন করে পুণ্য হবে। আমাদের আরো পাঁচটা কাজ আছে।

ত্রিলোচন আর একবার ঢোঁক গিলল। কথা বলতে সে কোনদিনই পারদর্শী নয়। ছেলেবেলায় একটু তোতলা ছিল। মুখের মধ্যে নুড়ি রেখে আস্তে আস্তে কথা বলে বহুকষ্টে সে বদভ্যাস কাটিয়েছে, কিন্তু এখন কথা বলবার আগেই মনে হচ্ছে যে শৈশবের সে অভ্যাসটা যেন আবার ফিরে আসছে।

তবু এভাবে হাত আঁকড়ে বসে থাকলেও চলবে না। মিলিটারির গাড়ি এ পথে আনাগোনা করলে এ হৃদ্যতার হয়তো অন্যরকম অর্থ করে বসবে।

আপনারা শুধু আড়াই ঘণ্টা আগে এ পথ দিয়ে যেতে দেখেছেন?

আমরা কি আর ঘড়ি দেখে রেখেছি? মস্ত বড় লোক আপনি, মানে কি এমন ভি আই পি যে দিনক্ষণ নোট করে রাখতে হবে? তবে এই নম্বর, এই বরযাত্রী-মার্কা মোটর, ঠিক এই নাদুসনুদুস চেহারা সব মিলে যাচ্ছে, তাই না ভোলাদা?

কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের দিকে চেয়ে বলল সমর্থনের আশায়।

বড়টির নাম ভোলা। ভোলানাথ হয়তো, কিন্তু দেখা গেল মোটেই সে ভোলবার ছেলে নয়। কিছুই ভোলে না।

NOT FOR SALE

ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আলবাৎ এই গাড়ি দেখেছি। দুপুর রোদে দাদা হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন, কিংবা দেশের দুর্দশা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করছেন। তাই না?

সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোচন মাথা নাড়ল, না, মাইরি না। কেন ঘুরছি সেই কথাই তো বলছি ভাই আপনাদের।

বলছি বলছি করছেন তো আধঘণ্টা ধরে। বলবেন কখন?

ছোটটির ঝাঁজ আবার যেন বেশি। খুদে লঙ্কার মতন।

আপনারা অভয় না দিলে কি করে বলি বলুন।

ত্রিলোচন জিভ দিয়ে ঠোঁটদুটো ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

এবার বড়টি আড়চোখে ছোটটির দিকে দেখল।

প্যালা, লোকটা পাগল নয় তো? একটানা বকে যাচ্ছে দেখ।

ত্রিলোচন আর গৌরচন্দ্রিকা করতে সাহস পেল না। সরাসরি আসল কথায় নেমে এল।

আপনারা শুধু এদিকে ঘুরতে দেখেছেন, আজ ভোর থেকে আমি সারা কলকাতা চষে বেড়াচ্ছি। বিপদ মাথায় করে।

হন্যে কুকুরের মতন?

খুব একটা জুতসই উপমা প্রয়োগ করেছে এইভাবে ছোটটা আকর্ণবিস্তৃত হাসতে আরম্ভ করল।

ত্রিলোচন দমল না। বলল, হ্যাঁ ভাই, অনেকটা তাই। একটা বরের খোঁজে।

এবার বড়-ছোট দুজনেই চমকাল।

বরের খোঁজে? তার মানে? বর গেল কোথায়?

বর নেই।

নেই?

না। তার আসানসোল থেকে আসার কথা ছিল। রেল বন্ধ, রাস্তা বন্ধ, আসবার কোন উপায়ই নেই। তাছাড়া, আসানসোলেও গুলিগোলা চলছে। বরের পাঁজরা ফোঁপরা হয়ে গিয়ে থাকলে আসবেই বা কি করে।

তাই আপনি বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

হ্যাঁ ভাই। মেয়ে কাশ্যপ গোত্র, ভঙ্গ। কাজেই ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর গোধূলিলগ্নে বিয়ে। বিয়ে না দিতে পারলে মেয়ের কি অবস্থা?

NOT FOR SALE

কেন, অবস্থা খারাপ কেন?

খারাপ নয়। পাকা দেখা, আশীর্বাদ সব হয়ে গেছে, এখন ঠিক দিনে বিয়ে না দিতে পারলে কনে চটে লাল হয়ে যাবে। দুপুর থেকে পিঁড়িতে বসে আছে। সেজেগুজে মালাচন্দন পরে। এখন কোন্ প্রাণে তাকে গিয়ে বলব বলুন তো, ওরে বর পাওয়া গেল না, তুই পিঁড়ি ছেড়ে ওঠ। তাহলে সে গলা থেকে মালা খুলে ফেলবে বটে, কিন্তু সেই গলায় দড়ি বাঁধবে।

বড়টি বলল, কিন্তু আজ তো লগ্ন নেই।

কোন্ পাঁজি?

কোন্ পাঁজি মানে?

কোন্ পাঁজিতে দেখেছেন লগ্ন নেই? ত্রিলোচনের বুকে একটু একটু করে সাহস ফিরে আসছে।

বড় একটু আমতা আমতা করে বলল, কি জানি, ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় গুপ্ত প্রেস।

ত্রিলোচন অমায়িক হাসল। ওরই মধ্যে একটু শব্দ করে।

বলল, ঠিক তাই ভেবেছি। বিশুদ্ধ পঞ্জিকামতে আজ খুব ভাল দিন। তিনটে লগ্ন আছে, একটা ছটা ছাপান্ন, একটা রাত দুটো বত্রিশ, আর একটা ভোর চারটে দশ। দুটো পঞ্জিকায় ভারি রেষারেষি যে। এ যেটা লেখে, ও তার ঠিক উলটোটার বিধান দেয়। একবার গুপ্ত প্রেস লিখল পাঁচই ফাল্গুন অলাবু ভক্ষণ নিষেধ, অথচ বিশুদ্ধ পঞ্জিকা বলল, ঐদিন অলাবু ছাড়া কিছু মুখে তুলবেন না। আমি আবার বিশুদ্ধ পঞ্জিকার মতে চলি কিনা, সারাদিন বাতাবিলেবু খেয়ে রইলাম।

কথাটা বলেই ত্রিলোচনের একটু খটকা লাগল। অলাবু মানে বাতাবিলেবু তো। অনেক আগে ওয়ার্ডবুকে যেন আর একটা কি পড়েছিল!

ছোট ছেলেটি এতক্ষণ কোমরে হাত দিয়ে কি ভাবছিল। চোখ দুটো কুঁচকে, ঠোঁট উলটে। ত্রিলোচন থামতে বলল, তাহলে আর আপনি বরযাত্রী হলেন কি করে? আপনি তো—

ত্রিলোচন তার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বলল, কন্যাযাত্রী তাই বলছেন তো? কিন্তু ভাই কন্যাযাত্রী, গঙ্গাযাত্রী এদের জন্য তো আর ছাড়পত্র নেই, শুধু বরযাত্রীদের অক্ষত অবস্থায় যেতে দিচ্ছে। তাই ওই প্ল্যাকার্ডটা লাগিয়েছি।

NOT FOR SALE

তাছাড়া ধরুন যদি বর একটা খুঁজে পাই, তাকে পাশে বসিয়ে নিয়ে যাবার সময় আমি বরযাত্রী ছাড়া আর কি?

মনে হল ছোকরা দুটো যেন একটু ভিজল।

বড়টা নরম গলায় বলল, তাহলে তো বড় মুশকিলে পড়েছেন দেখছি।

মুশকিল বলে মুশকিল ভাই, একেবারে অথই জলে পড়েছি। অথচ সাঁতারও জানি না। দু-একজন জানাশোনা অবিবাহিত ব্রাহ্মণ বন্ধু আছে, কিন্তু এই গোলমালে তারা যে কে কোথায় গেছে জানি না।

খুব জায়গা বদল হয়েছে কিনা। যেমন আমরা ধরুন বেলেঘাটার বাসিন্দা। পিসীমা ওখানে গোলমালের জন্য দুজনকে এ তল্লাটে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমরা আর এক দাদার মেসে এসে রয়েছি।

ছোটটির মেজাজের পারা প্রায় হিমাঙ্কে।

আপনারা দুজনে ভাই বুঝি?

সহোদর নই, তাহলে ঝগড়াঝাঁটি হয়ে যেত। মামাতো-পিসতুতো।

এবারেও ছোটটি উত্তর দিল। একেবারে দার্শনিক ভঙ্গীতে।

আপনার নামটি কি ভাই, যদি অবশ্য আপত্তি না থাকে।

ত্রিলোচন কণ্ঠে অনুনয়ের প্রলেপ মাখাল।

মিছামিছি কথাবার্তায় অনেক দেরি হয়ে গেল। ছোকরা দুটোর মতলবও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো সময়টা কাটাচ্ছে, তারপরই গলিঘুঁজি থেকে সঙ্গীরা বেরিয়ে গাড়ি ঘেরাও করবে। অদৃষ্টে দুঃখ আছে ত্রিলোচনের।

তারপর বাঁচবার চেষ্টায় এক বিয়ের অবতারণা করেছে ত্রিলোচন। সহজে তার জের মিটবে এমন মনে হচ্ছে না।

বড়টি একবার ছোটর দিকে চোখ ফেরাল, তারপর বলল, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

কৃত্রিম আনন্দে ত্রিলোচন দুটি চোখ বিস্ফারিত করল।

গোত্র ভরদ্বাজ, ভঙ্গ, তাই না?

পৈতার সময় তো তাই শুনেছিলাম।

ব্যস, ব্যস, ওতেই হবে, এবার ত্রিলোচন সবলে ভোলার দুটো হাতই জড়িয়ে ধরল, আর ছাড়ছি না ভাই। গরীবের এ দায় উদ্ধার করে দিতেই হবে। ভগবান একেবারে আপনাকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছেন। সবই তাঁর খেলা।

NOT FOR SALE

এতক্ষণ ত্রিলোচনের চোখ-মুখে যে যে ভয়ের ছায়া ছিল, সেটা সরে ভোলার মুখ-চোখে এল। রক্তহীন পাংশু মুখ, বিবর্ণ ওষ্ঠাধর, পাণ্ডুর দুটি গাল।

ছোটর দিকে চেয়ে ভয়চকিত কণ্ঠে সে বলল, প্যালা, এ তো আচ্ছা বিপদে পড়লাম রে!

প্যালার কণ্ঠে ভীতির স্পর্শ, চাকরি নেই, বাকরি নেই, বিয়ে কি ভোলাদা?

ত্রিলোচনের ওপর তখন যেন সংকটতারিণী ভর করেছে। সে অমায়িক ভঙ্গীতে বলল, চাকরির ভাবনা নেই। বিয়ে করলেই চাকরি হবে। চাকরি করে দেবার ভার আমার। কারখানার চাকরি।

কারখানার চাকরি? কি, কুলি-মজুরের?

ভোলা দ্বিধাজড়িত গলায় বলল।

পাগল না মাথা খারাপ! এমন রাজপুত্রের মতন চেহারা আপনি করবেন কুলি-মজুরের কাজ। কারখানায় কত কেরানী লাগে জানেন?

কে দেবে কাজ?

বললাম তো আমি দেব। আমি ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায়। আমি একটা কারখানার মালিক তা জানেন?

প্যালা মুখ টিপে হাসল, ভোলাদা, বেলেঘাটার বাঞ্ছা পাগলার কথা মনে আছে? ডাব বিক্রি করত, বলত ডাব তৈরীর কারখানায় কাজ করি।

ত্রিলোচন আর দ্বিরুক্তি না করে পিছনের সীট থেকে চামড়ার ব্যাগটা তুলে নিল। ভাগ্যিস কারখানার কয়েকটা কাগজপত্র তাতে ছিল। খুলে কাগজগুলো ভোলা আর প্যালার সামনে মেলে ধরল।

এই দেখুন শংকরী মেটাল ওয়ার্কস। আমি সই করেছি মালিক হিসাবে। টি চ্যাটার্জি অর্থাৎ ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায়।

ভোলা বিচলিত হল। প্যালার দিকে চেয়ে বলল, কি বলিস প্যালা?

প্যালা উত্তর দিতে দেরি করল না, দুর্গা বলে ঝুলে পড় ভোলাদা। পিসীমার গালমন্দ থেকে তো বাঁচবে। চাকরি আবার তার ওপর বউ।

ত্রিলোচন সুবিধা আর সময় বুঝে অনুরোধ করল, উঠে পড়ুন, আর দেরি করবেন না। এমনিতেই বেলা হয়ে গেছে।

ভোলা বলল, অবশ্য খুব কোমল কণ্ঠে। স্বরে আগের তেজ আর নেই।

কিন্তু এই পোশাকে? পোশাকটা অন্তত বদলে আসি।

NOT FOR SALE

ত্রিলোচন ভোলার একটা হাত ধরে টেনে তাকে মোটরে তুলে নিতে নিতে বলল, পোশাকটা তো খোলস ভাই। ওটা শুধু আসল মানুষটাকে চাপা দিয়ে রাখে। আসুন, উঠে আসুন।

জলে ডুবতে ডুবতে মানুষ যেমন আশপাশের যা পায় আঁকড়ে ধরে, সেইভাবেই ভোলা প্যালাকে জাপটে ধরল।

তুইও আয় প্যালা। কেউ সঙ্গে না থাকলে সাহস পাচ্ছি না। তাছাড়া নিতবরও তো দরকার লাগবে।

প্যালাও উঠল।

ভোলা আর প্যালা গাদাগাদি করে ত্রিলোচনের পাশে বসল। তাদের পিছনে তুলতে ত্রিলোচনের সাহস হয়নি। শত্রুকে ঘাড়ের ওপর নিয়ে চলাফেরা নিরাপদ নয়।

মোটর চলতে শুরু করতেই ভোলা আর একবার মনে করিয়ে দিল, দেখবেন দাদা চাকরির কথাটা যেন মনে থাকে। হাঁটাহাঁটি করে তিনজোড়া জুতো খুইয়ে ফেললাম, চাকরির সুতো ছিঁড়ল না।

প্যালা সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে দিল, নো-ভেকেন্সির বোর্ডে মাথা ঠুকে ঠুকে ভোলাদার মাথায় আব হয়ে গেল, চাকরির কোন সুরাহা হল না।

এসব কথা কিছু ত্রিলোচনের কানে গেল, কিছু গেল না। তার অবস্থা এখন খুবই বিপজ্জনক। মোটরে বর, নিতবর সবই মজুত, কিন্তু কনে পাবে কোথায়!

মনে মনে মতলব ভাঁজতে লাগল এ দুটোকে কোন ছুতোয় পথের মাঝখানে নামিয়ে নক্ষত্রবেগে মোটর চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া আর বাঁচবার কোন উপায় নেই। কিংবা নিজের এলাকায় নিয়ে যেতে পারলে বোধহয় বিপদ কিছুটা কমতে পারে।

ভাগ্য ভাল ত্রিলোচনের। পথে এক পানের দোকান পড়ল। আধাখোলা। সম্ভবতঃ গোলমাল দেখলেই দোকান বন্ধ করে ফেলবে তাই এই ব্যবস্থা।

ত্রিলোচন মোটরের গতি কমাল। পিছন ফিরে বলল, ভোলাবাবু, প্যালাবাবু পান খান তো?

প্যালা কথা বলল না। ভোলা বলল, হ্যাঁ, খাই বইকি।

তাহলে এক কাজ করুন, দুজনে নেমে দোকান থেকে পছন্দমত খিলি

NOT FOR SALE

কিনে নিন, যদি সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস থাকে তো এক প্যাকেট সিগারেটও কিনে নিন। এই নিন টাকা।

অবশ্য কথাটা বলেই ত্রিলোচনের একটু সন্দেহ হয়েছিল। পান-সিগারেট কিনতে দুজনের নামবার তো প্রয়োজন নেই। একজন নামলেই হবে। তাহলে বাকি একজনকে নিয়ে ত্রিলোচন কি করবে!

ভোলা বলল, না, বিয়ে যখন করতে যাচ্ছি, তখন উপোশ করে থাকাই উচিত। অবশ্য মেসে সকালে যা খাইয়েছে তা উপোশেরই নামান্তর। পান-সিগারেট আর খাব না।

অঃ, সখেদে ত্রিলোচন বলল। তারপরই কথাটা মনে পড়েছে এইভাবে বলল, প্যালাবাবু খাবেন না কিছু?

প্যালা ঘুমিয়ে পড়েছে। দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। ওর আবার ঘুমটাও একটু বেশি।

ত্রিলোচন আর কথা বাড়াল না। অ্যাকসিলেটরে চাপ দিয়ে মোটরের গতি দ্রুত করল।

ত্রিলোচন মনে মনে ঠিক করেছিল, একজন নেমে গেলে, গাড়ি হঠাৎ বিকল হয়ে গেছে এমন ভান করে প্যালাকেও পথে নামাবে। মোটরটা পিছন থেকে একটু ঠেলে দিতে বললে নিশ্চয় সে কিছু সন্দেহ করবে না। তারপর মোটর ছোঁবার আগেই প্যালাকে পথে রেখেই তীরবেগে পালাবে।

সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হল। এখন এই দুই পুঙ্গবকে বহন করে বাড়ি নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

কি কুক্ষণেই ত্রিলোচন কারখানায় রওনা হয়েছিল। এমন বিপদ ঘাড়ে চাপবে জানলে সে বাড়ি থেকেই বের হত না।

এদের বাড়িতে আটকে থানায় পুলিসকে ফোন করে দিতে পারে। কিন্তু পুলিস এলে তাদের কি বোঝাবে ত্রিলোচন? এরা গাড়িতে হাতবোমা ছুঁড়তে এসেছিল, কিংবা গাড়ি আটক করেছিল, তাই একেবারে এদের গাড়ির মধ্যে তুলে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। বর আর নিতবর সাজবার লোভ দেখিয়ে।

এমন একটা বিরাট পিল পুলিসের লোক গলাধঃকরণ করবে এমন আশা দুরাশা। বরং এদের অন্যায়ভাবে আটক রাখবার জন্য পুলিস ত্রিলোচনকেই থানায় নিয়ে যাবে। তারপর কোর্টঘর করতে করতে প্রাণান্ত।

NOT FOR SALE

তার চেয়ে মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে সব কিছু এদের বলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়াই সমীচীন। না হয়, যেখান থেকে তুলেছিল, সেখানেই আবার নামিয়ে দেবে।

কিন্তু, অনেক ভেবেচিন্তে ত্রিলোচন সে ইচ্ছা দমন করল।

বাড়ির সামনে এসে মোটর যখন থামল তখন বেলা পড়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়নি, কিন্তু তার আসন্ন ছায়া এখানে-ওখানে।

একটু বসুন দয়া করে, আমি ওদিকের ব্যবস্থাটা দেখে আসি।

দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। দরজার ওপারে যে এসে দাঁড়াল তাকে দেখেই ত্রিলোচন দু'পা পিছিয়ে এল।

বলিহারি তোমার আক্কেল দাদা! এই গোলমালে কি না বেরোলেই হত না। বাড়ির সবাই ভেবে খুন। আমি ভাবলাম নিশ্চয় পুলিসের গুলিতে খতম হয়েছ কিংবা কারুর হাতবোমায়। কোন্ হাসপাতালে ফোন করব তাই জ্যাঠাইমা জিজ্ঞেস করছিল। আমি বললাম, হাসপাতালে কি আর গেছে। কোন রাস্তার মোড়ে লাশ পড়ে আছে দেখ। আমরা দুপুরবেলা শ্রীরামপুর থেকে পুলিসের গাড়িতে এসেছি। পথে আবার দুটো ছোঁড়া বলে কি, আপনাদের কি পুলিসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, থাম মুখপোড়ারা, পুলিসে আমাদের ধরবে কি, আমরাই পুলিসদের ধরে নিয়ে যাচ্ছি। কলকাতায় ভাইয়ের বাড়ি পৌঁছে দেবে। তা, তুমি দরজার গোড়ায় অমন ভ্যাবা গঙ্গারাম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঘরে ঢোক। তারপর তুমি ঢোকবার আগে পুলিসের বুলেট ঢুকুক ঘরে।

একেবারে অবিরাম। থামার কোন লক্ষণ নেই। ত্রিলোচনের খুড়তুতো বোন বুঁচী। ভাল নামটা ত্রিলোচনের এই মুহূর্তে মনে পড়ল না।

দজ্জাল মেয়ে। যে পাড়ায় থাকে, সে পাড়ায় কারো সঙ্গে সদ্ভাব নেই। বার তিনেক বুঁচীকে দেখতে এসেছিল, কিন্তু তারা প্রশ্ন করবার আগেই বুঁচী এমন অনর্গল প্রশ্ন শুরু করেছিল যে ভদ্রলোকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে একেবারে শ্রীরামপুর স্টেশনে এসে দম ফেলেছিল।

বুঁচীর এত কথার উত্তরে ত্রিলোচন শুধু একবার বলল, ইউরেকা।

বুঁচী বলল, সর্বনাশ, এ রোগ তো তোমার ছিল না ত্রিলোচনদা। মদ গিলে এসেছ বুঝি?

উত্তর দেবার জন্য ত্রিলোচন আর দাঁড়াল না। দ্রুতপায়ে বুঁচীর মার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

NOT FOR SALE

দরজায় বর হাজির। কতক্ষণ আর তাকে বসিয়ে রাখা যাবে।

এর চেয়ে মারাত্মক প্রতিশোধের কথা ত্রিলোচন আর ভাবতেও পারে না। ভোলা আর প্যালা কি আর হাতবোমা ছুঁড়ত, ত্রিলোচন যে বুঁচীবোমা ছুঁড়ল ভোলার জীবনে, সারা জীবন তাকে আর দন্তস্ফুট করতে হবে না। কথা বলবার অবকাশ পাবে না। একেবারে নিঃঝুম মেরে যাবে।

নিজের কারখানায় ভোলাকে একটা চাকরি দেবে ত্রিলোচন, সে প্রতিশ্রুতি তো দিয়েইছে। তা নাহলে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত ভোলার বিধ্বস্ত ভাব সে লক্ষ্যই বা করবে কি করে।

একটু পরেই শাঁখের শব্দে প্যালার ঘুম ভেঙে গেল। ভোলা তো জেগেই ছিল। অবশ্য কি সর্বনাশ তার জন্য অপেক্ষা করছে না জেনেই ভোলা আনন্দে গুনগুন করে গান গেয়ে উঠল।

———

NOT FOR SALE

ভেজাল

হরবিলাসবাবু চৌকাঠের ওপার থেকে চেঁচালেন, ভায়া ঘরে আছ নাকি?

যেখানে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম, বাইরে থেকেও সে স্থানটি বেশ দেখা যায়। তাই হরবিলাসবাবুর কথার উত্তর না দিয়ে নকল কাশির শব্দ করলাম।

হরবিলাসবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

আমরা এক মেসে আছি প্রায় বছর পাঁচেকের ওপর। হরবিলাসবাবু অবশ্য আলাদা একটা কামরা নিয়ে আছেন আর আমার ঘরের শরিক আরও তিনজন।

ভদ্রলোক কোন বেসরকারি অফিসের বড়বাবু। সবে অবসর গ্রহণ করেছেন আটান্নয়। তাতেও মন খুঁতখুঁতনি যায়নি। অফিসে নাকি কথাবার্তা হচ্ছে অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে ষাট করা হবে। হরবিলাসবাবুর আসল বয়স বোঝবার উপায় নেই।

হরবিলাসবাবু কপাল চাপড়ালেন। আর কয়েকটা বছর বয়সটা কমিয়ে ঢুকলে অসময়ে এই করাত ঘাড়ে পড়ত না। দিব্যি বহাল তবিয়তে ষাট বছর পর্যন্ত চাকরি করতে পারতেন।

তা সত্যিই পারতেন, কারণ ভদ্রলোকের অটুট স্বাস্থ্য। মাথায় একটিও রুপোলী ঝিলিক নেই। বিনা চশমায় যেমন দেখতে পান, তেমনি হামানদিস্তার সাহায্য না নিয়ে অক্লেশে ছোলা, মটর, চিনাবাদাম চিবোতে পারেন। এখনও ডনবৈঠক দেন দেড়শ, বুকডনও দিতেন, কিন্তু নীচের তলার ভাড়াটেরা আপত্তি করায় থামাতে হয়েছে।

হরবিলাসবাবুর তিনকুলে কেউ নেই, অন্তত এই পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর কোন চিঠি আসতে দেখিনি, শুনিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলেছেন জ্ঞাতিগুষ্ঠী খোঁজ নেবার মতো আছে কে, যে চিঠি লিখবে? আমার কেউ কোথাও নেই।

হরবিলাসবাবু অকৃতদার। অফিস যান, আর বাড়ি আসেন। নিজের কামরায় বসে বসে একলা তাস খেলেন। ক্বচিৎ কখনও আমার ঘরে আসেন। বইয়ের

NOT FOR SALE

লোভে। তাও ঠাকুর দেবতার বই নয়, মারাত্মক সব গোয়েন্দা কাহিনী। শুধু ছুটির দিন বের হন মাছ ধরতে।

হরবিলাসবাবু সামনের চেয়ারে বসলেন। সলজ্জভাবে বললেন, একটা কথা ছিল অসিতবাবু।

খবরের কাগজ সরিয়ে রেখে বললাম, কি বলুন?

একটা দুঃসাহসিক কাজ করতে উদ্যত হয়েছি।

দুঃসাহসিক কাজ! পলকের মধ্যে গৌরীশঙ্কর অভিযান থেকে শুরু করে সুন্দরবনে বাঘ শিকারের কথা মনশ্চক্ষে ভেসে এল। হরবিলাসবাবুর স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানানসই ব্যাপার। কিন্তু এ বয়সে অতটা করা কি ঠিক হবে?

কি হতে পারে মনে মনে আন্দাজ করছি, এমন সময় হরবিলাসবাবু পকেট থেকে বাসন্তী রঙের একটা কার্ড বের করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, বিয়ে করছি।

বিয়ে!

রীতিমত বিচলিত হলাম। এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপত্তিকর হয়তো কিছু নেই, কিন্তু এই বয়সে, এত বয়সে সংসারের পত্তন করা কি সমীচীন?

মানুষকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মহাকালের পায়ের চাপে স্নায়ুতন্ত্রী শিথিল হয়, রক্তের জোর স্তিমিত।

সম্ভবত বিস্ময়ের ভাবটা আমার দু চোখের তারায় ফুটে উঠে থাকবে, হরবিলাসবাবু সেটা লক্ষ্য করেই সাফাই গাইলেন, বিয়ে করার তো এই সময়। আর্থিক দিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা রাখি। তাছাড়া প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস আমার মধ্যে থাকবে না, আমার আকর্ষণ অনেক বেশি নিবিড়। বর্ষার চাপল্য নয়, ভাদ্রের মরা নদীর স্থিরতা।

কার্ডের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বললাম, বিয়েটা কোথায় হচ্ছে?

ওই যে লেখা রয়েছে মেহেরপুর গ্রামে। ইচ্ছা করেই গ্রামে বিয়ে করছি ভাই, শহরের ভেজাল খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল। আজ সকালে হরিতকি কামড়াতে গিয়ে প্রাণ যাবার দাখিল। শেষকালে দেখলাম রং করা প্ল্যাস্টিকের হরিতকি। ব্যাপারটা বোঝ একবার। তাই ভাবছি, পেট ভরে শ্বশুরবাড়িতে কিছুদিন খাঁটি জিনিস খেয়ে নিই।

NOT FOR SALE

এ কথাটা আমি ভাবিনি। হরবিলাসবাবুর কল্যাণে একটা দিন অন্তত ভাল ভাল জিনিস খেয়ে নেওয়া যাক। আজকাল অতিথি-নিয়ন্ত্রণের প্যাঁচে কেউ নিমন্ত্রণও করে না। করলেও, বুকে একটা গোলাপফুল গুঁজে দিয়ে, এক গ্লাস কোকাকোলা হাতে দিয়ে আপ্যায়িত করে। এ ধরনের অতিথি সৎকার গ্রামে নিশ্চয় হবে না।

ক্রমেই অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ছে।

আজ সকালে পাতের ওপর একটা মরা টিকটিকির বাচ্চা পড়ে আছে দেখে ঠাকুরকে ধমক দিলাম।

তোমরা কি দেখেও কাজ কর না। টিকটিকির বাচ্চাটা পাতের ওপর পড়ে রয়েছে, ভাত খাবো কি করে? থালাটা বদলে দাও।

ঠাকুর একটু এগিয়ে এসে একবার উঁকি দিয়ে দেখে তো হেসেই খুন।

টিকটিকির বাচ্চা কোথায় বাবু? এ তো ট্যাংরা মাছ। সাত দিন পরে মাছ পেয়েছি। তাও কত ধ্বস্তাধ্বস্তি করে। পনেরো টাকা কিলো।

মনে হল কিলটা যেন দুম করে আমারই পিঠে পড়ল। সব জিনিসে ভেজালের অন্ত নেই। সবাই বেপরোয়া।

দুধে খড়ি গোলা জল, লস্যিতে ব্লটিং পেপার, দইয়ের মধ্যে চুনের জল।

সর্ষের তেল তো পাওয়াই দুষ্কর। পরিশোধিত বাদাম তেলে কাজ চলছিল। এক একদিন এক একরকম মার্কা।

মেসের প্রভাতবাবু এক সকালে বাদাম তেলে রাঁধা বেগুনভাজা মুখে দিয়েই তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। থামলেন বোধ হয় একেবারে অফিসে গিয়ে।

পাশে হিমাংশুবাবু বসেছিলেন। তিনি বললেন, আর দেখতে হবে না বাদাম তেলে নির্ঘাত পেট্রোল ভেজাল দিচ্ছে, না হলে প্রভাতবাবু ওই রকম মোটরের মতো স্পীডে বেরিয়ে গেলেন কি করে!

মোট কথা জীবন দুর্বিষহ।

কাজেই এমনই সময়ে আসন্ন নিমন্ত্রণের একটা গন্ধ পেয়ে মনটা সতেজ হয়ে উঠল।

এত বয়সে হরবিলাসবাবুর বিয়ে করা উচিত কিনা এ ভাবনা অতলে তলিয়ে গেল। কার কখন বিয়ের ফুল ফোটে কিছুই বলা যায় না। আমরা তো একদিন মনের আনন্দে মুখের স্বাদ বদলাই!

NOT FOR SALE

খুশী মনে হরবিলাসবাবুকে প্রশ্ন করলাম, দেখাশোনার কাজ চুপি চুপি কখন সারলেন? কিছুই তো টের পেলাম না?

হরবিলাসবাবুর দু'গালে যেন রক্তিম ছোপ দেখা দিল। চোখের তারায় সঙ্কোচের আমেজ।

ঘাড় হেঁট করে বললেন, শেয়ালদা স্টেশনে।

শেয়ালদা স্টেশনে? সেকি? বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়।

জানো তো ভায়া আমার মাছ ধরার এক বাতিক ছিল?

ছিল? এখন আর নেই?

এখন আর মাছ কোথায় যে ধরব! বার দুয়েক বঁড়শীতে 'মৎস্য নিয়ন্ত্রণ আইন'-এর খসড়ার টুকরো উঠেছে, মাছ পাই নি। তাই আর যাই না।

শোন যা বলছিলাম।

আমি চেয়ারে ভাল হয়ে বসলাম।

শেয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। গাড়ি আর আসে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুটো পায়ের অসহ্য যন্ত্রণা। পাশে কার একটা সুটকেস ছিল। তার ওপর চেপে বসলাম। বসা মাত্র মার-মূর্তিতে তেড়ে এল।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, একটি বছর পনেরো ষোলর কিশোরী দাঁড়িয়েছিল। সুটকেসটা বোধ হয় তারই।

করছেন কি মশাই, ওই দেহ নিয়ে বসে ওর ওপর? এখনই গুঁড়িয়ে যাবে যে!

একটু অপ্রস্তুত হলাম, কিন্তু বিমোহিত হলাম তার চেয়ে অনেক বেশি। মাজা মাজা রংয়ে, টানা দুটি চোখে, পানের রসে রাঙা ঠোঁটে, মুখের গড়নে নিখুঁত সুন্দরী। যেমন আজকাল নভেলে নায়িকার রূপ বর্ণনায় দেখা যায়। তার ওপর এই চণ্ডিকামূর্তি।

পরিবেশ ভুলে, ভদ্রতা ভুলে হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

একটু পরেই একটি প্রৌঢ় এসে দাঁড়ালেন। বুঝলাম মেয়েটির বাবা। তিনি নিজে এসেই আলাপ করলেন, হাতে ছিপ দেখে। তাঁরও একসময়ে খুব মাছ ধরার শখ ছিল। বাড়িতে পুকুর আছে, কিন্তু তাতে আজকাল আর ছিপ নিয়ে বসেন না।

বসবেন কি, মাছের চেয়েও বড় চিন্তা মাথায় চেপেছে। কন্যার বিবাহের

NOT FOR SALE

চিন্তা। এখানে বড় মেয়ের বাড়ি এসেছিলেন মেয়েকে দেখাতে। পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছিল, কিন্তু যথারীতি নাকচ করে দিয়েছে। তাদের লেখাপড়া জানা ফর্সা মেয়ে চাই।

অতএব মেয়েকে নিয়ে মেহেরপুর ফিরে যাচ্ছেন।

ছাপোষা মানুষ। রোজগারপাতি নেই। দেশের সামান্য জমিজমা ভরসা। কি করে যে মেয়ে পার হবে ঈশ্বর জানেন।

এমন সুযোগ হরবিলাসবাবু ছাড়লেন না। মেয়ের বাবাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব বললেন। একটি পয়সা দাবী নেই। মেয়ে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে।

মেয়ের বাপ বিহ্বল হয়ে পড়লেন! হরবিলাসবাবুর দুটো হাত ধরে কৃতজ্ঞতা জানালেন। মেয়ে আড়চোখে সব ব্যাপারটা দেখল। ঠিক কিছু বুঝতে পারল না।

তখনই স্টল থেকে পাঁজি কিনে বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেল। ঠিক হল, ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। একই দিনে পাকা দেখা আর বিয়ে।

হরবিলাসবাবু আর একবার অনুরোধ করলেন, তাহলে ভায়া, ওই কথাই রইল। মেসের সবাই একসঙ্গে রওনা হব। তিনটে বত্রিশ গাড়ি। লগ্ন দশটায়, কাজেই এখান থেকে আমাদের দুটোর মধ্যে যাত্রা করতে হবে।

তাই হল।

সেজেগুজে সবাই হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়লাম। হরবিলাসবাবুকে মাঝখানে রেখে।

আমি সকালে এক কাপ চা আর বিস্কুট খেয়েছি, আর কিছু নয়! মিছামিছি একগাদা ভেজাল পেটে পুরে লাভ কি! গ্রামে গিয়ে অনেক দিন পরে বিশুদ্ধ জিনিস খাব, এই আশায় পেটটা যথাসম্ভব খালিই রাখলাম।

ট্রেনে একবার হরবিলাসবাবুর দিকে চেয়ে দেখলাম। শরীরটা বেশ ভাল করেই মেরামত করেছেন। মাথায় পাকা চুলের সংখ্যা বিশেষ ছিল না, যে কটা ছিল বোঝা গেল সে কটাও সযত্নে নির্মূল করেছেন। প্রসাধন একটু উগ্রই হয়েছে। এখনও স্থানে স্থানে পাউডারের প্রলেপ, স্নোর চিহ্ন রয়েছে।

এ বয়সে বিয়েটা—এই অন্যায়, অমঙ্গল চিন্তা জোর করে মন থেকে বিতাড়িত করলাম। মনে মনে একবার খাদ্যদ্রব্যের তালিকার ফিরিস্তি আউড়ে

NOT FOR SALE

গেলাম। মাংস হয়তো হবে না, না হোক, আমরা এমন কিছু মাংশাসী নই। মাছের প্রচুর বন্দোবস্ত থাকবে, বিশেষ করে যখন ভদ্রলোকের নিজের পুকুর আছে। তা ছাড়া তরি-তরকারিও একেবারে টাটকা। শহরের মতন কোল্ড স্টোরেজ-সঞ্জীবিত নয়।

এ ছাড়া দুগ্ধজাত জিনিস তো আছেই। সন্দেশ, আকৃতি ও প্রকৃতি দুইই নয়ন ও জিহ্বার পক্ষে মনোহর। কলকাতায় একবার শুনেছিলাম কোন নিমন্ত্রণ বাড়িতে মানকচু ভেজাল ছিল। যারা খেয়েছিল, তারা গলার ব্যথায় ছটফট করেছিল তিন দিন তিন রাত্রি। এসব জায়গায় সেসব ভয় নেই। ভেজালের প্রশ্নই ওঠে না।

স্টেশনে নামতেই বিপুল সম্বর্ধনা। অবশ্য এটা মেহেরপুর নয়। এ স্টেশনের নাম কালিকাপুর। মাঝখানে বিপাশা নদী। ওপারে মেহেরপুর।

কন্যাপক্ষের লোকেরা নদী পার হয়ে এদিকে এসেছে অভ্যর্থনা করতে।

সবাই একে একে বজরায় গিয়ে উঠলাম। আর আধঘণ্টার পথ।

জন দুয়েক ছোকরা এপারেই রয়ে গেল। আগের স্টেশন থেকে মিষ্টি আসবে, সেগুলো নিয়ে ফিরবে।

উৎফুল্ল হৃদয়ে গানের একটা কলি গাইতে গিয়েই থেমে গেলাম। পরিবেশের কথাটা মনে পড়ে গেল।

ওপারে গিয়ে ছোকরাদের মধ্যে একজন কথাটা বলল।

আজ্ঞে, আমাদের একটা বিধি আছে।

কি বিধি?

বিয়ে বাসর সমস্ত স্কুলবাড়িতে সেরে নিয়ে পরের দিন ভোরবেলা মেয়ের বাড়ি যেতে হয়।

আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। বলে ফেললাম, আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা?

সে সম্বন্ধে একটা প্রথা আছে। বিয়ের ব্যাপার চুকলে তারপর আহারাদির ব্যবস্থা। অর্থাৎ, বিয়েটা একটা সাত্ত্বিক ব্যাপার তো, তাই সেটা না হওয়া পর্যন্ত বরের মতন বরযাত্রীদেরও উপবাসী থাকা বিধেয়।

কিছু বললাম না। বলবার ছিলও না কিছু। তার মানে বিয়ে চুকতে রাত এগারটা, তারপর খাওয়া-দাওয়া।

NOT FOR SALE

ঠিক আছে, প্রথা যখন, তখন এ-নিয়ে বিতর্ক করে লাভ কি?

স্কুলবাড়ি পৌঁছলাম। অনেকগুলো হ্যাজাক বাতি জ্বলছে। লোকজন ছুটোছুটি করছে।

একটু পরেই মেয়ের হাত ধরে মেয়ের বাপ এসে হাজির হলেন। ভদ্রলোককে যেন বেশ একটু গম্ভীর আর বিমর্ষ মনে হল।

কারণটা শুনলাম। তাঁর স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

বিয়ের পর্ব চুকল। একটা বেঞ্চের ওপর বসে ঢুলতে ঢুলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

পেটের অবস্থা ভয়াবহ। সহস্র নাড়ী যেন পাক দিয়ে উঠছে। সেই সাতসকালে একটু চা আর বিস্কুট মুখে দিয়ে বের হয়েছি। জঠরানলে স্নায়ু, শিরা, মজ্জা সব যেন পুড়ে যাবার দাখিল।

তার ওপর মশার উপদ্রব। দু'হাতে নিজের সারাদেহ চাপড়াচ্ছি। মনে মনে কপালও।

হঠাৎ একটা চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। অন্য বরযাত্রীরাও এখানে ওখানে নিদ্রায় মগ্ন। সবাই উঠল। ভাবলাম বোধ হয় খেতে যাবার ডাক পড়েছে।

আওয়াজটা ঠিক কোন্ দিক থেকে আসছে বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হল যেন বাসরঘরের দিক থেকেই আসছে। ধারে কাছে গ্রামের কাউকে দেখা গেল না।

বাসরঘরের দরজায় উঁকি দিয়েই আমরা হতবাক।

হরবিলাসবাবু চেঁচাচ্ছেন। তাঁর এক হাতে কনের দুল। পায়ের কাছে জড়ো করা কনের শাড়ি।

ঠকিয়েছে আমায়! ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে—বাকি কথাগুলো সকলের কোলাহলে আর শোনা গেল না।

দরজায় মাথা রেখে পেটের প্রাণান্তকর যন্ত্রণাটা চাপতে চাপতে শুধু ভাবতে লাগলাম, সর্বনাশ, গ্রামেও ভেজাল! শহরে তবু খাদ্যদ্রব্য আর পোশাকের মধ্যে ভেজাল চলছিল, এখানে মানুষেও ভেজাল? কনেতেও এরা ভেজাল দিচ্ছে!

NOT FOR SALE

বিয়েবাড়ি

বড় পিসেমশাই যেন গল্পের ঝুলি। তাঁর ঝুলিতে কত যে গল্প আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

পিসেমশাই আমাদের বাড়ীতে এলেই আমরা সবাই মিলে তাঁকে ছেঁকে ধরি।

পিসেমশাই যত বলেন আমার গল্প শেষ। আর গল্প নেই।

আমরা অতো সহজে হার মানি না।

গল্প না শুনে ছাড়ছি না—পিসেমশাই হাসেন। এ হাসি মানেই হচ্ছে পিসেমশাই গল্প ভাবছেন। বলতেই হবে? কি গল্প চাই? যা হোক। মোট কথা গল্প বলা চাই-ই।

ক্ষুদে মিঠু চুপিচুপি বলে, ভূতের গল্পের দরকার নেই।

পিসেমশাই পাকা ভুরু নাচিয়ে বলেন মিনু যেন কি ষড়যন্ত্র করছে মনে হচ্ছে।

আমরা সমস্বরে বলি ও বলছে ভূতের গল্পে ওর ভয় করে, অন্য গল্প বলতে। মানুষের গল্প।

মানুষের গল্প? পিসেমশাই আর একবার হেসে ওঠেন, মানুষ কি আর এতো সস্তা জিনিষ যে চট করে তার গল্প খুঁজে বার করা যাবে। ওর জন্য পাতা ওলটাতে হবে।

আমরা বাজে কথা শুনতে চাই না।

পিসেমশাই নড়ে চড়ে বসে, পানের কৌটো থেকে পান খান।

আচ্ছা তাহলে শোন মানুষের গল্পই বলি।

আমাদের গ্রামে সাধন ভট্টাচার্য ছিলেন সাংঘাতিক লোক। যেমন বদমেজাজি তেমন দাম্ভিক। গ্রামের সমস্ত লোক তাঁকে ভয় পেতো।

মিনু চোখ পিটপিট করে বলে, বদমাইস মানুষের গল্প বলছেন বুঝি পিসেমশাই?

আমরা ধমকে উঠি, এই থাম।

NOT FOR SALE

পিসেমশাই আপন মনে গল্প বলে যান। তাঁর দম্ভের কথা যদি শুনিস তাহলে অবাক হয়ে যাবি। গ্রামে সকালে কারো চীৎকার করার হুকুম ছিল না। সাধন ভট্টাচার্য সকালে গঙ্গাস্নানে যান, হেঁটে যাবেন, হেঁটে ফিরবেন। তাঁর ফিরতে প্রায় দশটা বাজতো।

অবাক হয়ে বলি তার সঙ্গে অন্য লোকের চিৎকারের কি সম্বন্ধ?

আহা, বুঝলি না? তাঁর মতে হচ্ছে গঙ্গাস্নান পবিত্র কাজ, চীৎকার করলে ভালো কাজ সব নষ্ট হয়ে যায়। অতএব এই হুকুম।

কী আবদার। নিজে তো জমিদার, হেঁটে যাবার দরকার কি?

সে ওঁর খেয়াল। মা গঙ্গার কাছে নম্র ভাবে যাবেন। তাই বলে আমাদের কাছে তো আর নম্র হতে পারবেন না? এই হচ্ছে কথা। একদিন একটা ছেলে, মানে দেশেরই ছেলে তবে কলকাতায় মামার বাড়ী থাকতো, ছুটিতে বাড়ী গিয়েছিল, শহুরে মেজাজ তার। সে করেছে কি একদিন সকাল বেলা ইয়া এক বুটজুতো পরে খটমট করে চলেছে রাস্তায়। জমিদার বাড়ীর সামনে দিয়ে। ভাবখানা যেন দেখি না কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়।

ব্যস! পড়বি তো পড় সাধন ভট্টাচার্যের চোখে।

হাতে গঙ্গাজলের ঘটি, খালি পা, পরনে গরদের ধুতি চাদর, মন্ত্রপাঠ করতে করতে আসছেন, ব্যাপার দেখে একবার থমকে দাঁড়ালেন। তারপর মন্ত্র পড়তে পড়তে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন।

ছেলেটা বীরদর্পে, বন্ধুদের কাছে এসে বললো দেখলি? ঘোড়ার ডিম হলো? তোরা সব ভয়েই মরে যাবি তার কি হবে? সাহস করে করতে পারলে যা খুশি করা যায়। বন্ধুরা তো অবাক। কিছুই হলো না। একটা ধমক পর্যন্ত না।

হুঁ বাবা, অতো সোজা নয়। কিন্তু খানিক পরে জমিদারের কাছারিতে তলব পড়লো। ছেলে তো ছেলে— ছেলের বাবা শুদ্ধ। বাপের মুখে শুকিয়ে আমসি, ছেলে তড়পাচ্ছে, কি হবে? আমি শুনিয়ে দিয়ে আসব দেখো বাবাই।

তা দেখলো সবাই। দেখার মতই দৃশ্য।

সেই বুট জুতো দুটোর মধ্যে হাতের চেটো দুটো পুরে রাস্তায় হামা দিচ্ছে ছেলে। তার সঙ্গে নাকে খৎ। দুপাশে দুই পাইক।

সাধন ভট্টাচার্য নাকি না ধমক না বকুনি, হেসে হেসে খোসমেজাজে বলে ছিলেন শুনছ, তোমার ছেলের জুতো দুখানা বড় খাসা তো! দিব্যি নতুন ধরনের কি বলে ওকে?

NOT FOR SALE

ছেলেটা বুক চিতিয়ে বলে উঠেছে বুট।

বলেই ভাবছে যদি জিজ্ঞেস করেন কলকাতার কোন দোকান থেকে কেনা, একটা বিলিতি দোকানের নাম করে দেবে চটপট। ভট্টাচার্য কিন্তু সে দিক দিয়ে যান না, তিনি তেমনি হেসে বলেন, 'হুঁ! তাই! তা বাপু তোমার এই নতুন চালের জুতো পরে অমন পুরোনো চালে হাঁটা তো ঠিক নয়। আমার এই পাইক দুটোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ো দিখি একবার। এরা নতুন চালের হাঁটা শিখিয়ে দেবে।

সঙ্গে সঙ্গে দুই পাইক বিছুটির ডাল হাতে নিয়ে তৈরী।

এ কিন্তু ভারী অন্যায়।

পিসেমশাই বলেন, অন্যায় আর ন্যায় সবই নির্ভর করে মানুষের ওপর। এ শাসন তিনি বলে মানিয়েছিল, আমি করতে গেলে কি আর মানাবে? না কেউ মানবে? তাঁর কথার চালই আলাদা ছিল। নইলে জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলা চলছে, পাঁচ ক্রোশ দূরে শহরে গিয়ে কোর্টে হাজির হতে হবে। ভট্টাচার্য সেই শত্রুপক্ষকে নিজের বাড়ীতে ভাত খাইয়ে নিজের পাল্কীতে চড়িয়ে নিয়ে কোর্টে গেছেন।

তার মানে? আমরা তো অবাক।

মানে আর কি? বলতেন আমার বাড়ীতে এক প্রহর বেলাতেই পঞ্চাশ ব্যঞ্জন তৈরী, আর ওরা হয়তো ভাবত ভাত গিলে কোর্টে ছুটবে। এ চলবে না—

যারা যারা সদরে যাবে সবাইয়ের জন্যে এ বাড়ীতে চাল নেওয়া হবে।

একমাত্র আমার মায়ের কাকা তিনি ভট্টাচার্যকে কেয়ার করতেন না, দুজনেই সমান শরীক।

সেই রাঙা দাদুর মেয়ের মানে কমলির লাগলো বিয়ে। আমরা তখন ছোট, শুনতে লাগলাম এমন জামাই নাকি এ তল্লাটে আর কখনো কেউ করেনি। ভট্টাচার্যের জামাইরা এর ধারে কাছে নয়।

এ পাত্র কলকাতায় থাকে, ওকালতি পড়ে। বাপের অবস্থা ভালো, দেখতেও ভালো। আমাদের তখন ওসব কথায় মাথাব্যথা ছিল না, কানে আসতো ঐ পর্য্যন্ত, আমরা কেবল ভোজের আয়োজনের কথা ভাবতাম।

দেশ বিদেশ থেকে ময়রা আসবে ভিয়েন হবে, লেডিকেনি নাকি বাতাবিলেবুর লাইজ, আবার নাকি লুচিও হবে। তখন গ্রামে লুচি হত না।

NOT FOR SALE

ভাতই চলতো। মাছ তরকারি আর সরু চালের ভাত।

তাই আমরা লুচির আলোচনায় বিভোর থাকতাম।

অবশেষে এল বিয়ের দিন। আর সেদিন আকাশ ভেঙে নামলো বর্ষা।

বড়রা বলাবলি করতে লাগল সরকারকে আর শত্রুতা করতে হবে না, ভগবানই নিজের হাতে সেটা নিয়েছেন।

রাঙা দাদু ছোটাছুটি করছেন। দিদিমা কাঁদছেন। সকলে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাত্তিরে বৃষ্টি পড়ে আটচালা ভেদ করে মিষ্টি নাকি জলে ভাসছে।

ভেবে দেখ আমাদের মনের অবস্থা?

কে খবর দিল সাধন ভট্টাচার্য নাকি কোথায় ভিন গাঁয়ে গেছেন।

শুনে মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন রাঙা দাদু। নিশ্চয় পাত্রপক্ষকে ভাঙচি দিতে সেখানে গেছেন।

একজন খবর দিল বৃষ্টিতে নদীর জল নাকি এত বেড়ে গেছে যে একুল ওকুল দেখা যাচ্ছে না।

রাঙা দাদু বসে পড়লেন। বরযাত্রী আসবে কি করে?

বর যদি এসে না পৌঁছয় মাসীর জন্মের শোধ খতম। কথাটার মানে বুঝতে পারছিস না। সেকালে ওই ছিল শাস্ত্র। যে লগ্নে বিয়ে হবার কথা সে লগ্নে যদি বিয়ে না হয় সে মেয়ের আর জন্মে বিয়ে হয় না।

পিসেমশাই টিপে টিপে হাসছেন। শাস্তর তোরা দেখলি কি?

সকলেই বুঝে নিল—এ আর কারো নয় সাধন ভট্টাচার্যের কাজ। যেখানে যত খেয়া নৌকা ছিল সব চুরি করে বসে আছেন।

পুকুর চুরি হয় আর নৌকা চুরি হতে পারে না?

সবই পারে। সাধন ভট্টাচার্য মাঝিদের হুকুম করে দিল তাদের সাধ্য কি যে নৌকা ঘাটে রাখে।

ঝড়বৃষ্টি, কান্নাকাটি—সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রবল চীৎকার উঠলো। যেন পঞ্চাশটা ডাকাত পড়ল বাড়ীতে।

না ডাকাত নয়—একা সাধন ভট্টাচার্যের গলা। চুপ! সব চুপ! বিয়ে বাড়ীতে মরাকান্না তুলেছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছেন সাধন ভট্টাচার্য।

সাধন ভট্টাচার্যের সেই জলে শপশপে বিরাট মূর্তি জীবনে ভুলব না।

NOT FOR SALE

সেই চেহারায় কাঁধে গামছা ফেলার ভঙ্গীতে বিরাট একটা মাছ! চমকে উঠছিস? হ্যাঁ, আমরাও উঠেছিলাম। না মাছ নয় জিনিসটা হচ্ছে ঐ বিয়ের বর।

বেগুনি রঙের বেনারসীর জোড় পরে বড়ো আহ্লাদ করে বিয়ে করতে এসেছিলেন বাছাধন। সেই জোড়া লেপটে একেবারে মাছের আঁশ। ছোকরা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে লটপটিয়ে সেঁটে ছিল সাধন ভট্টাচার্যের কাঁধে। ব্যাপার জানবার জন্যে তখন কী হৈ চৈ। সাধন ভট্টাচার্য বজ্রকণ্ঠে হুকুম দিলেন সব চুপ। কথা পরে, আগে বিয়ে।

ব্যাপারটি কি?

পরে সবাই শুনতে পেলো সাধন ভট্টাচার্যের এক মামা মর মর শুনে নদী পার হয়ে ভিনগাঁয়ে গিয়েছিলেন মামাকে দেখতে। যাবার সময় আকাশের অবস্থা দেখে ঘাটের মাঝিগুলোকে হুকুম দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন "সব ব্যাটারা এইবেলা ওপারে গিয়ে বসে থাক। ও বাড়ীর ছোট কর্তার আজ মেয়ের বিয়ে। কলকাতার বরযাত্রীরা যেন বিপদে না পড়ে। সেজন্য মাঝিরা তাই গিয়ে বসে আছে সকাল থেকে। বোসো, এই মানুষকে অপবাদ দেওয়া হচ্ছিল চুরির।

তারপর? নৌকাগুলোর হল কি?

চারখানা নৌকো বরকর্তা আর বরযাত্রী বোঝাই হয়ে ওপারে আটকে বসে আছে? নদীর ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে কলকাতা শহরের লোকেরা কিছুতেই ছাড়তে দিতে রাজী হচ্ছে না। সন্ধ্যেমুখো সাধন সরকার ফিরছিলেন ঘাটে এসে দেখেন এই অবস্থা। পাত্রপক্ষকে অনেক মিনতি—অনেক হাতজোড় করেছেন, অভয় দিয়েছেন— এখানকার মাঝিরা বিশেষ সুদক্ষ বলে, তারা কিন্তু অটল। ছেলের বিয়ে দিতে এসে কি প্রাণ খোয়াবে? মেয়ে লগ্নভ্রষ্ট হলো তো তাদের কি?

শেষ পর্যন্ত ধমকও দিয়েছিলেন সাধন ভট্টাচার্য তাদের মহা রাগারাগি করতে শুরু করেছিলেন, তারপর সাধন ভট্টাচার্য—আচ্ছা, তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি,— দেখলাম তখন ব্যাটাদের শায়েস্তা করতে বসলে বিয়ে পণ্ড হয়ে যাবে। পরে দেখাচ্ছি মজা। বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে পাত্তর টাকে নিলাম নৌকা থেকে ছিনিয়ে। ব্যস, পিঠে ফেলে সোজা সাঁতরে পাড়ি। থাক তোরা প্রাণ নিয়ে বসে, আমাদের কন্যা দায় তো উদ্ধার হোক। পেছনে চার নৌকো লোকের সে রে রে শব্দ, আমি এদিকে জয় মা কালী বলে সাঁতরাচ্ছি প্রাণপণে, যাতে লগ্নটা না ভ্রষ্ট হয়।

NOT FOR SALE

রাঙাদাদু দু'হাতে সাধন ভট্টাচার্যের পা জড়িয়ে ধরে ফেলে বলেন, দাদা আপনি দেবতা।"

সাধন ভট্টাচার্য হা হা করে হেসে উঠে বলেন, মতলবটা কি হে? ওই জুতোর মামলাটা ফাঁসাতে চাও নাকি? মামলা চলবে ঠিকই।

আশীর্বাদ করতে হবে। সঙ্গে কিছু নেই। নিজের হাতের দুটো আঙটি খুলে বর কনেকে আশীর্বাদ করলেন সাধন ভট্টাচার্য। তারপর বর যখন বাসরে বসেছে বৃষ্টির জোর কমেছে, তখন সেই চার নৌকো বরযাত্রী এসে পৌঁছেছে। তাঁরা তো অতো ভিজেও অগ্নিমূর্তি। পাছে গোলমাল করে তাই দাঁড়িয়ে থেকে ধমকে ধামকে সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে বিদায় দিলেন সাধন ভট্টাচার্য। রাত তখন ভোর হয় হয়।

রাঙাদাদু হাতজোড় করে বললেন, "দাদা অপরাধী করে রেখে গেলেন, কমলির বিয়েতে এসে এক ফোঁটা মিষ্টিমুখ করলেন না?"

সাধন ধমকে উঠলেন, মিষ্টি মুখ? কমলির বিয়েতে—নেমন্তন্ন করেছিলি আমায়? রাঙাদাদু তো লজ্জায় অধোবদন। বোধ হয় দয়া হলো সাধন ভট্টাচার্যের বললেন, "ওরে নাস্তিক খেয়াল আছে সন্ধ্যের আগে থেকে এই অবস্থা। সন্ধ্যে আহ্নিক করবার ফুরসৎ পেয়েছি? মিষ্টি মুখ সে কালকে দেখা যাবে। এই শহরে শয়তানগুলো যতক্ষণ না গ্রামছাড়া হচ্ছে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকতে পারবো না। সকাল হলেই চলে আসব আমি।

শুনলি তো গল্প।

পিসেমশাই থামতেই আমরা চেঁচিয়ে উঠি, আর আপনারা কি করলেন? খেয়েছিলেন লুচি?

পিসেমশাই হতাশভাবে দুই হাত উল্টে বললেন, এই দেখো তোরা এত বোকা। সেও কি আবার জিজ্ঞেস করে জানতে হয়?

———

NOT FOR SALE

নিরুদ্দেশের পথে

অনেক দিন থেকে মনে মনে ভেবেছিল মোহন, আজ একেবারে ঠিক করে ফেলল। নিশ্চয়ই হবে? বেচারা মোহনের মত দুঃখী মানুষ সকলের অরুচি, নিরুদ্দেশ হবে না তো কি?

হ্যাঁ বাবা থেকে শুরু করে ঠাকুমা, পিসি, আত্মীয় স্বজন, সকলে।

তার দুঃখের কথা শুনলে তোমাদেরও চোখে জল এসে যাবে।

একেই তো ঠাকুমা পিসি তো দূরের কথা বাবা মাই নেই। আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ আছে কিনা তাও তার জানা নেই।

মোহনের কেউ নেই এ জগতে।

থাকার মত আছে দুটি দাদা। তা দাদা তো নয় যেন বোমা। শুধু বারুদে ভরা বোমা নয়। একেবারে পলতের আগুন ধরানো বোমা। বাস্ট করলেই হল, সঙ্গে সঙ্গে গর্জন।

আর ওই অগ্নি সবসময় আর কারো ওপর নয়, সর্বদা মোহনের ওপরই বর্ষিত হচ্ছে। সকলের মুখেই ধ্বনিত হচ্ছে—

মোহন ভিন্ন ওঁদের মুখে আর বাক্যি নেই।

তোমরা ভাবছো এটা তাঁদের ছোট ভাইয়ের প্রতি আদরের চিহ্ন? হায় কপাল! তাহলে একদিন বাড়ী গিয়ে দেখে এসো। এ শুধু ফাই ফরমাসের জন্য হাঁক ডাক।

"মোহন এত বেলা অবধি আয়েস করে ঘুমোচ্ছিস? উঠে ভাইপোকে ধরলেও তোর বৌদির সুবিধে হতো?"

যেন বৌদির সুবিধের জন্যই মোহনের জন্ম।

পরক্ষণেই শুনতে পাবে মোহন সকাল থেকে করিস কি? দুধের বালতি নিয়ে একটিবার গোয়ালার ওখানে যেতে পারিস না? তাহলে দুধ একটু খাঁটি পাওয়া যায়?

ওরা নিজেরা গেলে কি কাজটা হতে পারে না। না নিজেদের দিক থেকে কর্তব্যের কথা ভেবেই দেখেন না?

NOT FOR SALE

দুধের ঝোক মিটতে না মিটতে শুরু হবে বাজার প্রসঙ্গ।

উঃ! ঘরে বাইরে খাটতে খাটতে জীবনটা গেল আমাদের। কেন মোহন সারা সকাল করে কি? পারে না বাজারটা করতে? বিদ্যেবুদ্ধির যা বহর দেখছি ভবিষ্যতে করতে তো হবে বাজার সরকার। বাড়ির বাজার করে হাত পাকানোই ভালো।

আবার একটু পরে চীৎকার। জুতোটার কি অবস্থা হয়ে গেছে। এই পরে ভদ্রলোক অফিস করতে পারে। বাড়ীতে এমন কেউ নেই যে এটুকু দেখে?

বেচারা মোহন যদি এ সময় ব্যস্ত হয়ে কর্তব্য পালনে ছুটে আসে। মেজদা 'থাক থাক' করে সজোরে তার হাত থেকে বুরুশটা কেড়ে নিয়ে, নিজেই পায়ে পরা জুতোটা খসখস করে ঘষে নিয়ে মসমস করে বেরিয়ে যাবেন।

এই যে আবার শুরু হয়েছে—"এক্সসাইজ করে কি হবে? ওহে মোহন, ডাকাতি না ভন্ডামি। কাজের বেলায় তো উৎসাহ দেখি না। এই যে সারা বাড়ী ঝুলকালিতে—ভর্তি হয়ে রয়েছে এই ঝুলগুলো সাফ করলেও বুঝি কিছু ফল পাওয়া যাচ্ছে।

এই হলো মোহনের প্রতি তার দাদাদের স্নেহ ভালবাসার নমুনা।

কিন্তু নমুনা দিয়ে কতোই আর বোঝানো যায়?

আচ্ছা মানুষ কি ফেল করে না?

ফেল আছে বলেই না পাশ করার মানে আছে? কিন্তু সে কথা কে বোঝাবে দাদাদের? যদি কোন কাজের বেলায় আমি পারব না বলে ফেলি অমনি হৈ চৈ পড়ে গেল, কী? পারবি না, বলতে লজ্জা করে না। সাতবার ফেল করে।

শোনো কথা।

পাশ করতে না পারলেই লোকে ফেল করে। তবে আর পারব না বলতে লজ্জা কি? পড়া বলতে যারা অপারগ, তারা সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হবে এমন কোনো আইন আছে?

এই দাদারা ছাড়া বৌদিরাও আছেন। দাদারা যদি জ্বলন্ত বোমা তো বৌদিরা আগুনের ফুলঝুরি।

তাঁদের মুখে এক কথা, ছোট ঠাকুরপোর দ্বারা যদি কোনো কাজ হয়। শোনো। তাঁদের মতে কাজ মানে ওদের যাবতীয় চাহিদা মেটানো।

NOT FOR SALE

কান্না ভোলানো, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, স্কুলে পৌঁছানো, ডাক্তারখানা যাওয়া।

এতেও যদি মানুষ নিরুদ্দেশ না হয় তো কিসে হবে? খবরের কাগজে হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের পাতাটাই আগে খোলে। কী আকুল প্রার্থনা ফিরে আসার।

নিরুদ্দেশরা অতো বোকা যে, তোমাদের ওই মিছে কান্নায় ভুলবে। নির্ঘাৎ তারা আর ফিরে আসে না? যদি আসবেই তো কাগজে কেন সে খবর থাকে না।

কখনোই ফিরে আসে না। কিন্তু তাহলে যায় কোথায়? তারা কোথায় যাচ্ছে কি করছে, কি খাচ্ছে, ভেবে কূল পায় না। নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে যে ঘুরতে ঘুরতে ঘাঁটি আবিষ্কার করে ফেলবে।

আজই হঠাৎ সে স্থির সঙ্কল্প করে ফেললো কেন, তার কারণও আছে। আজ স্কুলের এক বন্ধু ওকে সিনেমা দেখার নেমন্তন্ন করেছিলো। সেও ফেল করা ছেলে।

মনটা তাই একটু ভালো ছিল মোহনের।

নাইবার সময় সাবানটা নিয়ে একটু দেরী করে ফেলেছিল। ওমা! শুরু হল বাড়ী সুদ্ধ সবাই বুঝি আজ গা ধোওয়া, কাপড় কাচা বন্ধ রাখবে ছোট ঠাকুরপো। এত সাবান মাখার ঘটা কেন? বিয়ে করতে যাবে নাকি?

ব্যস! এই নিয়ে হাসাহাসি, রেগে গনগন করে বেরিয়ে এলো।

হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে বসলো, আমার যত ইচ্ছে দেরী করবো, যা খুশি তাই করবো।

মনে তো ভরসা আছে নিরুদ্দেশ হবে। তার ওপর আজ সিনেমা। জন্মের শোধ একবার বলে নেবার বাসনা হল তার।

কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যস্।

কী বললে?

যা ঠিক তাই বলেছি। বলে গট্ গট্ করে চলে গেল মোহন। এরপর বুঝতেই পারছ।

যা হবার তাই। দাদারা এসে না ভূত না ভবিষ্যৎ।

NOT FOR SALE

এতো উদ্ধত হয়ে গেছ তুমি?

লঘু গুরু জ্ঞান নেই তোমার? রোসো দেখাচ্ছি তোমায়।

এর মধ্যে কে পারে ফর্সা জামাকাপড় পরে সিনেমা দেখতে যেতে? মোহনের বন্ধু সজল জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ব্যাপার দেখে প্রমাদ গণলো। ব্যাপার তো গুরুচরণ।

জানলায় টোকা, ঢিল ছোঁড়া সব কিছু করেও বিফল মনোরথ হয়ে চলে গেল সজল।

আর দাদাদের বাক্যবাণ বর্ষণ সাঙ্গ হবার পর মোহন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাতটা।

ঘরে গিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে মোহন ভাবতে থাকে কখন সুবিধে? রাতের অন্ধকারে না দিনের গোলমালে?

এই চিন্তার সময় মেজদার শ্বশুরবাড়ির বাহিনী এসে হাজির হল। তারা এসেছেন সিনেমা দেখতে, রাত হয়ে গেছে এত রাতে আর ফিরে যাবেন না, এখানে খাবেন, শোবেন, কাল সকালে গঙ্গায় স্নান সেরে মা কালী দর্শন করে তবে যাবেন। অতএব? মোহন।

অতএব।

ছুটোছুটি, হাঁকাহাঁকি, লাফালাফি সমস্ত ডিউটি মোহনের।

খাবার নিয়ে আয়, বাজারে গিয়ে ঘি নিয়ে আয়, আলু, ডিম।

গম্ভীর মুখে উঠে টাকাটা নিলো মোহন। জামা গায়ে দিল বেরিয়ে গেল গটগট করে।

এই দশ টাকার নোট দুখানা নিয়েই সে বাড়ি থেকে হাওয়া হবে।

—কিন্তু কি করে লোকে নিরুদ্দেশ হয়?

দোকানের উল্টোদিকে একটা পার্কে ঢোকে মোহন আর পার্কের বেঞ্চে বসে আকাশ পাতাল ভাবছে। এই তো বাড়ি থেকে চলে এলো। বেশ, না হয় এরপর ঘুরতে ঘুরতে হাওড়া কি শেয়ালদা যে কোনো এক স্টেশন থেকে যে কোনো একটা জায়গায় টিকিট কিনে চড়ে বসল তারপর রাতে?

ভাবতে ভাবতে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে, খিদে পায়—ঘুম পায়। নাঃ, নিরুদ্দেশের এটা ঠিক পদ্ধতি নয়। অন্তত কিছু জামা কাপড়, বালিশ

NOT FOR SALE

বিছানা এটা ওটা সঙ্গে না নিয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার অনেক অসুবিধে। তাহলে? তাহলে এখন ফেরা।

কিন্তু কোথায় ফেরা, সেই বাড়িতে, যেখানে তার কপালে ঝুলছে খাঁড়ার ঘা। মেজদার সেই শালা, শালাবৌ কি খেল তারা? ডিমের ডালনা আর রাবড়ী দিয়ে লুচি? কে জোগাড় করল।

ওরে বাবারে! কেটে ফেললেও সে বাড়িতে ফিরতে পারবে না।

সকাল হোক, যা থাকে কপালে। বেঞ্চের ওপরেই শুয়ে পড়ল মোহন। আর আশ্চর্য ঘুমিয়েও পড়ল।

ঘুম ভাঙল প্রায় শেষ রাতে।

প্রথমটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে বসেই চড়াৎ করে মনে পড়ে গেল সব। সঙ্গে সঙ্গে বুক পকেটে হাত। কিন্তু হায়, সব ফাঁকা।

নোট নেই।

এ পকেট, ও পকেট, বেঞ্চের নীচে কোথাও নেই।

পার্কের মালীর হাত সাফাই। পাগলের মত সারা পার্কের ঘাস হাতড়ে বেড়াতে বেড়াতে সকাল হয়ে গেল। কতো কি পড়ে আছে পার্কে চকোলেটের রাঙতা, সিগারেটের কাগজ, শালপাতা।

আবার বেঞ্চে বসে কর্তব্য ঠিক করে ফেললো মোহন।

কিছু নয়, একটি রোমাঞ্চকর গল্প বানাতে হবে, নচেৎ উদ্ধার নেই। জীবনে এত গল্প পড়লো আর একটা গল্প বানাতে পারবে না?

পার্কে জল দিচ্ছে বেশ কাদা কাদা ঘাস।

দু'হাতে খানিক কাদা নিয়ে জামার এখানে ওখানে লাগিয়ে সেই হাতে চুলগুলো উস্কোখুস্কো করে চড়ে বসলো একটি রিকশায়। বলে দিল নিজের বাড়ির রাস্তা।

কিন্তু এ কি! বাড়ির সামনে লোক কেন এতো।

দাদারা, শালারা, পাড়াপড়শি এরা সকলেই কি লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে মোহনের জন্য?

তাহলে! তখন উপায়?

রিকসা থামার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মধ্যে বিপুল হর্ষোধ্বনি, এসেছে এসেছে!

NOT FOR SALE

কি হয়েছিল?

কোথায় ছিলি? সারারাত যে আমরা থানা আর হাসপাতাল করে বেড়িয়েছি। থাক এখন ওকে কোন প্রশ্ন কর না। সুস্থ হতে দাও।

তাকিয়ে দেখতে সাহস হয় না।

চোখ বুজে—টলতে টলতে অসুস্থ মোহন বাড়ির দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে—"ধপাস্"!

ভিতর থেকে ছুটে আসেন দাদা বৌদিরা, ভাইপো ভাইঝিরা।

কি হয়েছিল?

জড়িত অস্ফুটকণ্ঠে বলে, 'গুণ্ডা'!

গুন্ডা?

হ্যাঁ দুটো গুন্ডা!

কোথায়?

খাবারের দোকানের ওই মোড়ের কাছে। ফস করে নোট দুটো টেনে নিয়ে ছুট, আমিও তাদের পিছন পিছন—"

কী সর্বনাশ!

একটু জল দাও বৌদি!

পেছন পেছন ছুটে উঃ কোনদিকে গিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি, একটা গলির মধ্যে ঢুকতেই ওরা আমাকে—"

জল খেয়ে আর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে গল্প শেষ করে মোহন। ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। তারপর আর মনে নেই। সকালবেলা দেখি পার্কের একটা বেঞ্চে পড়ে আছি। তোমার নোট দুখানা যে গেল মেজদা!"

নোট দুখানা?

মেজদা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে ওঠেন, "চুলোয় যাক নোট, তুই যে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিস এই ঢের।"

ভাগ্যিস ছুরি-টুরি বার করেনি ভগবান রক্ষে করেছেন। কিন্তু যাই বল তোমার এত সাহস দেখানো ঠিক হয়নি ঠাকুরপো। দু'দুটো গুন্ডার পেছনে—

তোমাদের উচিত হয়নি বাপু এত রাতে বাচ্চা ছেলের হাতে টাকা দেওয়া।

হ্যাঁ অন্যায় হয়েছিল সত্যি। যাক প্রাণটা নিয়ে যে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে

NOT FOR SALE

ভগবানকে ধন্যবাদ। বড়দি তুমিও চলো—আমাদের সঙ্গে কালীঘাটে, ওখানেই মায়ের পূজো আর লুট দেব—

—তাই চল ভাই, মায়ের কাছে ষোলো আনার পূজো—

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এসব তার জন্যে? এদের কাছে এতো দাম মোহনের?

সব যেন গোলমাল হয়ে গেল।

না, নিরুদ্দেশ হওয়া আর মোহনের হয়ে ওঠেনি।

———